আরম্ভে

রের মূলকথা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। লেখক ঘটনা সম
য়ে যার সামঞ্জস্য আর বিরোধ বার করে, আর গ
চণের দিক থেকে এদের সবারই কাজ হচ্ছে এক।
চক এরা ভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যষ্টি নয়। যা কিছু পার্থক্য বা
খ্‌বার, জান্‌বার বা এক কথায় গ্রহণ করবার ভঙ্গি।
াটা কেবল তখনই ওঠে যখন দৃষ্টিভঙ্গিতে হয় গরমিল। বিচা...
বোধ আছে, নিন্দা-প্রশংসার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু 'ভিন্নরুচির্হি
বরাবরই এই গোড়াকার কথাটা এড়িয়ে চলি তাহ'লে কোনোদিনই
গণ্ডীর বাইরে যেতে পারবোনা।

উঠেছে তখন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য মেনে নিয়েই সে প্রস্তাব হয়েছে।
্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই জন্যে নয় যে হাতের পাঁচটা আঙুলের মতো
টাই তো সংসারের বড় কথা নয়, মতৈক্যও তো আছে এবং সে যে
তার বড় প্রমাণ হচ্ছে মতৈক্যের জন্যে আমরা মতানৈক্যটাকেই
চার করি। কিন্তু ব্যতিক্রমই নিয়ম হয়, সংসারের এও একটা
টাপাল্টির তলায় এই নিয়মটাই বড় হ'য়ে ওঠে যে কোনো কিছুই
কিছুই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতাই যদি প্রকৃতির নিয়ম
পার্থক্যে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারেনা। পরিবর্তিত অবস্থিতির
া না-বদ্‌লেই পারেনা। তার কারণ দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে
ার্শ্বিক আবেষ্টনীর আওতায়। আমাদের মনের শক্ষা—কালচারের
তাও তাতে বিরাজ করে। এর সঙ্গে শিক্ষা ও সংসর্গের যেমন
দের মনের রুচি ও বিরূপতা, মানে অনুরাগ, বীতরাগ—নিরপেক্ষতা
্য এমন কথাও জোর ক'রে বলা চলে না। জ্ঞাতসারে না-হোক
ক। কাজেই সাহিত্য বা শিল্পকলার যে সব প্রশস্তি বা সমালোচনা
পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, বরং তার অধীন। তাই
্য বা শিল্পকলা আর্টের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রতীয়মান হয় আর
লো প্রতিপন্ন করবার জন্যে সমালোচকের অভাব দেখা যায় না,
আগ্রহে আদৃত হয়েছে অন্যকালে তা সমান ঘৃণায় উপেক্ষিত হয়েছে,
কিছুই সবকাল জুড়ে থাকতে পারেনি।

না। তা না-হ'য়ে সকলের রচনাই যদি একজনের
ম'লতে হবে।

দি অন্য কোনো পূর্ববর্তীর অনুসরণ না ক'রে নিজেদের
তাতে তো আনন্দিত হবারই কথা! যত মত,
স্বকীয় স্বধর্মের মধ্যে জাগা এবং জাগানোই
রিতার্থ। তরুণ পথযাত্রীরা এপন খুঁজছে।
পেয়েছেন তার মানদণ্ডে অন্যকে মাপা

নব নব দেহে সেই
সৌন্দর্যের মতো
থাকে, তাহ'লেই
তো" হ'য়ে আর
পারে,—থাকুক।
শৈশব থেকে
থাকে—অমৃ
আমাদের মধ্যে
আর তাকে
না মন-সংস্কারে
তো।
আছে তাদের
র যাত্রীদের
সাহিত্যকে
চায় না।

সেটা তাঁদের অগৌরবের কথা কেউ বলে না। তা না-হ'য়ে সকলের রচনাই যদি একজনের প্রতিধ্বনি হ'তে থাকে তাকে আত্মহত্যাই ব'ল্‌তে হবে।

কাজেই আধুনিক সাহিত্যিকেরা যদি অন্য কোনো পূর্ববর্তীর অনুসরণ না ক'রে নিজেদের অন্তরের প্রেরণাকেই আশ্রয় ক'রে চলেন তাতে তো আনন্দিত হবারই কথা। যত মত, তত পথ—এ যুগে এই সত্য লোকে জেনেছে। স্বকীয় স্বধর্মের মধ্যে জাগা এবং জাগানোই হচ্ছে আধুনিক সাহিত্যের ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম পেয়ে গেছেন, তিনি চরিতার্থ। তরুণ পথযাত্রীরা এখন খুঁজছে। তারা কি পাবে, সেটা সম্ভাবনার গর্ভে। একজন যা পেয়েছেন তার মানদণ্ডে অন্যকে মাপা যায় না, জানাও যায় না।

দেহের রূপ অপূর্ব, কিন্তু তাও নিত্যকালের নয়। অথচ কালই নব নব দেহে সেই অপূর্বের আত্মপ্রকাশ ক'রে চলেছে; তার আর বিরাম নেই।

মনের রূপও যদি নিত্যকালের না হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী? সৌন্দর্যের মতো সাহিত্যও যদি সমসাময়িক লোকের মনোরঞ্জন ক'রে থাকে, প্রেরণা দিয়ে থাকে, তাহ'লেই তো সে তার পাওনা পেয়ে গেলো।

অভিজাত সাহিত্যিকদের বনেদী সাহিত্য যদি "উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা" হ'য়ে তার চিরন্তন যৌবনকে বৃদ্ধিগত বার্ধক্য ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে,—রাখুক। কিন্তু আমরা জানি সত্যেরও জন্মমৃত্যু আছে। কালের প্রভাবে সেও শৈশব থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে, শেষে জরায় এসে একদিন ধুঁকতে থাকে—ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে দিয়েই যার মৃত্যু……!

ইবসেন ও বার্ণাড শ এ-কথাটা বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন, যে মিথ্যাটা আমাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চ'লে আসছে, সেও একদিন সত্যের সমান হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন আর তাকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অ ওড়াতে গেলেও ব্যথা লাগে, কেননা মন সংস্কারে পঙ্গু। তাই সে যুগ যুগ ধ'রে আমাদের মধ্যে মরে গিয়েও বেঁচে থাকে—মমির মতো।

যাঁরা মরেছেন তাঁদের কবরেই যদি পৃথিবী ছেয়ে রইল—যারা বেঁচে আছে তাদের গতি কোথায়?

আমরা যে পথ কাটছি তা আমাদেরই চলবার জন্যে। অনাগত কালের যাত্রীদের চল্‌তে হবে আমাদেরই কাটা পথে—এমন দুর্ভাবনা বা দুঃসাহস আমাদের নেই।

এ সব অতি সত্য কথা। এ নিয়ে তর্ক চলে না। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র ক'রে অর্ধরথীদের তূণে যত গাল আর ঝাল আছে, ফুরিয়েও যেন আর ফুরোতে চায় না। প্রীতিবাদ যেখানে নেই প্রতিবাদ সেখানে উগ্র।

তাঁরা যা বলেন তার ভাবখানা এই—যে পথ সৃষ্টি হয়েছে, এই একমাত্র পথ। তোমরা এই পথে চলবার যোগ্য হও, নতুবা পথ ছাড়বো না।

পৃথিবীর আদি পথিকরা একদিন এমনি অনির্দিষ্ট পথেই চলেছিলো, তাদের সেই চলাতেই রাজপথ জন্মালো। নতুন পথ রচনার প্রয়োজন আজও নিঃশেষ হয়নি।

সাহিত্য বাঁধানো রাজপথ নয়।

আর সাহিত্য যদি বাঁধানো রাজপথই হ'তো, তাহ'লেও পথরোধের কথা ওঠে না। একান্তভাবে অধিকার ক'রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাস ক'রতে যে কোনো পথ একজনের পক্ষেই অপ্রশস্ত, কিন্তু সেই পথই আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের চলার পক্ষে যথেষ্ট। পথে নেবে পথ অধিকারের কোনো অর্থই হয় না, কেউ আগে আগে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁকে সে স্থান ছেড়ে যেতেই হয়। পথ অধিকারের মানসে যদি তিনি স্থান না ছেড়ে স্থাণু হ'তে চান তাহ'লে তাঁকে সমস্ত পথটাই ছাড়তে হয়।

কিন্তু সমস্যা তো পথের নয়—পথ চলার। আগেই চলুন আর পেছনেই চলুন, পথিকে পথিকে সম্বন্ধ শুধু পথের।

সম্প্রতি আবার আর এক বিপরীত দল বলছেন, আধুনিক সাহিত্যকে আরও আধুনিক হ'তে হবে। আবহমানকাল ধ'রে সাহিত্য ছিলো ধনী ও বিলাসীদের জয়গাথা। এতকাল রাজরাজড়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশস্তি ও কাহিনীতেই চ'লতো তার কারবার। যদিও আজকাল সেখানে সাধারণেরও স্থান হচ্ছে, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হ'লে চলবে না। আরও নিচের দিকে নেমে আসতে হবে, যেখানে যুগ যুগ ধ'রে চলছে অত্যাচার আর অপমান, সেই সবহারাদের মাঝে। আজ বিশ্বের কারখানা ও জমির মালিকরা একদিকে, যাঁরা রাজা ও পুঁজিপতি। আর কৃষক ও শ্রমিকরা একদিকে, যারা সর্বহারা। এই শ্রেণী-সংগ্রামটাই আজকে সব চেয়ে স্পষ্ট, সব চেয়ে নিকটের। এই কৃষক ও শ্রমিক, জনসংখ্যার অনুপাতে এরাই দেশ, এরাই জাতি। সাহিত্যকে এই কৃষক ও শ্রমিকদের জাগিয়ে তুলতে হবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনায়। তবে সেই সাহিত্যই হবে সত্যিকারের আধুনিক সাহিত্য—জাতীয় সাহিত্য—গণ-সাহিত্য।

ভরসার কথা এই, অনাগতের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বুভুক্ষু মর্মপীড়িত অথচ সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদার স্রষ্টাদের মনে এই চিন্তার আভাস আন্দোলিত হ'য়ে উঠছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবের সূচনা শতবিঘ্নের নিচেও দিন দিন পুষ্ট হ'য়ে উঠছে। ভাষা ও ভাবের অভিব্যক্তিতে সে মর্মকথা যেদিন প্রকাশ পাবে সেদিন আর তাকে চিনতে আমাদের ভুল হবে না।

সে যাই হোক, এই মতবাদী সাহিত্যিকদের রাগের কারণ বুঝি, কিন্তু সত্য-সন্ধানীদের বিরাগের কারণ বুঝিনে।

যাদের জীবনে দুঃখের অন্ত নেই, সেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নানা মানুষের মর্মকথা আজ মর্মান্তিক ভাবে মিলে যায় আধুনিক সাহিত্যে। রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে নিষ্ঠুর সত্যের যেখানে প্রতিনিয়ত চোখোচোখি ঘটছে, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যেখানে মুখোমুখি দেখা,—সেখানেও তাকে অসম্পূর্ণ ব'লে, অসুন্দর ব'লে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান।

বোধ করি, এমনিই হয়। যে-বস্তু হৃদয়ের যত নিকটে, তাকেই মানুষ তত দূরে সরিয়ে রাখে, যে অত্যন্ত নিকট আত্মীয় তাকেই আঘাত ক'রে সে ব্যর্থ ক'রতে চায়! যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা ও বেদনা জীবন ভ'রে তারা বহন ক'রলো—অনেক সময় তাকে আহত ক'রেই তার আনন্দ।

কিন্তু দুঃখ সেজন্যে নয়। দুঃখ এই যে, ব্যক্তিকুৎসার ভেতরেও তাঁরা আনন্দ পেলেন, অথচ এই আধুনিক সাহিত্যের কোথাও উল্লেখ-যোগ্য কিছু দেখলেন না। ভুলে যাচ্ছেন, যখন তাঁরা আধুনিককে আঘাত করছেন তখনই তাঁদের ভাবী সম্ভাবনা—অ-দৃষ্ট ভবিষ্যৎও আহত হচ্ছে।

এই প্রবন্ধে আমি যা বলতে চেয়েছি তার গোড়ার, মাঝের ও শেষের সম্পূর্ণ কথাটি এই—আধুনিকেরা পৃথিবীকে কি চোখে দেখেছেন। এ কথার উত্তর তাঁদের যে কোনো লেখা থেকেই পাওয়া যাবে। সে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সেখানে কোনো হেঁয়ালী নেই, অস্পষ্টতা নেই। সম্পূর্ণ মানুষের সহজ-সত্য অনুভূতির একটা দীপ্তি সেখানে নিয়তই লেগে আছে—গভীরতায়, নিবিড়তায়।

সে অনুভূতি কল্পনাধৃত নয়, রূঢ় বাস্তবের কোলে তার জন্ম, বাস্তবের মাতৃদুগ্ধে তার পুষ্টি। তাই সেখানে সৎ ও অসৎ, নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট, সরলতা ও কুটিলতা, হিংসা ও ভালবাসা কাম ও প্রেম সকলেই সঞ্জীবিত, সকলেই স্বপ্রকাশ। সেখানে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকবার প্রয়াস নেই। নীতিপ্রচারের নাম নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা সে করে না, সেখানে আজকের মানুষের কত চিন্তা, কত চেষ্টা, কত যুক্তি মূর্ত হ'য়ে উঠেছে! তার অন্তরতম নিভৃত মনটিতে, যেখানে গোপনতম প্রাণের গভীরতম বেদনা—সেখানে কৃত্রিমতা নেই, অনুকরণ নেই—আছে শুধু মানুষের সহজ সরল অনুভূতি। হৃদয় উজাড় ক'রে দেওয়া তার আশা, তার আকাঙ্ক্ষা, তার বেদনা, তার আবেগ, তার স্বপ্ন, তার সংগীত—নিঃশেষে শুধু ঢেলে দেওয়া—এই তো সাহিত্য।

এই যে সাহিত্য, এতে যদি দোষ-ত্রুটিও কিছু থাকে—থাকুক না। যুগ যুগান্তরের বন্ধন একদিন মোচন ক'রতে গেলে কিছু ভাঙবেই তো! সীমাবদ্ধ সংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভেতরে আবহমানকাল ধ'রে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে শান্তি আছে মানি, শৃঙ্খলা আছে মানি, কিন্তু সেখানে জীবনের চাঞ্চল্য কোথায়—কোথায় মুক্তির আনন্দ?

এই আনন্দের বার্তা যারা বহন ক'রে আনলো তাদের অধীর পদক্ষেপে কিছু কিছু সীমারেখা ভাঙবেই। এবং এই ভাঙার অধিকার তাদের দিতে হবে। কেননা, এই ভাঙার প্রয়োজন আছে, ভেতরে ভেতরে যে ভিত জীর্ণ হ'য়ে আসে একদিন তাকে ভেঙে দিতেই হয়। আর, সে ভাঙাটা ধ্বংস নয়—সৃষ্টির সূচনা। নদীর এক কূল যখন ভাঙে আর এক কূল গ'ড়ে ওঠে—নতুন পলি পড়ে। আজ যেখানটা ভাঙনের মুখে—কাল সে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। এই-ই নিয়ম, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। কাজেই এই ক্ষতিকে পরম ঔদার্যের সঙ্গে স্বীকার ক'রে নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ সাহস, শক্তি ও উদারতা যাদের নেই তারা বৃহত্তর মানব-সমাজের কল্যাণকামী নয়—তারা মানুষের অধিকারকে ভালবাসে না—তারা ভালবাসে মানুষের ভীরুতাকে, দুর্বলতাকে। আধুনিক সাহিত্য যে সীমারেখা ভাঙবার তা তো ভাঙছেই,—যা না ভাঙবার হয়তো অনেক জায়গায় সে তাও ভাঙতে উদ্যত। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই! জীবনের সকল ক্ষেত্রেই—বন্ধন-মোচনের কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে ভাঙতে হ'লে কিছু অনিয়ম দরকার—দরকার আইন অমান্য আন্দোলনের। যে সীমারেখা আজ ভাঙছে তা ভাঙবার কি না-ভাঙবার সে বিচারের দিন আজ নয়—ভাবীকালের গঠনমূলক কাজে যখন জরিপ হবে তখন সেটা ঠিক হ'য়ে যাবে।

তবে আধুনিকদের কাছেও একটা কথা পেশ করবার আছে। সেটি এই : মানুষ কেবল অবজেক্ট নয়, সাবজেক্টও বটে! তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তার চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত ক'রছে খুবই সত্যি, কিন্তু মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে বদ্‌লেও দিচ্ছে। এইটেই তার কর্তৃত্ব, এখানেই সে কর্তা, স্রষ্টা। সামাজিক পরিস্থিতির আন্দোলনে মানুষ নাকানি-চুবানি খাচ্ছে এইটেই সম্পূর্ণ কথা নয়, পরিত্রাণের প্রচেষ্টাও তার ভেতর তেমনি তীব্র। বিংশ শতাব্দীর প্রতিটি মানুষ যখন আসন্ন প্রচণ্ড বিপ্লবের মুখে গিয়ে প'ড়ছে, তার প্রাগ্-ঐতিহাসিক রচনায় যাঁরা আছেন ব্যাপৃত, সেই আধুনিকদের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি ঔদাসীন্য মর্মান্তিক। "খাটি" সাহিত্যের ধারণা তাঁদের সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। রাষ্ট্রীয় জীবনকে উপেক্ষা করা চলে না—কোনো মতেই নয়। রবি বাবু "চার অধ্যায়" লিখে রাষ্ট্রীয় জীবনের গতিকে আঘাত ক'রতে গিয়ে নিজেকে পুলিসের স্তরে নামিয়ে যে অন্যায় করেছেন, আধুনিকেরা রাষ্ট্রজীবনে অবহেলা দেখিয়ে তুল্য অপরাধই করছেন। এই কন্‌স্পিরেসি অব্ সায়লেন্স বা নিশ্চ্‌পতার ষড়্‌যন্ত্রের নিন্দা না ক'রে আমি পারিনে।

তাহ'লেও আমি বিশ্বাস রাখি, এই আধুনিকদের ভেতর সত্যিই দেখবার ও চলবার শক্তি যাঁদের আছে, দৃষ্টি ও গতিভঙ্গিতে যারা প্রকৃতই সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল, সাহিত্যিক প্রতিভায় যাঁরা স্বাবলম্বী ও নির্ভীক, আজকের জাতীয় জীবনের যে স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, সে আত্মচেতনার মন্থনে যুগের ছবি রূপায়িত হ'য়ে উঠবেই। আজ না হয় আগামী কাল! কোনো কোনো এই

আধুনিক-প্রতিভার গভীরতা ও নিবিড়তার মধ্যে আছে সেই গুণ। সে হ'লো স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছন্দতা। এ দু'টি গুণ এক নয়, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির সৃষ্টি। স্বচ্ছতা চোখের গুণ আর স্বচ্ছন্দতা পায়ের গুণ। চোখের দৃষ্টি যার সামনের বস্তু ভেদ ক'রে এগিয়ে চলে, স্বভাবতঃই পায়ের চলায় তার জড়তা থাকে না।

এইবার ছোটগল্প ও ব্যক্তিগতভাবে ছোটগল্পের লেখকদের একটা তুলনামূলক পরিচয় দেওয়া দরকার। অবশ্য জানি এর দায়িত্ব অনেক। কিন্তু যখন সে দায়িত্ব নিয়েছি তা বহন ক'রতেই হবে।

এইখানে আমি বেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, কোনো লেখক-বিশেষের সমর্থন বা বিরুদ্ধতার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। সাহিত্যের প্রতি কর্তব্য-বোধে নিরপেক্ষ পাঠক হিসেবে আমার যে নিজস্ব ধারণা, তাই শুধু মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ ক'রে যাবো।

ছোটগল্প আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ। লেখকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, গল্পের সংখ্যা তো খুবই বেশি; এবং গল্পের রচনারীতি ও বিষয়-ভঙ্গি বিচিত্রও বটে। খুব কম ক'রে ধ'রলেও নানা রকমের ও উৎকর্ষের নানা স্তরের শ' পাঁচেক গল্প প্রতি বছর বাংলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বেরিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য তার মধ্যে মন্দ ও মাঝারিই বেশি, তবে ভালোও কিছু কিছু থাকে; এবং সেই ভালোটুকু দিয়েই সমগ্র সাহিত্যের মূল্য-বিচার। বাংলা ছোটগল্প যেখানে শ্রেষ্ঠ, সেখানে তা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের ছোটগল্পের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে এ-কথা বল্‌লে আজ বোধ হয় বেশি বলা হয় না। তাছাড়া এখন পর্যন্ত উপন্যাসের চাইতে ছোটগল্পেই বাঙালী লেখক বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছেন।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে গল্পরচনায় যাঁরা স্বকীয় স্থানের অধিকারী, জীবনদর্শনে ও প্রকাশভঙ্গিতে যাঁরা বিশিষ্ট, নতুন রীতির যাঁরা প্রবর্তক, তাঁদের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্প এই গ্রন্থে গ্রথিত হ'লো। শ্রেষ্ঠ অবশ্য সম্পাদকের মতে, এবং এ নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়াও স্বাভাবিক, কেননা এঁরা অনেকেই উল্লেখযোগ্য গল্পই এত লিখেছেন যে বেছে নেওয়ার কাজটি সোজা নয়। কিন্তু, মোটামুটি প্রত্যেক লেখকেরই রচনার বিশেষ চরিত্র যাতে প্রকাশ পায়, সে চেষ্টা এ-বইয়ে আছে; এ-বই প'ড়ে পাঠকের এটুকু অন্ততঃ ধারণা হবে কোন্ লেখক কি ধরণের গল্প লেখেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁদের লেখা আরো বিস্তৃতভাবে পড়বার ইচ্ছে হবে।

বাংলা ছোট-গল্প-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই বোধ হয় সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা গল্পকেও অনেক দিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন ক'রে ছিলো, শৈলজানন্দ নিজেরই অজ্ঞাতে প্রথম মোড় ফিরিয়ে দিলেন। বীরভূম জেলার 'স্থানীয়' গল্প বাংলা গল্পে নতুন পটভূমি আনলো। কয়লাকুঠির ছোট ছোট কাহিনীতে শৈলজানন্দর যে প্রতিভার সূত্রপাত, 'নারী-মেধ', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি অপূর্ব ও নিষ্ঠুর গল্পে তার পরিসমাপ্তি। ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরেও যে গল্পের উপাদান আছে, তা তিনিই প্রথম আমাদের দেখালেন। তাঁর বেশির ভাগ গল্প বিশেষ একটি জেলার মজুর ও নিম্নশ্রেণীদের নিয়ে, কিন্তু এই স্বল্পপরিসর তাঁকে সংকীর্ণ করেনি, বরং একটি অক্ষুণ্ণ ও অবাধ প্রকাশের মধ্যে মুক্তি দিয়েছে। তাঁর গল্প 'স্থানীয়' হ'য়েও সার্বজনীন। শিল্পী হিসেবে তাঁর মতো দক্ষতা প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া খুব কম লেখকেরই আছে; কথকতায় তাঁর মতো কুশলতা বিরল। 'কথকতা' শব্দটা অকারণ নয়; তাঁর গল্প পড়তে পড়তে সত্যি মনে হয় যেন তিনি মুখে ব'লে যাচ্ছেন, আমরা শুনছি।

শৈলজানন্দ আত্ম-অচেতন শিল্পী, তাঁর বিদ্রোহও সচেতন নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহ সচেতন ও মুখর হ'য়ে উঠলো প্রধানতঃ তিনজন লেখকে—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এঁদের নাম এক সঙ্গে করা হ'লো ব'লে এ কথা ভাবলে মস্ত ভুল হবে যে এঁরা তিনজন একই 'স্কুলের'। জীবনকে দেখবার ধরণে ও রচনা-রীতিতে এঁদের বৈসাদৃশ্য প্রচুর। প্রেমেন্দ্র অতি স্বল্পভাষী ও নৈর্ব্যক্তিক; বুদ্ধদেব প্রধানতঃ অন্তর্মুখী ও মনস্তত্ত্বমূলক; অচিন্ত্যকুমার উচ্ছ্বসিত ও অলংকারবহুল। তবে এঁদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গিতে কিছু মিল আছে। প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার, সামাজিক ও নৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁরা বিদ্রোহে অগ্রণী। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটাকে নতুন ক'রে যাচাই ক'রে দেখবার সাহস ও শক্তি এঁদের মধ্যেই শুধু পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের দুঃসাহস অনেকেরই চমক লাগিয়েছে, এবং নিন্দায় ও নির্যাতনে এঁরা তার মূল্যও কম দেননি। এ ছাড়া আর একটা বিষয়ে এ তিনজনে মিল দেখা যায়। তিনজনেই গ্রামের জীবন ছেড়ে নগরের আশ্রয়ী। এই গ্রন্থের পাঠকরা বোধ হয় লক্ষ্য করবেন যে আমাদের বেশির ভাগ লেখকরাই এখনো গ্রামের জীবন নিয়েই গল্প লেখেন। যে বিরাট নগর-জীবন আস্তে আস্তে গ'ড়ে ও বেড়ে উঠে আমাদের সকলকেই প্রায় গ্রাস করছে, তার অস্তিত্বেরই কোনো পরিচয় বাংলা গল্পে প্রায় থাকতো না, যদি না এই লেখকত্রয় তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশের শক্তি নিয়ে নগরকে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করতেন। গ্রাম থেকে শহরে এই পরিবর্তন বাংলা গল্পের পরিণতির ইতিহাসে একটি প্রধান চিহ্নস্থল। নাগরিক নিম্ন মধ্যবিত্তের অনশন গ্লানি ও কুশ্রীতা প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমারের প্রধান বিষয়।

অবশ্য প্রেমেন্দ্র পল্লীবাসীদের নিয়েও কয়েকটি চমৎকার গল্প লিখেছেন, তা ছাড়া খাঁটি

রহস্যের গল্প, প্রকৃতই যা শিল্পপদবাচ্য, বাংলা ভাষায় একমাত্র প্রেমেন্দ্রই এখন পর্যন্ত লিখতে পেরেছেন। বিষয়ের ও বর্ণের নানা বৈচিত্র্য তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়; উদ্ভাবনীশক্তিতে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি যেন তৃতীয় ব্যক্তির মতো ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে যান, আর গল্প নিজে থেকেই গ'ড়ে ওঠে।

অন্যপক্ষে বুদ্ধদেব ঘটনাকে বাদ দিয়ে শুধু মানুষের মনের রহস্য অন্বেষণে ব্যস্ত; ঘটনা তাঁর পক্ষে একটা ছুতোমাত্র। এ কথা মানতেই হবে যে ঘটনা ছাড়াও যে গল্প হ'তে পারে এ দেশে বুদ্ধদেবই তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর আর একটি বিশেষত্ব বাংলা গদ্যকে সচেতন ও কঠিন চেষ্টায় নতুন ক'রে গড়বার চেষ্টা; মনে হয় তিনি নানা সূক্ষ্ম কথা বলতে চান, যার উপযুক্ত ভাষা বাংলায় নেই ব'লে তাঁকেই তৈরি ক'রে নিতে হচ্ছে। এই কারণে তাঁর লেখায় পাওয়া যায় একটি নিজস্ব গদ্য স্টাইল। এ কথা সত্য যে তাঁর সমস্ত গদ্য-লেখায়, গল্পে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে বুদ্ধদেব যে নতুন রচনা-রীতি এনেছেন তাতে বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ পরিণতির একটি ইঙ্গিত স্পষ্ট ধরা পড়ে।

বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, এমন কি প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও প্রথমদিক্‌কার লেখা খানিকটা রোমান্টিক ধাঁচের, যদিও পরে তিনজনে বিভিন্নভাবে বস্তুতন্ত্রের রাস্তাই নিয়েছেন। কিন্তু পুরোপুরি ও আগাগোড়া রোমান্টিক মণীন্দ্রলাল বসু ও মনোজ বসু।

মণীন্দ্রলালের লেখা এককালে আমাদের সকলকেই নেশা ধরিয়েছিলো। তাঁর রচনার সুকুমার লালিত্য এখনো উপভোগ্য।

বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব না থাকলেও আসলে অতি-প্রাকৃতিক গল্প লেখবার দিকে মনোজ বসুর যে ঝোঁক দেখা যায় সেটা রোমান্টিক মনোভাবেরই লক্ষণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরী এক-হিসেবে শৈলজানন্দরই ধারার সহযাত্রী। দু'জনেই কথকতায় দক্ষ। পল্লী-জীবনের সঙ্গে পরিচয়ও নিবিড়। তারাশঙ্করের বিষয়-বৈচিত্র্য, সরোজকুমারের সংযত ভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করে। যদিও শিল্পচাতুর্যে শৈলজানন্দর তুলনা নেই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পল্লীকেই একমাত্র বিষয় করেছেন, কিন্তু তা পল্লী-জীবন নয়, পল্লী-প্রকৃতি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছু মিল থাকলেও মস্ত গরমিল এখানেই। তাঁর গল্পে মানুষের চাইতে গাছপালা ও ঋতুর বিবর্তনই প্রধান। সেই কারণেই তাঁর রচনা একটু উচ্ছ্বাসি, একটু বা তরল। গ্রামের দরিদ্র-জীবনের ভয়াবহতা তিনি ততটা দেখেননি, তিনি বরং তাকে মানসবিলাসে রঙিন ক'রে তুলেছেন, অনেকটা প্রাচীন প্যাস্টোরেল কবিদের মতো।

প্রবোধকুমার সান্যালও গল্প সাহিত্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর সাবলীল বর্ণাঢ্য ভাষা ও তাঁর বিশেষ-ভঙ্গির জোরে। তাঁর ভাষায় ও ভঙ্গিতে মাত্রাবোধের প্রতি যদিও

যথেষ্ট সম্মান সব সময়ে না-ও দেখতে পাওয়া যায়, তবু এই স্বেচ্ছাকৃত অসংযমকে তিনি একটি বিশেষ সুর ফোটাবার কাজেই লাগিয়ে সফল হয়েছেন, এ কথা পাঠকমাত্রকেই স্বীকার ক'রতে হয়।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য—ও অদ্ভুত—লেখক। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে মর্বিড মনে হ'তে পারে; তাঁর গল্পগুলি যেন মানসিক বিকৃতির মিছিল! অতি-সাধারণ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তিনি যে-আনন্দ পান, সাধারণ পাঠকের কাছে তা ভয়াবহ ঠেকতে পারে। আসল কথা জীবনের এমন সমস্ত কোণে-ঘুপ চিতে তিনি গল্প দেখতে পান, যা পাঠক দূরে থাক অন্য-কোনো গল্প-লেখকেরও কখনো চোখে পড়ে না। তাঁর মধ্যে মহৎ ঔপন্যাসিকের উপাদান আছে, ইতিমধ্যেই তিনি এমন দু'খানা বই লিখেছেন, যার তুল্য উপন্যাস বাংলা ভাষাতেই অল্প। ছোটগল্পের চাইতে উপন্যাসেই তাঁর হাত খোলে ভালো, কিন্তু ছোট গল্পেও তাঁর প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। তাঁর রিয়্যালিজম্-এ এক ফোঁটা দয়া নেই; সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে কুশ্রীতা ও ব্যভিচার তিনি এমন নির্লজ্জ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন যে তাঁর ভক্তরাও মাঝে মাঝে পীড়িত বোধ করে! নগর ও গ্রাম উভয় বিষয়েই তাঁর দখল; এবং গ্রাম সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব বোধ হয় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান যুগে পল্লী জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা তিনি দেখেছেন—যা শরৎচন্দ্র কি বিভূতিভূষণ দেখেন নি। প্রাদেশিক ভাষা তিনি যত সহজে ও যত সুন্দর ক'রে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন এ-পর্যন্ত আর কেউ সে-রকম পারেন নি।

অগ্রজ লেখকদের মধ্যে অনেকেই প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখেছেন। এবং তা থেকে নিতে পারলে এ-বইয়ের মূল্য আরো অনেক বাড়তো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, প্রমথ চৌধুরী ও রাজশেখর বসুর কথা বিশেষ ভাবেই মনে পড়ে। তবে এ-বইয়ের উদ্দেশ্য ছিলো শুধু সেই সব লেখককে গ্রহণ করা, যাঁরা নিছক সময়ের দিক থেকে আধুনিক। এ-বইয়ের লেখকদের মধ্যে বয়সে যাঁরা সব চেয়ে ছোট তাঁরা তিরিশ পেরিয়েছেন, আর সব চেয়ে বড়োরা চল্লিশের কিছু ওপরে। সমসাময়িক কি তরুণতর লেখকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য গল্প আর যে কেউ লেখেননি তা জোর ক'রে বলা যায় না, তবে সংগ্রহ-সম্পাদককে এক জায়গায় এসে থামতেই হয়। মোটের ওপর, এই গ্রন্থ প'ড়ে আধুনিক বাংলা গল্পে যা সারবস্তু সে-সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা হয়তো অসম্ভব হবে না এবং পাঠকদের আনুকূল্য পেলে দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের পরিধি আরো বাড়ানোও যেতে পারে।

প্রগতি সাহিত্য ভবন
১লা মাঘ, ১৩৪৫

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

স্বীকারোক্তি

এই বই প্রকাশের জন্যে যাঁরা আমাদের নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন :—

যে সমস্ত লেখক তাঁদের গল্পগুলি নেবার ও সাহিত্যের প্রতি কর্তব্যবোধে যে সমস্ত প্রকাশক সেই গল্পগুলি তাঁদের প্রকাশিত বই থেকে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন এবং নানা কারণে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যে সব প্রকাশকদের আমরা জানাতে পারিনি তাঁদের সকলকেই প্রীতি সাহিত্য ভবনের পক্ষ থেকে প্রকাশক হিসেবে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কোন কোন গল্প কোন প্রকাশকের কি কি বই থেকে নেওয়া হয়েছে :

গল্প	যে বই থেকে	প্রকাশক	
অমর কবিতা	সঙ্কেতময়ী	কাত্যায়নী বুক স্টল	কলিকাতা
ছুরি	ডবল ডেকার	ডি এম লাইব্রেরী	,,
উপযাচিকা	প্রকৃতির পরিহাস	ডি এম লাইব্রেরী	,,
অগ্রদানী	রসকলি	রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস	,,
প্রতিমা	রসকলি	রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস	,,
সিংহাসন	অঙ্গরাগ	নাথ ব্রাদার্স	,,
প্রেতিনী	অঙ্গরাগ	নাথ ব্রাদার্স	,,
শৃঙ্খল	পাঞ্চজন্য (দৈনিক পত্রিকা)	শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪২ সাল, চট্টগ্রাম	
"পুন্নাম"—	বেনামী বন্দর	ডি এম লাইব্রেরী	কলিকাতা
ভিতর ও বাহির	বনফুলের গল্প	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স	,,
পরিবর্তন	অলকা (মাসিক পত্রিকা)	আশ্বিন ১৩৪৫ সাল,	,,
যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ	জন্ম ও মৃত্যু	কাত্যায়নী বুক স্টল	,,
ডাকগাড়ি	জন্ম ও মৃত্যু	কাত্যায়নী বুক স্টল	,,
রাণুর প্রথম ভাগ	রাণুর প্রথম ভাগ	রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস	,,
রাধারাণীর নিজের বাড়ি	অসামান্য মেয়ে	কাত্যায়নী বুক স্টল	,,
তুলসী গন্ধ	মিসেস গুপ্ত	শ্রীগুরু লাইব্রেরী	,,

গল্প	যে বই থেকে	প্রকাশক	
ভৈরনল	ঋতুপর্ণ	শ্রীগুরু লাইব্রেরী	কলিকাতা
পৃথিবী কাদের ?	যুগান্তর (দৈনিক পত্রিকা)	শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৫ সাল,	,,
প্রেতিনী	বনমর্মর	প্রবাসী কার্যালয়	,,
প্রাগৈতিহাসিক	প্রাগৈতিহাসিক	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স	,,
আত্মহত্যার অধিকার	অতসী মামী	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স	,,
লাউডগা	বঙ্গশ্রী (মাসিক পত্রিকা)	চৈত্র ১৩৩৯ সাল, কলিকাতা	,,
দেবতার জন্ম	প্রজাপতির পক্ষপাত	কমলা পাব্‌লিশিং হাউস	,,
সমাপ্তি	নারীমেধ	ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,	এলাহাবাদ
পুঁথি	বঙ্গশ্রী (মাসিক পত্রিকা)	আশ্বিন ১৩৪০ সাল,	কলিকাতা
নিবারণের মৃত্যু	ক্ষণ-বসন্ত	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স	,,

লেখকদের লিপিকুশলতার দিক দিয়ে বিচার না ক'রে তাঁদের নামের বর্ণানুক্রমেই গল্পগুলি সাজাবার সহজ পথ নিয়েছি। আসল বিচারের ভার রইল পাঠকদের ওপরই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে অসংখ্য ধন্যবাদের সঙ্গে জানাচ্ছি :—

কর্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস
শিল্পী ,, অবনী সেন
,, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ধরণীধর সেন
,, কানাইলাল গুপ্ত
,, প্রবীরকুমার মল্লিক
,, পুলকেশ দে সরকার

এঁদের কাছ থেকে নানা দিক দিয়ে আমার এই প্রথম প্রচেষ্টায় আমি যে সহৃদয় সহায়তা ও সহানুভূতি পেয়েছি সে-কথা আমার মনে থাকবে।

বিশেষ ক'রে ব'লতে হয় শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস মহাশয় সম্বন্ধে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও, কারণ তিনি প্রধানতঃ যান্ত্রিক-জগতে বিচরণ করেন, তার মধ্যেও তিনি যে সাহিত্য-প্রীতি এমনভাবে সজীব রেখেছেন, এটা প্রকৃতই বিস্ময়কর। এই দেখে আশা হয়, ব্যবসায় যত বড়ই হোক—বাঙালী কোনোদিনই অবাঙালী হবে না। বাংলায় Industrialism-এর যুগ আসছে,—সুস্বাগত। কিন্তু বাংলার রসের উৎসও কোনোদিন শুকোবে না। বাঙালীর অর্থের বড়ই দরকার কিন্তু অর্থের সঙ্গে অর্থাতীতকেও সে সমান গৌরব দিয়ে যাবে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অমর কবিতা

ও

ছুরি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—জন্ম ১৯০৩ নোয়াখালি। পৈতৃকবাস ফরিদপুর,—১৯১৮ সাল থেকে কলকাতায়। ইনি এম-এ, বি-এল, ১৯৩১ সাল থেকে বাংলা গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে আছেন। এঁর প্রথম প্রকাশিত বই—প্রেমেন্দ্র মিত্র সহযোগে "বাঁকালেখা"—আই-এ পড়বার সময়, যখন একই আশুতোষ কলেজে এঁরা সহপাঠী ছিলেন। স্বকীয় প্রথম রচনা "বেদে"—এম-এ পড়বার সময়, তদানীন্তন কবিতার বই "অমাবস্যা"।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অগ্রবর্তী ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। অচিন্ত্যকুমার সাহসী ও শক্তিমান লেখক। এঁর প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত তেজস্বী ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক। দৃঢ়তায় স্পষ্ট, সাবলীল। উপমায়, বর্ণনায়, ব্যঞ্জনায়, ইনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,—নিজস্বতায় স্বয়ম্প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রিকা "কল্লোলের" সঙ্গে ইনি গভীরভাবে সংলিপ্ত ছিলেন। এঁর কএকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—ইন্দ্রাণী, ঊর্ণনাভ, প্রচ্ছদপট, আসমুদ্র। গল্প—সঙ্কেতময়ী, দিগন্ত, ডবল ডেকার। কবিতা—অমাবস্যা, প্রিয়া ও পৃথিবী।

অমর কবিতা

নির্মলা কী সম্পর্কে আমার মাসি হ'তো। হাটখোলার ওদিকে তার শ্বশুর বাড়ি। বড়ো বেশি আনাগোনা নেই। মাঝখানে শুধু উড়ো একটা খবর পেয়েছিলুম যে তার বছর খানেকের প্রথম খুকিটি এক দিনের জ্বরে হঠাৎ ক'রে মারা গেছে।

জগৎ-সংসারে সেটা এমন কিছু বিচিত্র ঘটনা নয় যে তাকে নিয়ে অকারণ দীর্ঘশ্বাসে একটি মুহূর্তও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবো। খবরের কাগজের টুকরো-সংবাদের মতোই ঐ খবরটার উপর ক্ষণিক চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলুম মাত্র। তলিয়ে দেখলেও এর বেশি নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম না যে, নির্মলার নতুন বিয়ে হয়েছে, তার শরীরে বয়সের সবে বসন্ত, তার সময়ের সমুদ্রে এক বছরের সামান্য একটা খুকির কী বা স্থান, কতোটুকু বা মূল্য!

হারিয়ে যেতে দিয়েছিলুম ঘটনাটাকে। এর মধ্যে একদিন, প্রায় মাসখানেক পরে, নির্মলা আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। ভেবেছিলুম একটা কুৎসিত কান্নাকাটির অভিনয় সুরু হবে। মা'র সঙ্গে নির্মলার এই প্রথম দেখা—তার খুকির মারা যাবার পর। কিন্তু উলটোটা দেখে যেমন আশ্বস্ত হ'লুম, তেমনি তারো চেয়ে বেশি হ'লুম বিস্মিত। শুনলুম, আমার পাশের ঘর থেকে শুনলুম, নির্মলা একবারো সে-কথার কাছ ঘেঁসছে না, এটা-ওটা নিয়ে অবান্তর কথা কইছে, টুকরো-টুকরো কথায় হেসে উঠছে টুকরো-টুকরো ক'রে। তার কথার বিষয় হ'চ্ছে, বাস্-এর রাস্তা যেন আর ফুরোতে চায় না; যা গরম পড়েছে, বৃষ্টি কবে নামবে; আমদের সংসারে মাসে ক'মণ ক'রে লাগে কয়লা!

মা-ও কথাটা ছুঁলেন না টের পেলুম। বললেন শুনতে পেলুম: এই ভর দুপুরে, এতো রোদে—

নির্মলার স্বর হাসিতে পিছলে পড়ছে: না এসে আর কী করি বলো? করবার মতো কাজ তো একটা কিছু চাই হাতের কাছে।

মা বললেন,—পিনুকে কতোদিন থেকে বলছি তোকে একবার দেখে আসতে—

—সেই আমিই এসে একদিন সশরীরে উদয় হ'লাম। হাসিতে তার কথাগুলি যেন রোদ-লাগা রঙিন ঝিনুকের মতো ঝিকমিক ক'রে উঠলো; পিনু, পিণাকী কোথায়? আমি ওর কাছেই এসেছি। ওর সঙ্গে আমার ভীষণ একটা জরুরি কথা আছে।

আমি তখন টেবিলে মাথা নিচু ক'রে ব'সে লিখছিলুম। হঠাৎ আলো-নেবানো অন্ধকার ঘরে জ্যোৎস্নার মলিন, দীর্ঘ একটি রেখার মতো নির্মলা আমার ঘরে, আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার সারা গায়ে বীতবর্ষণ আকাশের সুনীল, সস্মিত প্রখরতা। দু'টি চোখ খুসিতে যেন অগাধ হ'য়ে উঠেছে। তার সাড়ির সব ক'টি ঝিলমিলে রেখায় যেন এই খুসির মৃদু, মদির অনুচ্চারণ।

ব'লে রাখা ভালো, নির্মলা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নেমে এসেছে অবন্ধুর বয়সের সমতায়।

আমার টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে সে জিগগেস করলে; কী লিখছো?

বললুম,—একটা গল্প।

নির্মলা পাশে নিচু একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসলো। বসবার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত ভঙ্গিটি যেন ক্লান্তিতে কোমল হ'য়ে এলো। ভালো ক'রে তার দিকে চোখ ফেরালুম। তার আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন আবির্ভাবের সঙ্গে তার এই ঘন, বিস্তৃত উপস্থিতির যেন কোনো সুসাম্য নেই। সাড়ির কুঞ্চিত সব রেখায় যেন কেমন একটা করুণ আলস্য এলোমেলো হ'য়ে আছে।

ম্লান গলায় সে বললে,—গল্প,—কেন, কবিতা আজকাল আর লেখো না?

স্ট্যাণ্ড-এর গায়ে কলমটা হেলিয়ে রেখে, চেয়ারে পিঠটা ছেড়ে দিয়ে বললুম,—কখনো-সখনো। খুব কম।

লাজুক হাসিতে নির্মলার সমস্ত মুখ ভিজে গেলো। গাঢ়, অথচ করুণ গলায় বললে,—আমি একটা লিখেছি।

ভীষণ অবাক হ'য়ে গেলুম। বললুম—বলো কী, তুমি কবিতা লিখেছ?

কথাটা যেন বিশ্বাসযোগ্য নয় আমার কথা বলার ধরণে তাই বোধ করি নির্মলার মনে হ'লো। দেখলুম গাঢ় লজ্জায় তার চোখের নিম্ন প্রান্ত দু'টি কালো, ঈষৎ সজল হ'য়ে উঠেছে। সে চেয়ারের মধ্যে যেন আরো ডুবে গেলো: নিতান্ত অপরাধীর মতো ভীত, দুর্বল গলায় বললে,—হ্যাঁ, একটা শুধু লিখেছি—শুধু একটা—তা-ও কতো কষ্টে, কতো কাটাকুটি ক'রে।

অনাবিষ্ট নির্লিপ্ত গলায় বললুম,—একদিন দেখিয়ো।

—হ্যাঁ, তোমাকে দেখাবো ব'লেই তো নিয়ে এসেছি। নির্মলা হঠাৎ সর্বাঙ্গে মর্মরিত হ'য়ে উঠলো। দু'টি ভুরু প্রসারিত প্রতীক্ষায় ধনুকের মতো ধারালো।

এতোটা অবিশ্যি আশা করি নি। কবিতা সম্বন্ধে, বিশেষতো প্রথমতম কবিতা সম্বন্ধে লেখকমাত্রেরই একটি স্বাভাবিক সংকোচ থাকে। লোকচক্ষুর কাছে তা প্রকাশিত করা যেন দৈহিক আবরণোন্মোচনের মতোই ভয়াবহ লজ্জাকর মনে হয়। অন্ততঃ আমার তো তাই হ'তো। কিন্তু নির্মলার এই নির্ভীক, নির্মম নির্লজ্জতায় মর্মে-মর্মে কণ্টকিত হ'য়ে উঠলুম।

ব্লাউজের তলা থেকে সে কয়েকটা আল্‌গা কাগজের টুকরো বার করলো। পৃষ্ঠাগুলির নম্বর মিলিয়ে গুছিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে এলো টেবিলের কাছে। গলা নামিয়ে, যেন গভীর কোনো পাপ স্বীকার করছে, নির্মলা বল্‌লে,—কাউকে ব'লো না কিন্তু। এই একটা মাত্র লিখেছি—আজ প্রায় একমাস ধ'রে। দয়া ক'রে তুমি শুধু একটু জায়গায়-জায়গায় দেখে দাও। সব জায়গায় সমান মেলাতে পারি নি।

কাগজের টুক্‌রোগুলি হাতে নিয়ে কৌতুহলী হ'য়ে জিগ্‌গেস্ ক'রলুম; সমস্তটাই একটা কবিতা?

নির্মলা তার চেয়ারে ফিরে গেলো। বল্‌লে, হ্যাঁ। তবুও তো সব কথা এখনো লিখ্‌তে পারি নি। তুমি দেখনা প'ড়ে। বলো না কী কথা আর লেখা যায়।

রুদ্ধ নিশ্বাসে কবিতাটা পড়তে লাগ্‌লুম। নির্মলার প্রতি আত্মীয়তার খাতিরেই সেটাকে কবিতা বল্‌ছি। নিতান্ত সে কাছে, নাগালের মধ্যে ব'সে আছে; নিতান্তই সে মেয়ে, সমস্ত শরীরে তার এমন স্নেহশীতল শোকের শীর্ণতা; তার বসবার উদাস ভঙ্গিতে ধূসর প্রেতচ্ছায়া—তাই সে কবিতা প'ড়ে প্রবল উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠ্‌তে পারলুম না। নইলে এ কবিতা এমনি হাতে এসে পড়লে, শপথ ক'রে ব'লতে পারি, আজ আমাদের বৈকালিক সাহিত্য আড্ডায় প্রচুর একটা হাসির ভোজ দিতুম।

অনেক পরিশ্রম যে সে করেছে তাতে সন্দেহ নেই, করেছে অনেক কাটাকুটি, তার অনেক প্রসাধন,—কিন্তু ছন্দ বা মিল দূরে থাক্ একটা বানান পর্যন্ত সে শুদ্ধ ক'রে লিখ্‌তে পারেনি। বিষয়টা মিল্‌টনের প্যারাডাইজ-লস্ট-এর মতোই গুরু-গম্ভীর; তার খুকির মৃত্যুর উপর এক প্রকাণ্ড শোক-গাথা। কোথাও পার দেখা যাচ্ছে না, একটা বন্যা-আবিল উদ্বেল সমুদ্র যেন দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

তবু সব কথা নাকি সে লিখ্‌তে পারে নি। আর কী কথা লেখা যেতো তাই ভেবে আমি অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লুম। তার খুকি দিব্যি হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে যেতো, আল্‌নায় তার জন্যে জুতো সাজিয়ে রাখা যেতো না, জলের কুঁজোটা সে দু-দু'বার ভেঙেছে—কোনো কথাই সে বাদ দেয় নি। তার উপর-মাড়িতে ছোট-ছোট দু'টি দাঁত উঁকি মারতো,

দাঁত ওঠ্‌বার সময়টায় তার কী রকম অসুখ হয়, কোন্ ডাক্তার আসে—সব কথা সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পত্তাকার ক'রে তুলেছে। তাকে কে কী নামে ডাক্‌তো, দিয়েছে তার একটা লম্বা ফিরিস্তি; শুধু নির্মলার দেয়া 'বুড়ি' ব'লে ডাকলেই সে বেশি সাড়া দিতো, তার বাঁ কাঁধের উপর ছোট একটা জড়ুল ছিলো, কবে ও কতোবার সে বস্‌তে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মেঝের উপর প'ড়ে গেছে—এমনি দিনের পর দিন, পর্বের পর পর্ব, নির্মলা এক বিরাট মহাভারত লিখে এনেছে। তার অশিক্ষিত শোকের এই উচ্ছৃঙ্খল আড়ম্বর দেখে, বল্‌তে কি' তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধালু হ'তে পারলুম না।

বল্‌লুম, চাপা বিরক্তির স্বরে বল্‌লুম,—এটাকে কি ক'রতে হবে?

নির্মলা উৎসাহে জ্ব'লে উঠ্‌লো; নরম গলায় জিগ্‌গেস ক'রলে,—কেমন লাগলো? চলবে?

ভীষণতরো অবাক হ'লুম: বল্‌লুম,—কোথায়?

—যে কোনো মাসিক পত্রে। তোমার সঙ্গে অনেকেরই তো চেনাশোনা। কোথাও চালিয়ে দিতে পারবে না?

কী বলা যায় কিছু ভেবে না পেয়ে ব'লে বস্‌লুম—বড্ড বড়ো হয়েছে যে।

—কই আর বড়ো! ছাপ্‌লে এই একটুখানি হ'য়ে যাবে। নির্মলা তার ম্রিয়মান দু'টি চোখ আমার মুখের উপর তুলে ধরলো: তবু তো আরো কতো কথা লেখ্‌বার ছিলো; আরো কতো কথা লিখ্‌লে তবে বুকটা ঠাণ্ডা হ'তো।

এবার অপরিমাণ কঠিন হ'তে হ'লো। বল্‌লুম,—কিন্তু কিছুই কবিতা হয় নি যে।

—সেই জন্যেই তো তোমার কাছে আসা। নির্মলা লঘু গলায় হেসে উঠ্‌লো; জায়গায়-জায়গায় মিলগুলি একটু ঠিক ক'রে দাও না। তোমার পাকা হাতে কতোক্ষণ আর লাগ্‌বে?

—শুধু মিল ঠিক করলেই কি হবে? তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অসহায়ের মতো ব'লে ফেল্‌লুম: তোমার এ-লেখা সম্পাদকরা কেউ ছাপবে না।

—কেন? নির্মলা যেন শতখান হ'য়ে ভেঙে পড়লো।

—কেনই বা ছাপবে বলো? তোমার মেয়ে মরেছে তাতে বাংলা দেশের পাঠকদের কী এসে গেলো? তাকে কে চিন্‌বে?

নির্মলা প্রখর, ঝাঁজালো গলায় বল্‌লে,—তবে এতো যে রাশি রাশি প্রেমের কবিতা বেরোয় মাসে মাসে, তাতেই বা আমাদের, পাঠকদের কী এসে যায়? তাদের মধ্যে কা'কে আমরা চিনি? সব তো আগাগোড়া মিথ্যে কথা, কেবল কতোগুলো কথার মার প্যাঁচ।

হেসে বল্‌লুম,—কিন্তু ওগুলোর মাঝে ব্যক্তিক সীমা পেরিয়ে একটা বিশ্বলৌকিক আবেদন থাকে।

নির্মলা আমার দিকে হতভম্বের মত চেয়ে রইলো।

বললুম বুঝিয়ে : ওগুলো এমনভাবে লেখা হয় যাতে পাঠকরা সবাই লেখকের সঙ্গে সমান অনুভব ক'রতে পারে।

নির্মলা ফের উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো ; বললে,—আমারটাও তো তাই। এমন কোন বাড়ি পাবে তুমি বাংলা দেশে, যেখানে কোনো-না-কোনো মা'র বুক খালি ক'রে তার শিশু যায়নি পালিয়ে? আমার কবিতা প'ড়ে সে-সব মেয়েরা নিশ্চয় তাদের দুঃখে সান্ত্বনা পাবে।

তর্ক করা বৃথা। কাগজের টুকরোগুলির উপর একটা বই চাপা দিয়ে রেখে বললুম,—ও থাক। আমি তোমাকে আর একটা নতুন কবিতা লিখে দেবো।

নির্মলা পাংশু মুখে বললে—সে কবিতায় তুমি আমার এতো কথা কখনোই লিখে দেবে না।

—তা একটু ছোট হবে বৈ কি। কিন্তু আশা করি, কবিতা হবে।

—থাক আমার সে কবিতা। যে কবিতায় আমার 'বুড়ি' নেই, আমি তা দিয়ে কী ক'রবো? ব'লে ক্ষিপ্র হাতে কাগজের টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে নির্মলা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

হাসলুম মনে মনে হাসলুম। নির্মলা তার বাড়ী ফিরে গেলে, সবাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চগ্রামে গলা ছেড়ে দিলুম। ঠাট্টায় আর-সবাইও শানিয়ে উঠলো। ভাগ্যিস তার মেয়ে মরেছিলো, তাই তো নির্মলা মাসান্তে এমন একটি জলজ্যান্ত কবি হ'য়ে উঠতে পেরেছে। সেই নির্মলা, নিজের নামের বানান করতে পর্যন্ত যে হোঁচট খায়। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে।

সবাই মত স্থির ক'রলে এই ব'লে যে এটা ভীষণ বাড়াবাড়ি : শোচনীয় প্রায় হাস্যাস্পদের কোঠায় এসে পড়েছে। অল্পজলের পুঁটিমাছই বেশি ফরফর করে,—এ হচ্ছে এক রকমের ঢং। দুঃখটা সত্যিকারের হ'লে তা নিয়ে আর এমন সে জাঁক ক'রে বেড়াতো না, চুপ ক'রে যেতো। যেখানে যতো বেশি ফাঁপা সেইখানেই ততো বেশি বাজনা বাজে। যেখানে যতো বেশি কথা, সেখানে ততো কম গভীরতা, কেউ চ'লে গেলে নাকি তার জন্যে কবিতা ক'রে কাঁদতে হয়।

তারপর অনেকদিন নির্মলার সঙ্গে দেখা নেই।

একদিন বিকেলের দিকে ও-পাড়ায় গিয়ে পড়েছিলুম ব'লে নির্মলাকে একবার দেখে যেতে ইচ্ছে হ'লো। বাড়িতে লোকজন বিশেষ নেই, তার স্বামী নারায়ণের তখনো বাড়ি ফেরবার সময় হয় নি। এজমালি ঝি নিচে কাজ করছিলো, দরজাটা খোলা। সটান উপরেই উঠে গেলুম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁ-হাতি নির্মলার ঘর। এ-পাশে ও-পাশে অন্যান্য ভাড়াটেদের

এলেকা, পরদা ও পার্টিশানে খণ্ড-বিখণ্ড। যে দুয়েকবার এসেছি তাতে ওদের বাড়ীর চৌহদ্দিটা আমার মুখস্ত।

দরজার সামনে সম্মোহিতের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। নিচে, মেঝের উপর দরজার দিকে পিঠ ক'রে, উবু হ'য়ে আধখানা শুয়ে নির্মলা গভীর অতন্দ্র মনোযোগে কি যেন সূক্ষ্মতাসূচক কাজ করছে। পিঠময় চুল রয়েছে ব্যস্ততায় এলোমেলো, বিপর্যস্ত সাড়িতে কী যেন তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণুতা। যেন আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না—তার সমস্ত ভঙ্গিতে [illegible] দুঃসহ ঔৎসুক্য।

ডাকলুম: নির্মলা।

যেন কতোগুলি শিহরায়মান, বিশীর্ণরেখা নির্মলার সারা শরীরে ছিটিয়ে পড়লো। এ ক'দিনে তার চেহারার যে এতোটা পরিবর্তন হবে আশা ক'রতে পারিনি। আমাকে দেখে সে সহজ সৌজন্যে—হেসে উঠ্‌লো বটে, কিন্তু সেই হাসি ধুয়ে দিতে পারলো না তার চোখের অনিদ্রা, তার শরীরের ক্লান্তি, তার পরিপার্শ্বের এই গুমোট নির্জনতা—

সে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—ব'সো।

বল্‌লুম,—কী করছিলে ব'সে ব'সে?

অসংকোচ হাসিমুখে সে বল্‌লে,—ছবি আঁকছিলুম!

—ছবি আঁকছিলে? অবাক হ'য়ে জিগ্‌গেস করলুম'—কার?

—কার আবার! দেয়ালের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে সগর্বে বল্‌লে—দেখ্‌ছ [illegible] এরি মধ্যে একা একা কতো ছবি এঁকে ফেলেছি!

চারদিকের দেয়ালে অগুন্তি ছবি টাঙানো। তার চোখ অনুসরণ ক'রে বল্‌লুম [illegible] অনেক রকম ছবি আঁকতে শিখেছ যে। একটা খরগোস, একটা ইঁদুর—ক্যাঙ্গারুর ছ[illegible] কিন্তু চমৎকার হয়েছে।

অনর্গল কণ্ঠে নির্মলা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো; বল্‌লে কোনোটাই খর[illegible]-ইঁদুরের নয়।

—নয়?

—না, সব আমার সেই খুকির ছবি। নির্মলার মুখে সেই হাসি কিন্তু এখনো অস্ত যায় নি; তার নানা ধাঁচের, নানা ভঙ্গির ছবি ওগুলো,—কোনোটায় ব'সে, কোনোটায় হামাগুড়ি দিচ্ছে,—কোনোটায় বা চিং হ'য়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলা ক'রছে। ওর কোনো ফটোগ্রাফ তুলে রাখিনি কিনা, তাই বড়ো অসুবিধা হয়। কোনোটা হয় খরগোস, কোনোটা হয় ক্যাঙ্গারু। নির্মলা আরেক পশ্‌লা হাসলো।

অপ্রতিভ হ'য়ে বল্‌লুম, না না তা মন্দ হ'য়েছে কী!

—মন থেকে আঁকতে হয়, অথচ মন হাতড়ে দেখি তার চেহারার এক কণাও আর মনে

নেই। নির্মলা স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লে,—তার কপালটা চওড়া ছিলো না ছোট ছিলো মনে করতে পারি না। নাকটা চোখা করবো না দু'পাশে একটু ফুলিয়ে দেবো ভেবে-ভেবে আমার দিন কেটে যায়। আর তার পায়ের গোড়ালি দু'টোর গড়ন শত মাথা খুঁড়লেও মনে আসে না। মহা মুস্কিলেই পড়া গেছে।

বল্‌লুম,—অনেক ছবিই তো আঁকলে, আর কেন?

—তবু একটাও মনের মতো হচ্ছে না—নির্মলা হাসিতে ঝিলিক দিলে, তুমিও তো গল্প-কবিতা আর কম লেখোনি, তবু থামতে পাচ্ছ কই? জীবনের শেষ মুহূর্ত লিখেই যেতে হ'বে—কি বলো?—বাঁচতে হবে তো?

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালুম: তোমার সেই কবিতাটা কী করলে?

—ছাপিয়ে তো আর দিলে না, তাই, মুচকে হেসে নির্মলা বল্‌লে,—তাই ওটাকে বাঁধিয়ে দেয়ালের ঐ খানটায় টাঙিয়ে রেখেছি। আমি একাই পড়ি, কী আর করবো বলো, আমার দুঃখ তো আর পৃথিবীর সন্তানহারা মায়েরা কেউ বুঝলো না, আমিই ওটা পড়ে' পড়ে' তাদের সবাইকার দুঃখ বুঝি।

বিতৃষ্ণ গলায় বল্‌লুম,—মিছিমিছি তুমি এ-সব করছ কেন?

—বল্‌লুম না, বাঁচতে হ'বে তো?

তার মুখের উপর কটাক্ষের তীব্র একটা প্রহার করলুম: বাঁচতে গিয়ে শরীরের যা হাল করেছ, নমুনাখানা একবার চেয়ে দেখেছ আয়নায়?

নির্মলা তেমনি দুঃখলেশহীন, প্রশান্ত মুখে হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লে,—আমি গেলে যাবো, কিন্তু আমার খুকি তো বাঁচবে। অন্তত আর সব লেখক বা শিল্পীর মতো আমিও তো এই স্পর্ধা নিয়ে মরতে পারবো।

এবার আরো অন্তরঙ্গ হ'য়ে এলুম। আর্দ্র, নিম্ন স্বরে বললুম,—যে সারা জীবনের মতো চলে' গেছে তার ছায়া আঁকড়ে থাকবার এই আড়ম্বরে লাভ কী, নির্মলা?

—চলে' গেছে বলছ কী! নির্মলা রৌদ্রঝলসিত অসির মতো উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো: তাকে আমি যেতে দিলুম কই? এখন সে দিব্যি ভাঙা ভাঙা পায়ে হাঁটতে শিখেছে, আধো আধো গলায় স্পষ্ট সে আমাকে এখন 'মা' বলে ডাকে। তার জন্যে এখন দস্তুর মতো আমি ফ্রক্‌ সেলাই করছি। ঐ দেখ, রাত্তির বেলা সে আমার কাছে এসে শোয়। বলে' খাটের পাতা বিছানাটার দিকে ইসারা করে' সে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লো।

দেখলুম ছোট একটা বালিসে মাথা দিয়ে বড়ো একটা ডল্‌ শুয়ে আছে, গলা পর্যন্ত তার একটা কাঁথা টানা। শিয়রের কাছে ছোট ছোট কতোগুলি কাঁথার স্তূপ। খাট থেকে যাতে না পড়ে' যায় সেই জন্যে মোটা একটা পাশ-বালিসের ভার চাপিয়ে তাকে নির্জীব, আবৃত করে' রাখা হয়েছে।

চমকে উঠলুম : এ কী ?

নির্মলা আরেক চোট হেসে উঠলো : বুঝছো না ? ও আমার খুকি। একা একা শু কিছুতেই আমার ঘুম আসে না।

নির্মলার শাশুড়ির সঙ্গে কথা হ'লো। তিনি নির্মলাকে ব্যঙ্গে ও ভৎসনায় জর্জর কে তুল্লেন। লক্ষ্য করলুম নির্মলার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, ফিকে হ'য়ে আসা দিনে আলোয় এক মনে তার ছবি এঁকে চলেছে। এদিকে সংসার গেলো [illegible], শাশুড়ি বকে যেতে লাগলেন। আর উনি কিনা হাতা খুন্তি ফেলে রঙ আর [illegible] নিয়ে বসেছেন সমস্ত কিছুরই একটা সীমা আছে, শ্রী আছে—তা সুখই বলো, আর [illegible] বলো। তোম কিসের দুঃখ জিগ্‌গেস করি ? এই উজোন বয়সে, একটা ছেড়ে কতো [illegible]লের তুমি মা হ'বে পা ছড়িয়ে কাঁদবার তোমার সময় কোথায় ? যার জন্যে শোক করছ [illegible] জন্যে তো দুঃ পায় না, পায় যে শোক করছে তাকে দেখে হাসি। যাও, উনুনে এবা[illegible] আগুন দাও যাও।

—এই যাচ্ছি মা, নির্মলা তার ছবির উপর ঝুঁকে পড়লো : আর একটুখানি শুধু বাকি।

নারায়ণ এলো, আফিস ফেরৎ। দেয়ালের পর দেয়ালের আড়ালে দিন গেছে তখ হারিয়ে। ঘরের মধ্যে অশরীরী অবাস্তবতার একটা দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। সেই সঙ্করগা নিঃশব্দ ধূসরতায় নির্মলাকে যেন আর পৃথিবীর মানুষ বলে' মনে হচ্ছিলো না।

নারায়ণ বেশ বিষয় বুদ্ধিতে আঁটোসাটো, নিরেট ভদ্রলোক। তার একটা সহ পরিমিতিবোধ আছে। গোড়ায় গোড়ায় দুঃখটা তাকেও লেগেছিলো প্রচণ্ড, কিন্তু পুরুষের ধর্ম, ক্ষতিকে সে বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে, হৃদয় দিয়ে নিষ্পরিমাণ করে' তোলে না গোড়ায় গোড়ায় নির্মলার প্রতি সম-মমতায় সেও উচ্ছ্বসিত ছিলো, কিন্তু এখন একেবারে বিরক্তির অসহনীয়তার শেষ প্রান্তে এসে পৌচেছে। এখন দু'জনেই তারা একা : তাদে শয্যার মাঝখানে খুকির মৃত মূর্তি।

শেষে, কটূক্তিতে নারায়ণ নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেছে। আমাকে লক্ষ্য করে' [illegible]কে শুনিয়ে সে বল্লে,—দিন-রাত কেবল খুকি আর খুকি। খুকি ছাড়া ওর জীবনে যেন আর কোনো জগৎ নেই।

—তা ছাড়া আবার কী। হাওয়ায় বেঁকে যাওয়া ছবিগুলি দেয়ালের উপর সোজা করে' বসাতে বসাতে নির্মলা বললে,—খুকিকে পাবো বলে'ই তো আমি—আমার সব।

—তাই আমার একেক সময় সখ হয়, পিন্টুবাবু, নারায়ণ হেসে বল্লে—মরে' যদি এমনি সেবা পাই। না মরলে তো আমরা মূল্যবান হ'তে পারি না।

সেই ঈষৎ-ঘনিয়ে-আসা থমকে-দাঁড়ানো অন্ধকারে নির্মলা হঠাৎ ভয়ার্ত চীৎকার করে' উঠলো : তা হ'লে বল্‌তে চাও খুকিকে আমি একেবারে হারিয়ে যেতে দেবো ? মেঝে

দেয়ালে কোথাও তার একটা চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না? তাহ'লে সেই ভীষণ শূন্যতায় আমি বাঁচবো কী করে'?

নারায়ণ বল্লে,—কিন্তু সব কিছুরই একটা শেষ আছে। এমন কী সময়ের পর্যন্ত। আতিশয্যকে আমরা কক্‌খনো বিশ্বাস করি না। তোমার এই শোকের উৎসব দেখে সবারই সন্দেহ হয়, নির্মলা, সত্যি সত্যি তুমি এখনো খুকিকেই ভালবাসছ, না, নিজের এই দম্ভকে?

—না, খুকিকে আমি কোনো দিনই ভালোবাসিনি তো। নির্মলা অন্ধকারে অদ্ভুত করে' হেসে উঠলো: তুমি তো সে কথা বল্‌বেই। তাকে হারিয়ে আমার কতো ঐশ্বর্য, কতো সুখ।

অন্ধকারে অবরুদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো নির্মলা ঘর থেকে ধীরে ধীরে বা'র হ'য়ে গেলো।

—পাগল! একেবারে ছেলেমানুষ। নারায়ণ অসহায়ের মতো বল্লে,—কে তাকে বোঝাবে, কে বা করবে বারণ? আমার কাছে পর্যন্ত সে আজকাল প্রচ্ছন্ন। আমাকে মনে করে যে তার খুকির শত্রু, তার খুকির কথা আমি ভুলিয়ে দিতে চাই।

বল্লুম,—এখান থেকে ওকে নিয়ে যান না-হয়।

—পাগল! কে ওকে সে-কথা বল্‌বে? এই ঘরে ও শেকড় গজিয়ে বসেছে। বাড়ি বদলানোর কথা পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারে না। নারায়ণ গলা নামালো: আর-আর বাসিন্দাদের কাছ থেকে কম গঞ্জনা, কম বিদ্রূপ তো ওর সহ্য করতে হয় না—তাতেও ওর হুঁস্ নেই।

যাবার উদ্যোগ করতে-করতে বল্লুম—এতো বাড়া-বাড়ি দেখ্‌লে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেই।

—বাইরের লোকের কথা ছেড়ে দিন, এমন কি আমার পর্যন্ত আর সহানুভূতি দেখাবার প্রবৃত্তি হয় না। নারায়ণের গলা রুক্ষ হ'য়ে এলো: খানিকক্ষণ পর্যন্ত সহানুভূতি দেখানো যায়, তারপরেই সেটা বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠে। নইলে ভাবুন, ঘুমের মধ্যে বারে বারে উঠে সে পুতুলের কাঁথা বদলায়, সময় মতো রোজ স্নান করায় লুকিয়ে, নিজের খাবার সময় ওটাকে কোলে নিয়ে বসে। পাশের বাড়ির একটা ঘরে ওটাকে এক সময় রেখে এসে বাইরের থেকে দরজায় ঘা মারে: আমার খুকু কি তোমাদের বাড়ি এসেছে? নারায়ণ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলো: কিছু বল্‌তে যান, কেঁদে বাড়ি মাথায় করবে। স্ত্রীর অনেক রকম ফ্যাসান্ জোগাতে হয় শুনেছি, কিন্তু আমার কপালে হয়েছে এ নতুন রকম।

নামছি, সিঁড়ির উপর নির্মলা আমাকে ধরে' ফেল্‌লো। বল্লে,—তোমাকে একটা জিনিষ কিন্তু এখনো দেখানো হয় নি।

বল্লুম,—কী?

—এতকাল কাদা দিয়ে খুকির একটা মূর্তি গড়ছিলুম। সেটা এখনো শেষ হয় নি। আরেক দিন এসে দেখে যেয়ো।

বাড়িতে ফিরে আত্মীয় মহলে সবিস্তারে সেই কাহিনী বললুম। খুকি আঁকতে ইঁদুর এঁকেছে, পুতুলের সে কাঁথা বদ্‌লায়! হেসে সবাই কুটপাট্‌। এমন ঢঙের কথা বাপের জন্মে কেউ কোনোদিন শোনে নি।

অথচ এরাই একদিন তার সন্তান বিয়োগে গভীর সান্ত্বনা দিয়েছিলো। সেই শোকের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এখন সন্দিহান হ'য়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, তারপর, অনেক দিন পর, একদিন খবর পেলুম নির্মলা শোকের সমস্ত সাজসজ্জা বিসর্জন দিয়ে একান্তরূপে হাল্‌কা, সহজ হ'য়ে উঠেছে। ছিঁড়ে ফেলেছে সে দেয়ালের সব ছবি, পুড়িয়ে দিয়েছে সেই কবিতাটা, পুতুলটা ভেঙে টুকরো টুকরো। খুকির কথা আজ যে তাকে বল্‌তে আসবে তার উপর সে খড়্গহস্ত। তখুনিই দেবে তাকে আঁচড়ে, কামড়ে, ক্ষতবিক্ষত করে'। খুকিকে সে আজ নিশ্চিহ্ন ভুলে গেছে।

তাকে দেখতে গিয়েছিলুম। একতাল কাদা দিয়ে সে একদিন খুকির মূর্তি গড়বার কল্পনা করেছিলো, গিয়ে দেখি, তাতে সে নিজেরেই মূর্তি তৈরি করে' বসেছে। ঘরটা বাইরে থেকে শিকল দেয়া। নারায়ণ বললে, এ সময়টা সে কিছু ভালো থাকে, হয়তো আপনাকে চিনতেও পারে বা।

নারায়ণের সঙ্গে পা টিপে টিপে সেই ঘরে ঢুক্‌লুম। শুভ্রতায় উলঙ্গ সে ঘর। শূন্য মেঝের উপর এক পিণ্ড মাংসের মতো তালগোল পাকিয়ে নির্মলা বসে' আছে। আঙুলের সূক্ষ্ম নখ দিয়ে একমনে মেঝেটা চিরে ফেলবার চেষ্টা করছে, আমাদের উপস্থিতিতে তার চার পাশে কোথাও এতোটুকু আবর্ত উঠলো না। উদাসীনতায় সে অখণ্ড।

নারায়ণ বল্‌লে,—একে চিনতে পারো, নির্মলা? চেয়ে দেখ দিকি।

নির্মলা চোখের একটি পালকও তুললো না। মেঝের দিকে তাকিয়ে আপন মনে নিঃশব্দে হেসে উঠলো। তার ঠোঁটের উপর হাসির সেই অশরীরী, বিশীর্ণ রেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভয় করতে লাগ্‌লো। তবু সাহস করে' তার কাছে গিয়ে ডাকলুম: নির্মলা।

এবারো তার সাড়া নেই। শুধু হাসির সেই বঙ্কিম রেখাটি আলস্যে আরো প্রসারিত হ'য়ে পড়লো। কী ভঙ্গি দেখে নারায়ণ হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে বললে, এবার পালাই চলুন, এখুনি আবার ভায়োলেণ্ট হ'তে সুরু করবে।

পালিয়ে এলুম। নারায়ণ দরজাটা বন্ধ করে' দিলো।

ছুরি

আমি যে কেন এখনো বিয়ে করি নি তার একটা খুব সহজ কারণ আছে। কারণ আর কিছুই নয়, যতোই আয়ু যাচ্ছে পিছিয়ে, মেয়েরা ততোই যাচ্ছে এগিয়ে। আর আমি উদ্যততম মুহূর্তে অগ্রসরতম মেয়ে চাই।

কাজে-কাজেই ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীতে বিয়েটা ঘটে' ওঠেনি। সমস্ত কুমারীত্বের উপর একাধিপত্য করছি এমনি একটা গর্বে মনে-মনে বিস্ফারিত ছিলুম। মানে যে-কাউকে যে-কোনো মুহূর্তে বিয়ে করতে পারি এই যে একটা দিগন্তবিস্তৃত সুখ এটা পুরাকালের বহু-পত্নিত্বের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

এই পর্যন্ত যতো জায়গায় বদলি হ'য়ে গেছি, কতো মেয়ে দেখে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বলা বাহুল্য, আমার চাকরিটা মেয়ে দেখে বেড়ানোর পক্ষে ভারি অনুকূল ছিলো। আর সেটা এমন চাকরি, যেখানে আমার মতটাই প্রথম ও আমার মতটাই শেষ। তাই যেখানেই পা দিয়েছি সেখানেই কন্যা-কণ্টকিত বাপের দল অনর্গল আমার দ্বারস্থ হয়েছেন। বিয়ে করবো না আমার এমন কোনো নীচ প্রতিজ্ঞা ছিলো না। তাই বহু মেয়েই আমাকে দেখতে হয়েছে। এবং আশ্চর্য, সবাইকেই আমি অকায়ক্লেশে একে-একে পছন্দ করে' এসেছি।

প্রশস্ত রাস্তাটা যদি আমার মনঃপূত না হয় সেই জন্যে অনেক মেয়ে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চেয়েছে। অবিশ্যি তাদের মায়েদের মত নিয়ে। কিন্তু

নিভুল বিয়েই যখন করবো তখন কাকে ভালোবাসলুম কি বাসলুম না, কবিত্ব করলুম কি করলুম না, বিপদ ঘটালুম কি ঘটালুম না, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, বিয়ে যেই করলুম অমনি বিস্তীর্ণ পৃথিবী একটা তক্তপোষ হ'য়ে উঠলো আর প্রকাণ্ড আকাশটা হ'য়ে দাঁড়ালো একটা মশারি!

এই চমৎকার আছি—আমি আর আমার সাইকেল।

কিন্তু বিধাতার চক্রান্তে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম, সেখানে পাট-শাক আর তামাক পাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাথার উপরে আকাশ নেই তা আমি বরং কল্পনা করতে পারতুম কিন্তু দিনে-রাত্রে ঘুণাক্ষরেও একটি তরুণীর দেহ-রেখা দেখতে পাবো না এ একেবারে দুঃসহ দুর্দিনেও ধারণার অতীত ছিলো। জায়গাটা এমন বিশ্ববহির্ভূত যে মাইনর-ইস্কুলের উপরে মেয়েদের এখানে ক্লাশ নেই। এমন একটা কোনো হল্লা বা হুজুগ নেই যে সাড়ির ছুটো চঞ্চল খস্‌খসানি অন্তত শোনা যায়। স্টেশনে যেতে হ'লে ঘোড়ার গাড়িটা এদের কাঠের একটা সিন্দুক হ'য়ে ওঠে। কারু বাড়ি থেকে কারু বাড়িতে বেড়াতে যাবার যে এদের রাস্তা সে আর-কারুরই বাড়ির ভিতর দিয়ে। এখানে এখনো এমন একটা ঝড় উঠলো না যে মেয়েরা ত্রস্ত হ'য়ে দ্রুত হাতে ঘরের জানালাগুলো বা বন্ধ করে' দেবে। এখানকার অফিসারগুলোও এমন প্রাদেশিক, সস্ত্রীক বেড়াতে বেরুবার পর্যন্ত কারু সাহস নেই। রোদ্দুরে হলদে হ'য়ে যাওয়া শুকনো মাঠের উপর দিয়ে কেবল সাইকেল চালিয়ে চলেছি।

এমন যে মহিমাময় সূর্যোদয়, জীবনে তা কখনো দেখিনি: তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে' মনে হয় নি। কিন্তু আজ তিন মাস এই মহকুমায় এসেছি, সাইকেলে করে' কত চক্র আবর্তন করলুম, কিন্তু ঘাটে বা মাঠে জানলায় বা উঠানে এমন একটি মেয়ে দেখলুম না যাকে ক্ষণকালের জন্তও তার ইহজন্মের ঘোরতর দুর্ভাগ্যের কথাটা মনে করিয়ে দিতে পারি। কেননা এমন মেয়ে দেখতেই আমার ভালো লাগবে যে সঙ্গোপনে একবার জানবে, অন্তত আমি ভাববো সে ভাবছে, এর যদি মিসেস হ'তে পারতাম—এবং তক্ষুনিই সচেতন হ'য়ে ভাববে, অন্তত আমি বুঝবো সে ভাবছে, এখনো তো তার সময় যায়নি! আমি যে হ'বো না, কিন্তু আমি যে হ'তে পারি—এই দর্পণের ভিতর দিয়ে একটি সাধারণ মেয়েকেও আমি আজ অপরূপ সুন্দর করে' দেখতে পারতুম, কিন্তু মুখোমুখি না হ'লে সেই বা ভাববে কী, আর আমিই বা বুঝবো কী!

লাল-ফিতে বাঁধা ফাইলগুলো অনিদ্রাক্লান্ত রাত্রির কদর্য ক্লেদের মতো অসহ্য হ'য়ে উঠলো, বৈকালিক ক্লাবটা একটা পিঞ্জরাবদ্ধ চিড়িয়াখানা, সাইকেল ঘূর্ণিত রাস্তাগুলি একটা ক্রমান্বিত কর্তব্য। এমন যে এখানে প্রসারিত প্রকৃতি, নীলে আর শ্যামলে, তাতে পর্যন্ত এতটুকু প্রাণ নেই। কেননা, আমি ভেবে দেখেছি, অনুচ্চারিত মনে কোনো রমণীর স্মৃতির সুষমা

না থাকলে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করা যায় না, সে নিতান্তই তখন একটা মানচিত্র হ'য়ে ওঠে।

এমনি যখন কচুরিপানা ধ্বংস ও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঘোরতর ব্যাপৃত আছি, হঠাৎ একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটে' গেলো। হ্যাঁ, সেটাকে ঘটনাই বলতে হয়। অবাক হ'য়ে ভাবলুম, এ আমি এতদিন ছিলুম কোথায়!

রেলোয়ে স্টেশনটা সহর থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে। বসতিবিরল ক্ষেতের উপর দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সুরকির রাস্তাটা স্টেশন ছুঁয়ে লোকাল-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা হ'য়ে গ্রামের মধ্যে চলে' গেছে। সেই সন্ধিস্থলের কাছাকাছি ছোট একটা মুদি-দোকান। দোকানটা এর আগে কোনোদিন আমার চোখে পড়েছে কিনা মনে করতে পারলুম না, যদিও টুর শেষ করে' বহুদিন এরই পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আজ হঠাৎ সেই দোকানটা চৌরঙ্গীর শো-কেসের চেয়েও জাঁকালো মনে হ'লো।

নিচু আটচালায় বাঁশের মাচা বেঁধে এই দোকান—ভিতরের দিকে দরজা দেখে বোঝা যায় অন্তরালে দোকানির অন্তঃপুর আছে। মাচার উপরে কতগুলি মাটির গামলায় নানা রকমের ডাল, নুন, শুকনো লঙ্কা, আদা-হলুদ থেকে এলাচ-সুপুরি, জাপানি কিছু খেলনা, গৃহস্থালীর টুকিটাকি জিনিস, গ্রাম্য প্রসাধনের সস্তা সাজ-সরঞ্জাম। দোকানের লাগোয়া খানিকটা জমিতে ঘোড়ার একটা আস্তাবল, সন্ধ্যের ট্রেনের সময় হ'য়ে এসেছে বলে' কোচোয়ান গাড়ি জুত্‌ছে।

দোকানে ভিড় দেখে হিসেব করে' দেখলুম আজ হাট-বার। পসারিরা সহরের বাজারে কেনা-বেচা করে' বাড়ি ফেরবার মুখে এখান থেকে কেউ রাণী-মার্কা তেল, কেউ বা কড়াইয়ের ডাল, কেউ বা এটা-সেটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এত সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখে' আমার উপায় ছিল না, যদিও দৃশ্যত সেখানে আমি নেবে পড়েছিলুম কাউকে দিয়ে একটা দেশলাই কেনবার জন্যে।

'এই ছোঁড়া শোন্।' রাস্তায় একটা ছোকরা . চ ডাকলুম।

আমার ডাক শুনে গ্রামিক ক্রেতার দল ত্রস্ত হয়ে' উঠলো। নিরুপায় স্তব্ধ হ'য়ে গিয়ে এ ওর গা-টেপাটেপি করে' নিম্ন ভীত কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগলো: 'সাহেব, বড়ো সাহেব।'

বড়ো ভালো লাগে নির্বোধ জনতার এই সভক্তি ভীতি দেখে। কিন্তু মাচার উপর বসে' কালো ফিতেয় কেশমূল দৃঢ় আবদ্ধ করে' যে মেয়েটি আনত আয়নার উপর ঝুঁকে পড়ে' ক্ষিপ্র আঙুলে বেণী বাঁধছে, তার ভঙ্গিতে এতটুকু একটু ত্বরা বা কুণ্ঠা এলো না। শুধু কটাক্ষ-কুটিল কালো দু'টি আয়ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আবার কেশ-রচনায় মনোনিবেশ করলে।

ছোকরাটা কাছে এলে তার হাতে একটা পয়সা দিলুম। বললুম, 'একটা দেশলাই নিয়ে

আয় তো।' বলে' কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে' বুড়ো আঙুলের নখের উপরে ঠুক্‌তে লাগলুম।

মেয়েটি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হ'য়ে, মুখ না তুলে, তেম্‌নি অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোকরাকে বললে, 'এ দুকানে দিশলাই নেই।'

ছেলেটা পয়সা ফিরিয়ে দিলো।

হঠাৎ মনে হ'লো, সাইকেলের শেকল বা ব্রেক কোথায় যেন কী বিগড়েছে। তাই এটা ওটা নাড়াচাড়া করে' ওটাকে মিথ্যে সজুত করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। দেখলুম এর মধ্যে মেয়েটি একবারো আয়নার থেকে চোখ তুললো না, অমনি নির্লিপ্ত বসে' বসে' হালকা হাসির ফোড়ন দিয়ে কারু কারু সঙ্গে পরোক্ষে ফষ্টি নষ্টি করছে। শুনলুম, স্পষ্ট শুনতে পেলুম, কোচোয়ানকে সম্বোধন করে' ও বললে, 'এই জামাল, সাহেবের কল খারাপ হ'য়ে গেছে, গাড়ি করে' কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে আয় না।' বলে'ই দীর্ঘপক্ষ্মজাল তুলে ও আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিক্ষেপ করলে।

এর পর আর সাইক্লে করে' ফেরা যায় না। তাই গম্ভীর মুখে কোচোয়ানকে উদ্দেশ করে' বললুম, 'এই, লাও গাড়ী।

হুকুম শুনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সাইকেলটা নিজেই ছাদে তুলে দিলুম। গাড়িতে গিয়ে বসতে সিগারেট ধরালুম। নিজের চার পাশে একটু নিভৃতি খুঁজে পেয়ে সন্তর্পণে তাকালুম মেয়েটি যদি একবার দেখে। কিন্তু তার অবজ্ঞটা চমৎকার।

সেদিন কী ভাগ্যিস, ক্লাবে যেতে হ'লো না, আটটার আগেই ডিনার খেয়ে বাইরে লনে, ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লুম। দুই চোখ ভরে একসঙ্গে কত যে তারা দেখ্‌লুম, কত যে আশা আর ব্যর্থতা, তার ইয়ত্তা নেই। ভাবলুম, এ কী করে' সম্ভব হ'তে পারে।

মেয়েটি হিন্দুস্থানি, বয়সে আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। গায়ে পীড়াদায়ক আঁট একটা কাঁচুলি, সাদার উপরে কালোর ছাপ তোলা ফুরফুরে পাতলা একটা সাড়ি পরনে। রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের থেকে সুরু করে' রৌদ্রঝলকিত নিষ্কাশিত তলোয়ারের সঙ্গে নারীদেহের বহু উপমা দেখেছি, কিন্তু ওর সেই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিময় শরীর কথায় বোঝাতে পারি এমন কথা মানুষের ভাষায় তৈরি হয় নি। ওর সমস্ত অসাধারণত্ব ছিলো ওর দুই চোখে—সে কী আশ্চর্য চোখ—যেন গায়ের চামড়া ভেদ করে' হাড় পর্যন্ত এসে বিদ্ধ করে। সেই চোখে এতটুকু সুকোমল মোহ নেই, যেন বা কঠিন নিষ্ঠুর একটা বিদ্রূপ। যার দিকে তাকায় তাকেই যেন সে চোখ শাণিত সঙ্কেত করে: ধরা পড়ে' গেছ।

তারপর আরো দু'তিন দিন নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে দোকানের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে এটা-ওটা ফরমাজ করতে হয়েছে, কিন্তু ততবারই মেয়েটি অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততায় গম্ভীর খবর পাঠিয়েছে—এ দোকানে তা পাওয়া যাবে না।

দোকানের ধারে ছোট পঙ্কিল একটা ডোবা ছিলো। সেদিন সর্টস পরে' হাণ্টার হাতে নিয়ে অনাবশ্যক প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলুম। দেখি, মেয়েটি একটি গুঁড়ির উপর বসে, এক পাঁজা বাসি বাসন মাজছে। আস্কন্ধ অনাবৃত দুই বাহু, মাথার ঘোমটা পিঠের উপর বিশৃঙ্খল, সমস্ত ভঙ্গিটা কেমন যেন অসহায়।

আমাকে দেখতে পেয়ে উচ্চ কলহাস্যে ও ডেকে উঠ্‌লো : 'এ লখ্‌না রে।'

ছ-সাত বছরের একটা ছেলে কোত্থেকে এলো ছুটে। তাকে চাপা গলায় কি একটা ইসারা করতেই দুই হাতে মেয়েটির মাথায় সে পিঠের আঁচলটা অগোছাল করে' তুলে দিলো। বাহু দিয়ে টেনে টেনে সেটাকে সুসঙ্গত করে' মেয়েটি তার ঘ্রসায় একটা কাঠিন্য আনলে। ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে উদ্ধত প্রহরীর মতো। মনে মনে প্রচণ্ড একটা মার খেলুম।

অথচ তার সাধারণ যা হাব-ভাব তাতে তার এই কঠিন গাম্ভীর্যের কোথাও কোনো সমর্থন পাওয়া যেতো না। তাকে যখন প্রথম দেখেছি, দেখেছি তরল হাসির ঢেউয়ে উছলে পিছলে পড়ছে, এর-ওর সঙ্গে হালকা চটুলতায় মুখর হ'য়ে উঠছে, ওর বসা ও দাঁড়ানো ভেতরে চলে' যাওয়া ও দোকানে মাচার উপরে উঠে বসা ছোটখাটো সমস্ত ভঙ্গিতেই এমন একটা চাপল্য ছিলো যেটা সাদা চোখে ঠিক সুচারুসঙ্গত মনে হবার মতো হয়তো নয়, অথচ আমাকে দেখেই কিনা সে গাম্ভীর্যে নিটোল বা বিদ্রূপে ধারালো হয়ে ওঠে। হ'তে পারে, আমাকে সে ভয় করে ; কিন্তু তার দোকান থেকে অপ্রাপ্য জিনিস কেনবার অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখে আমাকে আর তার ভয় করা উচিত ছিলো না। এবং, আমি যে কত বড়ো অনুগ্রাহক এ কথা তার অজানা নেই। সার্কেল-ইনস্পেক্‌টারকে গোপনে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই ওর এই দোকান সম্বন্ধে অনেক রোমহর্ষক ইতিহাস হয়তো শোনা যায়, অন্তত কতবার ও দোকান সার্চ হয়েছে এবং কতো রাতে ওখানে 'বি-এল' কেস-এর গোড়াপত্তন হয়েছে। এ-দোকান যে কিসের দোকান তা বুঝতে সামান্যতম কৌতূহলেরও হয়তো অবকাশ ছিলো না। দোকানের এই পরিবেশ, মেয়েটির এই সাজ-গোজ, ছলা-কলা, চাল-চলতি, সবচেয়ে তার এই অদ্ভুত একাকীত্ব—সব কিছুতেই সে অতিমাত্রায় স্পষ্ট ও উদ্‌ঘাটিত। বলতে গেলে, এ-জানাটাই কিন্তু আমাকে সব চেয়ে বিঁধছে। অথচ তার দুই চোখের সেই অদৃশ্য রহস্যের সঙ্গে তার এই বিলসিত দেহসজ্জার কোনো সঙ্গতি খুঁজে পেতুম না। মনে হতো কোথাও একটা মস্ত বড়ো ভুল করে' বসেছি।

ভাবলুম, দূত পাঠাই। নির্জন রাতে অন্ধকার বাংলোয় বসে' তাকে অভিসারিণী করে', তুলি। কিন্তু পাঠাই কা'কে ? যে আজ আমার অনুচর, আমি বদ্‌লি হ'য়ে গেলে, সে-ই আবার আমার গুপ্তচর হ'য়ে উঠবে, অতএব কাউকে বিশ্বাস নেই। আমরা সব হারাতে পারি, খ্যাতি হারাতে পারিনে। কোনো ক্ষতিই ক্ষতি নয়, যদি খ্যাতি থাকে

অব্যাহত। আর, এই খ্যাতি হচ্ছে আমাদের কাঁটার মুকুট। যতো সে শোভা ততো সে প্রতিবন্ধক।

আর্দালিকে বললুম, 'পায়ের রগে কেমন-একটা ব্যথা হয়েছে, সাইক্লে যেতে পারবো না। একটা গাড়ি চাই।'

আর্দালি জিগ্গেস করলে: 'ইষ্টিশান?'

'না, চালনায় যাবো। মাইল আষ্টেকের পথ। ডিস্ট্রিক্-বোর্ডের পাকা রাস্তা আছে।'

'নিয়ে আসি।'

'আর, শোনো।' তাকে বাধা দিলুম: 'জামালের গাড়িতে নতুন রং করেছে, নতুন টায়ার বসিয়েছে চাকায়। ওটা আনতে পারবে না?'

'পারবো।'

আর্দালি জামালের গাড়িই হাজির করলে। একটা পোর্টফোলিও নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে কাউকে নিলুম না।

জামালকে যদি ভিতরে বসিয়ে গল্প করি তবে গাড়ি চলে না, অতএব শহরের সীমানা পেরিয়ে যেতে আমিই কোচবাক্সে উঠে বসলুম। খুব একটা মজা হচ্ছে এমনি একখানা ছেলেমানষি ভাব দেখিয়ে লাগামটা তুলে নিলুম। জামাল পাশে বসে' পরম আপ্যায়িত বোধ করতে লাগলো।

জিগ্গেস করলুম, 'গাড়িটা বুঝি তোমার?'

জামাল কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে, 'আমার নয়। গৌরীয়ার গাড়ি।'

'কে গৌরীয়া? ঐ যার মুদি-দোকান?'

'হুঁ। আমি ঠিকে খাটি। মাইনে পাই। পনেরো টাকা মাইনে।'

'বটে! ওর তো তা হ'লে অনেক পয়সা!'

'তা হয়েছে অল্প-বিস্তর। আগে ছাগলের দুধ বেচতো, কিছু-দিন ইষ্টিশানে মাল-পৌছাবো নাকি কাজ করেছে।'

জিগ্গেস করলুম: 'ওর বাড়ি কোথায়?'

'ফয়জাবাদ না মজঃফরপুরে।'

'এখানে এসেছে কেন?'

'স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে'।'

'বলো কি, ওর বিয়ে হয়েছিলো নাকি?'

'আজ ছ' বছর। স্বামী ওকে একদিন নাকি খুব মেরেছিলো উনুনে রান্না বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে'। তাই সে রাগ করে' পালিয়ে এসেছে।'

'আর ফিরে যাবে না?'

'তা একবার দেখুন না বলে'। মারতে আসবে।'

'ঠিকই তো। কেনই বা ফিরে যাবে বলো, যখন এখানে ওর কোনো দুঃখু নেই।' ঘোড়ার পিঠে টেনে একটা চাবুক কসলুম, বললুম, 'কিন্তু ওর স্বামী ওকে নিতে আসে না?'

'পাছে সে আসে সেই জন্যে বালিসের তলায় ও প্রকাণ্ড একটা ছুরি নিয়ে শোয়।'

একটু ভয় পেলুম বোধ হয়। বললুম, 'অন্যের বেলায় সে-ছুরি বুঝি ওর চোখের তারায় ঝিলকিয়ে ওঠে।'

কথাটা আস্বাদ করবার মতো জামালের ততো সূক্ষ্মতা ছিলো না। তাই ফের বললুম, 'ভেতরে তো ছোট্ট একটুখানি খোপরি, ঐখানে তোমাদের জায়গা হয় কি করে'?'

'কী সর্বনাশ,' জামাল সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলো: 'আমি থাকবো ও-ঘরে? বলেন কি, বাবুসাব, আমি যে ওর চাকর, মাইনে খাই।'

অনুভব করলুম যুবক জামালের বলদৃপ্ত কঠিন শরীর যেন মুহূর্তে সংকুচিত পাংশু হয়ে উঠলো।

'তবে ওখানে থাকে কে?'

'ওর দেশের বুড়ো এক ঝি আর ওর ঐ ছুরি।'

'আর কেউ না?'

'আমি তো কখনো দেখি নি।' বলে' জামাল আমার হাত থেকে লাগাম তুলে নিলো, আমি পরাভূতের মতো গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলুম।

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতেই ঘোরতর মেঘ করে' এলো। কলেজ ছাড়বার পর সেই প্রথম সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরলুম। অমাবস্যা বলতে যেমন অন্ধকার, আমাকে বলতেও তেমনি হ্যাট-কোট বোঝাতো। চিতাবাঘ যদি তার দাগগুলো মুছে ফেলে, সে একটা শেয়াল হ'য়ে ওঠে, আমিও তেমনি টাই-ট্রাউজার ফেলে একস্বলে শ্বশুরবাড়ি করতে আসা শহরের ফুলবাবুটি হ'য়ে উঠলুম। নিজেকে চিনতেই নিজের অত্যন্ত দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, অন্যে তো পরের কথা!

ঈশ্বর সদয় ছিলেন, তাই তখুনিই বৃষ্টি নামলো যখন প্রায় দোকানটার কাছে এসে পড়েছি। বৃষ্টির থেকে ক্ষণিক পরিত্রাণ পাবার জন্যেই যেন আশ্রয়ের বাছ বিচার না করে' দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

দেখলুম, আগেই দেখেছিলুম, ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে গৌরীয়া মাচার উপরে পা টান করে' বসে', সুর করে' কি পড়ছে। বুড়ো-মতন কে-একটা স্ত্রীলোক, বোধ হয় ওর দেশের সেই ঝি হ'বে, মাটিতে বসে' তাই শুনছে গদ্গদ হ'য়ে।

আমাকে দেখে গৌরীয়া থামলো, কিন্তু, আশ্চর্য, একটুও চমৎকৃত হ'লো না। ঝি-কে শুধু বললে, 'মাচার তলা থেকে মোড়াটা বার' করে' দে।'

মোড়া বার করে দিলো। ছাতাটা মাচার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ওয়াটার-প্রুফটা

কোলে নিয়ে বসলুম। কিন্তু কী বলি ওকে? আমাকে দেখে কোথায় ও অভ্যর্থনায় অজস্র হয়ে উঠবে, তার বদলে এমন একখানা মুখ করে রয়েছে যেন আমি মধু-উৎসবে উদ্যত একটা মৃত্যুদণ্ডের মতো এসে বসেছি। কোথায় বা তার সেই ছলনা, কোথায় বা তার সেই ছুরি!

ঝি-কে ও ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললে, 'তুই ভেতরে যা, বাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

নামের আগে বা পিছে বাবু-শব্দটা যে পছন্দ করি না বাংলাভাষানভিজ্ঞা গৌরীয়ার তা জানবার কথা নয়, তবু মনে হ'লো ও-কথাটার মধ্যে ও যেন ইচ্ছে করে'ই একটু অবজ্ঞা মিশিয়েছে। তবু বৃষ্টিমুখর মুহূর্তে ক্ষণিক একটু নিভৃতির সূচনা হল মনে করে খুসি হলুম।

কিন্তু গৌরীয়ার কথা গৌরীয়াই জানে। রাস্তার দু'পাশের নালাগুলি জলে ভর্তি হ'য়ে গেলো। গৌরীয়া একমনে রামায়ণের পৃষ্ঠা উল্টোচ্ছে।

শেষকালে আমিই কথা কইলুম। বললুম, 'সত্যি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। বলবো?'

আনতচোখে কঠিন গলায় গৌরীয়া বললে, 'যদি অন্যায় না হয়, বলুন।'

'না, সে কি কথা, অন্যায় আবার কী বলতে পারি আমি,' তাই শুক্‌নো একটা ঢোঁক গিলে বললুম, 'এত রাতে, এখনো তোমার দোকান খুলে রেখেছ যে?'

ও চোখ তুলে একটু হাসলো। বললে, 'খোলা না রাখলে বৃষ্টিতে ভিজে লোক এসে দাঁড়াবে কোথায়?'

কথাটা ঠিক আমাকেই নিক্ষেপ করেছে দেখলুম।

ঠিক সেই সময়টাতে কে-একজন বৃষ্টিতে গান ভাঁজতে ভাঁজতে দোকানে এসে দাঁড়ালো। দোকানে ঢুকে সেই গানটা সাড়ম্বর নৃত্যের ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হ'তে যাচ্ছিলো, আমাকে দেখে লোকটা হঠাৎ জিভ কেটে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

তাকের উপর থেকে একটা শিশি টেনে নিয়ে গৌরীয়া বললে, 'এই তোমার তেল', আরেকটা পুঁটুলি বের করে': 'এই তোমার নুন।' বলে'ই ঝিকে হাঁক দিলে। বললে, 'ঘরে একটা ছাতা আছে না? ওকে দিয়ে দে, ক্রোশ তিনেক দূরে ওর গাঁ, ও বাড়ি চলে' যাক।'

ঝি ছাতাটা বা'র করে' আনলো। গৌরীয়া লোকটাকে বললে, 'শিগ্‌গির পালা। এক্ষুনি আবার চেপে আসবে।'

লোকটা ছাতা মাথায় দিয়ে চলে' গেলো হন হন করে'। দূর থেকে তার তারস্বরে গান শুনতে পেলুম।

গৌরীয়া আমার দিকে ব্যথিত চোখে তাকালো। বললে, 'আপনিও এবার বাড়ি যান বাবুসাহেব। নইলে, এর পর আবার কোনো লোক যদি আসে, তবে তাকে তাড়াবার

জন্যে আপনার ছাতাটাই তাকে দিয়ে দিতে হ'বে। সেটা ভালো হ'বে না। আপনি বাড়ি যান।'

কথার চেয়ে কথার সুরটি ভারি ভালো লাগ্‌লো। বল্‌লুম, 'বৃষ্টিটা না ধরা পর্যন্ত তোমার এখানে একটু বসতে দিতেও তোমার আপত্তি আছে?'

'আছে।' গৌরীয়া নিষ্প্রাণ গলায় বল্‌লে, 'জায়গাটা ভালো নয়।'

'তাতে আমার কী! বাইরে জল পড়ছে, তাই এখানে আমি একটু বসে' যাচ্ছি বই তো নয়।'

'কিন্তু গরিবের ঘরে মুক্তোর হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল ব'লেই সন্দেহ করে, বাবুসাহেব।' গৌরীয়ার সমস্ত ভঙ্গিটি বেদনায় যেন নম্র হ'য়ে এলো: 'তাতে গরিব আরো গরিব হয়, আর, তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না। আপনি বাড়ি যান।'

'বা, বিপদে পড়ে' তোমার এখানে এলে কেউ দাঁড়াতে পাবে না?'

'কিন্তু আমার ভয় হয় বাবুসাহেব, এখানে এসে না তুমি বিপদে পড়।' গৌরীয়া ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো: 'এখনো অনেক পসারীর সওদা নিয়ে যেতে বাকি। বৃষ্টির জন্যে পথে কোথাও নিশ্চয় আটকা পড়েছে। তোমাকে তারা এখানে দেখবে, শুকনো ছাতা আর শুকনো বর্ষাতি নিয়ে মোড়ার ওপর শুক্‌নো মুখে বসে' আছো, এ আমি কিছুতেই দেখতে পারবো না। আমি ছোট আছি, কিন্তু তুমিও ছোট হ'বে এ দেখতে বুক আমার ফেটে যাবে, বাবুসাহেব।'

বলে'ই সে ঝি-কে ডাক্‌লে; বল্‌লে, 'ডোঙাটা মাথায় করে' জামালকে ডেকে নিয়ে আয় তার বাড়ি থেকে। গাড়িটা বা'র করতে হ'বে। বাবুসাহেবকে পৌঁছে দিয়ে আসবে তাঁর কুঠি।'

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, 'না, গাড়ি কেন? হেঁটেই চলে' যেতে পারবো।'

রেইন-কোটটা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় নেমে আসছি, পিছন থেকে গৌরীয়া বল্‌লে, 'নমস্কার।'

তাকালুম না পর্যন্ত। প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে এলুম। কুঠিতে গিয়ে কতক্ষণে যে এই ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে আবার পরিচিত সার্ট-ট্রাউজারে উপনীত হ'ব তারি জন্যে হাঁপিয়ে উঠলুম। মনে হ'লো একটা অতলান্ত অপমৃত্যু থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সে কি ঈশ্বর?

শুধু ঐ দোকান নয় এই শহরই আমাকে ছাড়তে হ'বে। ডালহৌসি স্কোয়ারে তাই অনেক সই-সুপারিশ করে' মাস তিনেক পর বদ্‌লি পেলুম।

মাল-পত্র আগেই রওনা হ'য়ে গেছে; পরে আমি, একা; বলা বাহুল্য, জামালের

গাড়িতে নয়। স্টেশনে ছোটখাটো একটা ভিড় হ'বে ও বহু লোকের সঙ্গে অনেক মুখস্ত-করা মামুলি কথা বলতে হ'বে, সেই ভয়ে ট্রেনের খুব সঙ্কীর্ণ সময় রেখেই আমি বেরুলুম।

গৌরীয়ার সেই দোকানের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। দেখলুম, মাচার উপরে গৌরীয়া নেই। গামলাগুলি খালি, এ ক'দিনে দোকানের শ্রী অনেক কমে' গেছে মনে হ'লো। ভাবলুম, যাবার সময় ওকে একটিবার দেখে গেলে ভালো লাগতো।

দেখলুম পাশের সেই পুকুরধারে শাখাবাহুল্যবর্জিত কি একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার যাওয়া দেখছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই সে অল্প একটুখানি হাসলো। সেই অল্প-একটুখানি হাসা যে কী অপরূপ তা বুঝিয়ে বলি এমন শক্তি নেই। আজকের ভোরবেলাটির মতোই বিষাদে নির্মল, বিরহে সকরুণ সেই হাসি। দুঃখকে, ক্ষতিকে, অপরিসীম শূন্যতাকে সামান্য হাসি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে এমন যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সংসারে, তবে সেই পরীক্ষায় গৌরীয়া ফুল-মার্ক পেয়েছে। এক দৃষ্টে এতক্ষণ ধরে' ও কোনোদিন আমার দিকে তাকায় নি। আজ দেখলুম তাতে কত বিষাদ, কত স্নেহ, কত শান্তি।

গাড়িটা খানিক দূর চলে' এসেছে। বললুম, 'চললুম, গৌরীয়া।'

গৌরীয়া হয়তো শুনতে পেলো না, কিন্তু যাবার সময় কিছু একটা তাকে বলে' গেছি মনে করে' সে আঁচলে চোখ চেপে ধরলো।

এত দিনে মনে হ'লো বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি।

উপযাচিকা

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায়— জন্ম ১৯০৪ ঢেঙ্কানাল রাজ্যে। পৈতৃক বাস বালেশ্বর—অনেক আগে হুগলী জেলায়। পড়াশোনা ঢেঙ্কানালে, পুরীতে, কটকে ও পাটনায়, কিছুদিন কলকাতায় পরে লণ্ডনে। বর্তমানে ইনি বাংলা গবর্ণমেন্টের শাসন বিভাগে আছেন—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে। আই, সি, এস, পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এঁর প্রথম প্রকাশিত বই "তারুণ্য", ১৯২৮ সালে আই, সি, এস, পড়বার সময়, বিলেতে বসে। এঁর সহধর্মিণী, বহুগুণান্বিতা একজন বিদুষী আমেরিকান মহিলা। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতায়—এমন কি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় পর্যন্ত তিনি বিশেষভাবে অনুরাগিণী। অন্নদাশঙ্করের প্রতিভা, আধুনিক সাহিত্যে এনেছে একটি নূতন প্রেরণা—চিরন্তন মানুষের প্রেরণা। যে প্রথম ভালবাসতে চায় জীবনকে, তারপর প্রেমকে, তারপর আর্টকে। আর একটি কথা, এঁর কথা আধুনিক সাহিত্যে একটি অপূর্ব সম্পদ্—ভাষাসৌন্দর্যে। এঁর কএকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, সত্যাসত্য। (সত্যাসত্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত আড়াই হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিরাট উপন্যাস; এত বড় উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম) গল্প—প্রকৃতির পরিহাস। প্রবন্ধ—আমরা। ভ্রমণকাহিনী—পথে প্রবাসে। কবিতা—রাখি, একটি বসন্ত, কামনা পঞ্চপ্রদীপ।

উপযাচিকা

বাবা লিখেছিলেন সন্ধ্যার গাড়িতে আসছেন। তাড়াতাড়িতে বাংলোটাকে নৈষ্ঠিক হিন্দুর আবাস করে তুলতে আমার মতো একা মানুষের সামান্য পরিশ্রম হয়নি। অবশেষে স্টেশনে গিয়ে দেখলুম তিনি আসেন নি। ভাবলুম হয়তো ট্রেণ মিস্ করেছেন, ভোরের গাড়িতে আসবেন। তাঁর জন্যে হিন্দুর দোকানের খাবার আনিয়ে রেখেছিলুম, তুলে রাখলুম, যদিচ জিনিসগুলির উপর আমার বৈলাতিক বিরাগ ছিল না মোটেই।

ভোরের গাড়ির জন্যে রাত থাকতে উঠতে হয়। অতটা পিতৃভক্তি আমার মতো ঘুমকাতুরে লোকের শরীরে সয়না। পাঠালুম আমার চাপরাশীকে। বাবার নামটা পঞ্চাশবার মুখস্থ করালুম, চেহারাটাও বাক্য দিয়ে এঁকে কানে ধরে দেখালুম।

'রবিনাশবাবু নয়, অবিনাশবাবু। মনে থাকবে?'

'জী হুজুর।'

একটু বেলা করে ঘুম ভাঙল। বাবা না জানি কী মনে করছেন। লাফ দিয়ে উঠে দেখি কোথায় বাবা?

চাপরাশী একটা সেলাম ঠুকে এক গাল হেসে বললে, হুজুর এসেছেন।

দেখতে না পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় তিনি।'

'ওই যে, ঐ গাছতলায় বিড়ি খাচ্ছেন।'

কী! আমার সাত্ত্বিক নিরামিষাশী বাবা বুড়ো বয়সে বিড়ি খাচ্ছেন! দেখলুম কে একটি ছোকরা গাছের দিকে মুখ করে লুকিয়ে বিড়ি টানছে।

'হতভাগা! কী নাম ধরে ডেকেছিলি? ওর কী আমার বাবার বয়স?'

'হুজুর রবিবাবু রবিবাবু বলে কত ডাক্‌লুম। কেউ সাড়া না দিলে আমি কী করব? ইনি শুধালেন বোস্ সাহেবের কুঠি জানো, সর্দার? আমি ঠাওরালেম ইনি হুজুরের—'

'চোপ্ রও, শুয়ার।'

চাপরাশী দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দুই হাত জুড়্‌ল।

গাছতলায় ছোকরাটি সাহেবী গলা শুনে চম্‌কে উঠে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। চুরি করে দেখ্‌ল সাহেব স্বয়ং। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বল্‌লে, 'গুড্ মর্ণিং সার। চিন্‌তে পারছেন্?'

গালে ও গলায় মাংস নেই, মাথায় প্রচণ্ড টেরি, সিঁথির গোড়াতে এক মণ্ডল। কাঁচা বাঁশের মতো লম্বা লক্‌লকে গড়ন। মাজা দুর্বল। আমি যতক্ষণ ভাবতে থাক্‌লুম, কে এ, সে ততক্ষণ ময়লা দাঁত বের করে হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু ভরসা পেলেনা।

'আরে এ যে বৃন্দাবন।' আমি সোল্লাসে বল্‌লুম, 'বৃন্দাবন না?'

'মনে আছে দেখ্‌ছি।'

'বৃন্দাবন, বিন্দে, তুই হঠাৎ কোত্থেকে এলি? আয়, আয়।'

বৃন্দাবন আমাকে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলবে কিনা ঠিক্ কর্‌তে না পেরে ঘুরিয়ে বল্‌লে, 'এই বাংলোতে থাকা হয়?'

'হ্যাঁ! এটা আবার একটা বাংলো! দেখছিস্ তো এতে না আছে লাইট না আছে ফ্যান। তুই হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে, বৃন্দাবন। আগে কিছু খেয়ে তারপর অন্য কথা।'

বৃন্দাবন, বিন্দে, আমার আশৈশব বন্ধু। থার্ড ক্লাস থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় চলে গেল। পরে শুনলুম সে রেলের কন্‌ট্রাক্টর হয়ে দিব্যি রোজগার করছে। আমি পড়ি কলেজে, হাতে একটি পয়সা থাকে না, বৃত্তি যা পাই তাতে পেট ভরে খাওয়াই হয় না। আর বৃন্দাবন দুহাতে টাকা ছড়াচ্ছে। বড়, মেজ, সেজ ও ছোট সাহেবদের [illegible] খাওয়াচ্ছে কত!

তারপর চাকা ঘুরেছে। এই সেই বৃন্দাবন ও এই সেই ললিত। রাত্রের তুলে রাখা সন্দেশ রসগোল্লা সহযোগে ছোটা হাজরি খেয়ে বৃন্দাবন যেন বাল্যকালে ফিরে গেল। কখন এক সময় 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ও 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' ধর্‌ল। বল্‌লে, 'বেড়ে আছিস্ তুই ললতে। তোদেরই, ভাই, সার্থক জীবন। মাইনে পাস্ আড়াই শো—।'

'আড়াই শো তো নেটিভ্‌দের মাইনে। আমার মাইনে হলো সাড়ে তিন শো।'

'সা-ড়ে তি-ন-শো টাকা! সুরুতেই এই। উঠ্‌তে উঠ্‌তে কত উঁচুতে উঠ্‌বি কে জানে। তারপরে পাবি পেন্‌শন। নিশ্চয় কিছু উপরি পাওনাও আছে।' এই বলে সে এক চোখ বুঁজে জিভ কাট্‌লে।

আমি চুপ করে থাক্‌লুম।

সে বক্ বক্ করতে করতে প্রশ্রয় পেয়ে বলে বস্‌ল, 'বিয়ে করিস্‌নি, তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। কেন বল্ দেখি। বিলেত থেকে একটি আন্‌তে পার্‌লিনে?'

আমি ওর চেয়ে ভদ্র ভাষার প্রশ্ন আশা করিনি। রেলের কনট্রাক্টর আর কত ভদ্র হবে। হাসির রেখা টেনে বল্‌লুম, 'বিলিতী মেম-সাহেব তোকে এমন ক'রে অভ্যর্থনা করতেন বলে তোর বিশ্বাস হয়?'

বৃন্দাবন ভড়্‌কে গেল। বল্‌লে, 'দেখিস্ ভাই, কক্ষণো মেম বিয়ে করিস্‌নে, যদি আত্মীয় বন্ধুর প্রতি তোর বিন্দুমাত্র মমতা থাকে। (লক্ষ্য করে) সিগার? কী নাম? 'Corona'? দেখ্‌ব একটা মুখে দিয়ে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

বৃন্দাবন কাশ্‌তে কাশ্‌তে বল্‌লে, 'আমরা অবশ্য বিলেত-ফেরৎ নই। তবু খাস্ বিলিতী না হোক এদেশী—যাকে বলে ফিরিঙ্গী—মেম আমরাও···(খক্ খক্)···আমরাও···। আচ্ছা, তুই ও দেশে লব্ করেছিস্?'

আমি রঙ্গ করে বল্‌লুম, 'বিয়ে করতে বারণ কর্‌লি, বিয়ে না করলে Love করি কেমন করে? বিয়ের পরই না Love?'

'না রে', বৃন্দাবন সিগার খেতে গিয়ে কা তে কাশ্‌তে কাবু হয়ে বল্‌লে, 'অমন লবের কথা বলি নি। ও তো স্বর্গীয় প্রেম। হিন্দু সতী ছাড়া কার কাছে ও প্রেম পাবি? একটি ভালো দেখে বিয়ে কর্। দেরি করছিস্ কেন? বলিস্ তো আমি পাত্রীর খোঁজ করি।'

'না', আমি তার আন্তরিকতা লক্ষ্য করে গম্ভীরমুখে তামাসা কর্‌লুম, 'ও সব পাত্রী টাত্রী আমার পোষাবে না। বিয়ে করলেই ধাত্রীর দরকার হবে। ছেলে এলেই রূপ যৌবন যাবে!'

বৃন্দাবন সিগার সরিয়ে প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে বল্‌লে, 'তবে?'

'তবে?' আমি একটু ইতস্তত করে [illegible]ম, 'তখন সেই তো রক্ষিতা রাখ্‌তে হবে, এখন থেকে রাখ্‌লে দোষ কী?'

সে কী মনে করে হেসে ফেল্‌লে। বল্‌লে, 'যাঃ।'

'সত্যি।'

'যাঃ।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? কেন, এতে নূতনত্ব কী আছে?'

'রামঃ রামঃ রামঃ। অবিনাশ কাকার ছেলে না তুই? কগার্স পাস্ করেছিস্ না?' সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল।

সগর্বে বল্‌লে, 'লব্ আমরাও করেছি। তা সে খাস বিলিতী মেমের সঙ্গে নাই হোক। বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন? কী করে হবে? আমরা তো বিলেতও যাইনি, পাসও করিনি।

কিন্তু বলুক দেখি কেউ যে আমি পিতৃপিতামহের পিণ্ডদানের জন্তে, সনাতন হিন্দু কায়স্থের কুলরক্ষার জন্তে, কন্যাদায়গ্রস্তের উদ্ধারের জন্তে, বিবাহ করতে পশ্চাৎপদ হয়েছি। আরে, একটা কেন, দশটা বিয়ে করব। আমি যে পুরুষ।' এই বলে সে তার শীর্ণ গুম্ফরেখায় আঙুল বুলিয়ে দিল, পাক দিতেও চেষ্টা করল।

সেই পুরুষোত্তমের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করি?

'বললুম, এই যাঃ। তোর বিয়ে হয়েছে কিনা জিগ্‌গেস করতে ভুলে গেছি।'

'ভুলে যাবিই তো। আমরা তো অফিসার নই, আমরা কেরানী।'

'কেন রে? তুই না আসানসোলে কন্‌ট্রাকটরী করছিলি?'

'ঐ কন্‌ট্রাকটরীই আমার কাল হলো। তুই বিশ্বাস করবিনে, ললিত, একবার একটার সঙ্গে লব্‌ হলে একপাল এসে ঘেরাও করে। সবাইকে উপহার দিতে দিতে দেনা দাঁড়িয়ে গেল কত! তারপর সেই বিশ্রী রোগ—'

আমি আঁতকে উঠলুম। এই লোকের সঙ্গে এক টেবলে খাচ্ছি—

'সেই বিশ্রী রোগে একটি বছর ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গেলুম। দেখ্‌না, কেমন হাড় ফুটে বেরোচ্ছে। কিছুতে কিছু হলো না। অবশেষে—'

আমি হাঁফ ছেড়ে বললুম, 'সেরেছে তা হলে?'

'সারবে না আবার?' বৃন্দাবন এক গাল হেসে বলল। অবশ্য তার গাল বলে কোনো পদার্থ ছিল না। 'সারবে না তো হিন্দুধর্ম মিথ্যে। ভুজঙ্গেশ্বর শিবের নাম শুনেছিস্?'

'না।'

'ওসব তোদের মতো সাহেব সুবোর না শোন্‌বারই কথা। তবে বড় বড় ফিরিঙ্গী সাহেব টমি সাহেবও বাবা ভুজঙ্গেশ্বরের পায়ে মানৎ রেখে কৃপা পেয়েছে। যাক, সেই ভুজঙ্গেশ্বরের পায়ে হত্যে দিয়ে পড়লুম। তুই আমায় না বাঁচালে কে বাঁচাবে বাবা? বাঁচিয়ে দে, বাবা, বাঁচিয়ে দে। সাতদিনের দিন বাবা মুখ তুলে চাইলেন। স্বপ্ন দিলেন, যা তুই বিয়ে কর একটি লক্ষ্মী মেয়ে দেখে। নিজের স্ত্রীর সহবাসে আপনি সেরে যাবে।'

আমি হাসব কি রাগ করব ঠিক্ করতে না পেরে চোখে জল এনে ফেলেছিলুম। কোন্ লক্ষ্মী মেয়ের জীবন ব্যর্থ করল এ মূঢ়।

বৃন্দাবন দর্পভরে বললে, 'হিন্দুধর্মের কিবা মহিমা। বিয়ে করলুম বারো বছর বয়সের এক অনাঘ্রাতা কুসুম। আর দেখ্‌তে না দেখ্‌তে রোগ গেল ছেড়ে; শ্রীবৎস রাজার শরীর থেকে যেন শনি বেরিয়ে গেল।'

'কিন্তু', আমি বললুম, 'তোর শরীর থেকে গিয়ে তিনি তোর স্ত্রীর শরীর আশ্রয় করলেন কিনা সংবাদ নিয়েছিস্?'

বৃন্দাবন টেবল্ থেকে ন্যাপকিন্‌টা তুলে নিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বললে, 'সতীলক্ষ্মী

এয়োরাণী। তাঁর আয়ু ফুরিয়েছিল। তিনি স্বামীর পায়ে মাথা রেখে জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করলেন।'

আমি ব্যঙ্গ করে বললুম, 'তারপর তুই বোধ করি আরেকটি নবীন বস্ত্র সংগ্রহ করলি ?'

'সংগ্রহ করতে হয় না রে। আপনি এসে পড়ে। ভদ্র লোকের বয়ঃস্থা মেয়ে। বিয়ে না দিলে জাত থাকে না। মা' বললেন, উদ্ধার কর। আমিও দেখলুম যে বিয়ে না করলে আবার খারাপ হয়ে যাবো।'

বাল্য সুহৃৎকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলুম। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল যে তার একটা নিষ্কাসনের উপায় না করলে হয়ত ঘরে বসে অপঘাতে মরতুম।

'ছাখ্ বৃন্দাবন', আমি ধীরে ধীরে প্রসঙ্গটা পাড়লুম। 'দেখলি তো আমার বাবুর্চিকে। না দিশী না বিলিতী কোনো রান্না শুদ্ধভাবে জানে না। এদেশে যাকে সাহেবী খানা বলে আমি ভাই ও জিনিস বরদাস্ত করতে পারিনে। ওর চেয়ে পুরোপুরি দেশী খাবার ভালো।'

'তা হলে', বৃন্দাবন প্রস্তাব করল, 'একটি ঠাকুর রাখতে পারিস।'

'ঠাকুর ? না, ঠাকুর নয়। একটি ঠাকুরাণী পেলে রাখি।'

বৃন্দাবন থমকে দাঁড়ালো। 'কী ? কী পেলে রাখবি ?'

'পাচিকা।'

'যাঃ।'

'কেন রে ?'

'যাঃ। ঠাট্টা করছিস্।'

'সত্যি বলছি। যার হাতে খেয়ে বেশ একটি সুমধুর পরিতৃপ্তি হবে, যে আমাকে অন্নের সঙ্গে অমৃত পরিবেশন করবে, সে নিশ্চয়ই মেসের বামুন নয়। উঃ সে কী দুর্ভোগ !'

তবু, বৃন্দাবন বলল, 'যাঃ।'

আমি বললাম, 'যাই বল, একটি সুন্দরী সুনবীনা পাচিকা পেলে আমি বোখারা ও সমরকন্দ দিয়ে দিতে রাজি আছি। চাই কি একশো টাকা মাইনে।'

'এক-শো-টাকা ! মাইরি ?'

'কেন এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?'

'না ! কিছুমাত্র নেই ! যখন আমার নিজের মাইনে হচ্ছে মাত্র পঁচাত্তর টাকা।'

আমি লজ্জিত হলুম। কিন্তু থার্ড ক্লাস অবধি যার দৌড় তার উপর মা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ আছে বলতে হবে।

বৃন্দাবন বললে, 'শুধু পাচিকা হলে চলবেনা, সুন্দরী ও সু—সু—'

'সুনবীনা।'

'সুনবীনা হওয়া চাই?'

'তা নইলে খাওয়ার মতো একটা মামুলি ব্যাপার এস্থেটিক্ আনন্দে ভরপুর হবে কেন?'

'বুঝেছি।'

আমি ভাব্লুম বৃন্দাবন এস্থেটিক্ কথাটার মানে বুঝেছে। তা নয়।

'বুঝেছি তোর অভিসন্ধি।' বৃন্দাবন রহস্যের হাসি হাস্ল।

যাক, কষ্ট করে বোঝাতে হলো না। বল্লুম, 'আছে অমন কোনো মেয়ে তোর জানাশুনা?'

'নেই আবার!' বৃন্দাবন বল্লে আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে।

'তবে', আমি ভারি অধৈর্য হয়ে বল্লুম, 'তুই কলকাতা গিয়েই ওকে পাঠিয়ে দিস এখানে। খাওয়া দাওয়ার অকথ্য অসুবিধে হচ্ছে।'

'বুঝেছি।' সে দুষ্টু হাসি হাস্ল। বল্ল, 'ভেবেছিলুম বিলেতের কম্যুর্স পাশ যখন তখন লোকটা সচ্চরিত্র।'

'কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লোকটা সুবিধাবাদী।'

আমরা একটা বাঁধা বটতলায় বিশ্রাম করলুম।

বৃন্দাবন আরম্ভ কর্লে, 'একটি মেয়েকে জানি, নাম তার সুবর্ণ। যেমন নাম তেমনি রূপ। দেবী প্রতিমার মতো দ্যুতি। চাইলে চোখ ঝল্সে যায়।'

'কুমারী না বিধবা?'

'সধবা।'

আমি সত্যি সত্যি নিরাশ হলুম। বল্লুম, 'তা হলে থাক।'

শোন আগে সবটা। সধবা বটে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সংসর্গ নেই। 'ঐ যাঃ তোকে আ[illegible] ভয় পাইয়ে দিতে হচ্ছে। স্বামীর কুৎসিত রোগ।'

আমি বিবর্ণ মুখ বিকৃত করলুম। বৃন্দাবন স্ফূর্তি করে বল্লে, 'সে বড় মজার। গেছল সে ঢাকায় না চাটগাঁয়। নিয়ে এলো হাতে পায়ে ফোস্কা। বল্লে, ষ্টীমারের বয়লারের ছোঁয়া লেগে অমন হয়েছে। সুবর্ণ বিশ্বাস করলে। তখন তার বয়স কতই বা—বোধ হয় বারো কি তেরো। এমন সেবা কর্ল যে সেবা যাকে বলে। কিন্তু এতো সেবা সত্ত্বেও বয়লারের ফোস্কা সারে না। ক্রমে ক্রমে সারা শরীর ফোস্কায় ছেয়ে যায়। হরিপদ কলকাতা শহরের ষোলোখানা বাড়ির মালিক। চিকিৎসাটা যা করালে তা আমার মতো কন্ট্রাক্টরের সাধ্যের বাইরে। কেউ ওকে ভুজঙ্গেশ্বরের পরামর্শ দেয়নি, তাই স্ত্রীকেও সযত্নে দূরে রেখেছে। স্পর্শ করেনি। এমন মূর্খ।'

আমি মনে মনে বল্লুম, 'ধন্য।'

'স্ত্রীর যখন ভোগের বয়স পূর্ণ হলো, স্বামীকে অক্ষম দেখে তার ক্রমশ ঘেন্না ধরে গেল। সেবা তো বড় কম করেনি। এত সেবার পুরস্কার কী হলো? কতগুলো নাটক নভেল পড়ে এই হলো তার প্রশ্ন। সে একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হারিয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'নাটক নভেল পড়ার পরিণাম।'

'তা নয় তো কী।' বৃন্দাবন উত্তেজনার সহিত বলল, 'ঘরে ঘরে মেয়েরা তবে বকছে কেন? আমি তো স্ত্রীর হাতে দেবার মতো বই একখানাও দেখলুম না। এমনি কি স্ত্রীলোকের লেখা বইও না।'

'তুই এক কাজ কর।' আমি প্রস্তাব করলুম, 'স্ত্রী নয় পুরুষ নয় এমন কোনো লোকের বই কিনে দে। ঘরের বৌ ঘরে থাকবে।'

বৃন্দাবন পরিহাসের মর্ম না বুঝে বললে, 'সেই বেশ। তোর কাছ থেকে একটা লিষ্টি লিখে নেবো, ললিত। দেখিস্ তোর বৌদির প্রতি তোর একটা দায়িত্ব আছে।'

আমি মনে মনে একটা তালিকা বানিয়ে ফেললুম।

বললুম, 'তারপর সুবর্ণর কী হলো বল্।'

'কী আর হবে, কাশী থেকে ধরা হয়ে এলো। পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে কত বোঝালেন, কত মিষ্টি কথা বললেন। তার সেই এক উত্তর। 'আমি ব্রহ্মচারিণী হ'তে পারব না। আপনারা কে কে ব্রহ্মচারী, শুনি?' তখন আমরা সবাই লজ্জায় সে যার বাড়িতে সরে পড়লুম।'

'আর সুবর্ণ?'

'সুবর্ণকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার মামার বাড়ি, তার বাপ নেই। মা থাকেন ঐখানে। কিন্তু নাটক নভেল কি সোজা জিনিস! মামাতো ভাইবোনে প্রেম যদি না হলো তবে আর প্রগতি কী হলো! টের পেয়ে মামীমা সুবর্ণকে তার স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হরিপদর জীবনে ধিক্কার এসেছে। আমি তাকে জঙ্গেশ্বরের ঠিকানা দিয়েছি। স্বপ্নও সে দেখে এসেছে অবিকল আমারই মতো। এদিকে সুবর্ণ সিনেমা দেখে ক্ষেপেছে। স্বামীর ভালো কথা তার মন্দ লাগে। সে বলে, 'না। ভোগ চাই বলে রোগ চাইনে।' শুনলি তো?'

আমি একটু আগে স্বামীকে ধন্য বলেছিলুম। এখন স্ত্রীকে বললুম, 'ধন্য।'

'ধন্য? ধন্য বল্‌বি তুই ওই অবাধ্য অসতী স্ত্রীকে?'

'যাক্, তুই তো এখন ও গল্পটা শেষ কর্।'

'শেষ?' বৃন্দাবন উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'হরিপদকে আমরা হৈ হৈ করে আরেকটা বিয়ে দিলুম। এই তো সেদিন। এখনো ঢেকুর উঠছে সেদিনকার সেই ভুরি ভোজনের। খাওয়াতে জানে বটে হরিপদরা।'

'কিন্তু সুবর্ণর কী হলো?'

বৃন্দাবন বিরক্তির সুরে বল্‌লে, 'কী হতে পারে শুনি? হিন্দুর মেয়ের স্বামী ছাড়া গতি আছে? দুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস্।'

আমি ভরসা পেয়ে জিগ্‌গেস করলুম, 'সব ঠিক হয়ে যায়নি তাহলে?'

'না। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে অনর্থ বাধায়। 'বৃন্দাবন বাবু, আপনি আমার একটা উপায় করুন। নইলে বেশ্যা হয়ে যাবো'।'

'বেশ তো। তুই একটা উপায় করিস্‌নে কেন?'

বৃন্দাবন দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে, 'একে ব্রাহ্মণ, তায় পরস্ত্রী।'

ফেরবার পথে আমি বল্‌লুম, 'বৃন্দাবন, আমাকে সত্য করে বল্ দেখি সুবর্ণর ও রোগ নেই?'

'যত দূর জানি, নেই।'

'কিন্তু আমি চাই ঠিক্ জান্‌তে।'

'ঠিক জানিনে।'

'তা হলে ওকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। পারবি এ ভার নিতে?'

'কে? আমি?' বৃন্দাবনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

'হ্যাঁ রে, তুই। আমি তো কলকাতা যাচ্ছিনে। যাচ্ছিস্ তুই।'

'বা রে।'

'বা রে নয়। পারবি কিনা বল্।'

'রোস্ ভেবে দেখি।'

'ভাব্‌বার কিছু নেই। সুবর্ণর স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে কি দেয়নি?'

'ছেড়ে দেবারই সামিল।'

'কত ওর বয়স? সাবালিকা?'

'উনিশ কুড়ি।'

'তবে আর কী? ওকে বলিস্ আবার হারিয়ে যেতে।'

বৃন্দাবন বল্‌লে, 'সত্যি বল্‌তে কি, হরিপদও তাই চায়। কেলেঙ্কারির আর বাকি আছে কী? বেশ্যা হলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। কলকাতা শহরে হরিপদ বেচারার মুখ দেখানোর জো থাক্‌বে না। ওর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই কেউ কেউ যাতায়াত কর্‌বে।'

'প্রতিবেশীদের মধ্যেও?'

'প্রতিবেশীদের মধ্যেও।'

'বলিস্ কী ? ঐ সব ব্রহ্মচর্যওয়ালাদের মধ্যেও ?'

'কেন নয় ? পুরুষের আবার সতীত্ব !'

আমি প্রায় ক্ষেপে গেছলুম। বল্লুম, 'সবাই তাহলে শকুনের মতো চেয়ে ব'সে আছে কবে ও মেয়ে মরবে ?'

বৃন্দাবন শিউরে উঠে বল্লে, 'ষাট্, ষাট্। এত রূপ, এমন যৌবন,—মরবে !'

'বেশ্যা হ'য়ে যাওয়াকে আমি মনুষ্যত্বের মরণ বলি।'

'ও সব', বৃন্দাবন প্রত্যয়ের সহিত বল্ল, 'ভগবানের হাত। বেশ্যা না থাক্লে পাপী থাক্ত না। আর পাপী না থাক্লে ভগবান কাকে তরাতেন ?'

এই যার যুক্তি তার সঙ্গে তর্ক বৃথা। আমি চুপ ক'রে ভাবতে থাক্লুম সুবর্ণর সমস্যা। ও যদি বেশ্যা হ'য়ে যায় তবে ঠিক্ যে রোগটাকে এড়াতে চায় সেই রোগে মরবে। অথচ পূর্ণ বয়সে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাও যে প্রকারান্তরে নপুংসকত্ব, ক্লীবত্ব। সেও বেশ্যাবৃত্তির মতো অবমানুষিক।

কী যে সেন্টিমেন্টাল বোধ করলুম। মনে হ'লো, পুরুষ হ'য়ে জন্মেছি কেন ? যদি না নারীকে রক্ষা ক'রতে পারলুম। সমাজে যাকে নীতি বলে তার উপরেও একটি নীতি আছে। সে নীতি বীরের। সে নীতি যারা মানে তারাই একদিন হয় সমাজের নমস্য।

পরিহাসের পরিণাম এই দাঁড়ালো যে বৃন্দাবনকে আমি একটু চাপ দিয়ে বল্লুম, 'তুই ওকে এইখানে পাঠিয়ে দে, আমিই ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবো।'

বৃন্দাবন চল্তে চল্তে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। বল্ল, 'যে জন্যে তোর কাছে আসা সেটা এবার খুলে বলি। আমার বড় সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে আমাকে সুপারিশ ক'রতে হবে। দেড়শো টাকার একটা Vacancy হয়েছে ব'লেই দেড়শো মাইল ছুটে আসা।'

'কিন্তু', আমি আপত্তি করলুম, 'তোর বড় সাহেবকে আমি চিনিনে। তিনি কি আমাকে চেনেন ?'

'হয়েছে, হয়েছে', বৃন্দাবন আমার পিঠ চাপড়িয়ে বল্লে, 'তোকে চিন্তে না পারুক তোর ব্যাঙ্কের চাকরিকে চিন্বে। আজকেই—বুঝলি ? দুপুরের গাড়িতেই ফির্বো।'

বৃন্দাবনের চ'লে যাওয়ার মাস খানেক পরের কথা। ভুলেই গেছ্লুম কী তাকে বলেছিলুম। সামাদের হাতে দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি, সুখে আছি। বাবা এসে বিয়ের জন্যে সাধাসাধি ক'রে গেছেন। রাজি হইনি। আমি ইকনমিক্সের ছাত্র, আমি কি এই আয়ে

বিবাহ করি? বিবাহ মানে যদি বার্থ কণ্ট্রোল হ'তো তবে সে ছিল উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমাদের শ্রীমতীরা যে মাতৃত্ব থেকে আলাদা ক'রে পত্নীত্ব পছন্দ করেন না।

এমন সময় একদিন রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরে বস্‌বার ঘরে ঢুকতে যাবার [illegible] হ'য়ে দাঁড়ালুম।

কে ঐ নারী!

ব্যাচ্‌লারের বাড়িতে নারী যেন বিধবার হাঁড়িতে মাছ। লোকে কী বল্‌বে। আমি যে একজন রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্ জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান। ক্লাবের মেম্বার।

মা ধরণী দ্বিধা হ'লেন না। আমার গা দিয়ে ঘাম যেতে লাগ্‌ল। আমি দাঁড়াবো কি পালাবো এই বিষয়ে পদদ্বয়ের ভিতর মতদ্বৈধ লক্ষিত হ'লো। ওদিকে আমার চোখ গেলো আট্‌কে।

কী রূপ! পেট্রোমাক্স বাতির আলোয় সে একটি টিপয়ের উপর ঝুঁকে একখানি বিলিতী কাগজের ছবি দেখ্‌ছে—নিবিষ্ট ভাবে। কঠিন সংযম তার তনুকে বেঁধে রেখেছে। নইলে তা হয়তো দিকে দিকে ছড়িয়ে যেতো, মিলিয়ে যেতো। যেন একটি পূর্ণ প্রস্ফুট স্বর্ণগোলাপ।

কিন্তু কে সে! কেন আমার ঘরে?

আমি যে দাঁড়িয়ে রয়েছি এ সে অনুভবের দ্বারা বুঝ্‌ল। আসন থেকে উঠে আমার দিকে চাইল। কিছু বল্‌লে না, কিন্তু আমাকে যেন ইসারায় জানালে, আস্‌তে পারেন।

আমি আকৃষ্টের মতো ভিতরে গিয়ে একটু দূরে ব'স্‌লুম। সেও ব'স্‌ল বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল। যেন আমাকে চোখ দিয়ে যাচাই ক'র্‌ল। আমাকে তার পছন্দ হ'লো কিনা জান্‌তে পার্‌লুম না, জান্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছিল। যেন আমি একটি বিবাহযোগ্যা বালিকা, আর সেই বিবাহোদ্যত পুরুষ।

আমার ভারি অস্বস্তি বোধ হ'লো। কিছু একটা বলা তো উচিত। কিন্তু স্বপ্নে কথা কইতে পারা যেমন যায় না এও তেমনি। বচন প্রবৃত্তি দুর্বার হ'লে স্বপ্নটি যাবে ভেঙে। আর এমন স্বপ্ন ভাঙুক এরূপ আগ্রহ আমার ছিল না।

আমি তার পরীক্ষমান দৃষ্টির লক্ষ্য হ'য়ে নজরবন্দী হ'লুম আমার আপন গৃহে। বোধ হয় এমনি ক'রে রাত কেটে যেতো। কিন্তু আমার প্রভুভক্ত বেয়ারা তা হ'তে দেবে কেন? সে এসে প্রশ্ন কর্‌লে, 'কোনো পানীয় এনে দিতে হবে?'

আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। যেন ধরা প'ড়ে গেছি। বল্‌লুম, 'এ্যাঁ! হ্যাঁ। আমার জন্যে ছোটা পেগ্। আর···আপনি অবশ্য চা খাবেন?'

সে কঠিন ভাবে বল্‌লে, 'চা ক'রে খাওয়াতেই আমার আসা, চা খেতে নয়।'

আমার হঠাৎ খেয়াল হ'লো, এ কি সেই—?

মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম।

সে সপ্রতিভ ভাবে বল্‌লে, 'আমিই সুবর্ণ।'

তখন আমি সে যে কী লজ্জায় প'ড়লুম তা কেউ অনুমান ক'র্‌তে পার্‌বে না। সুবর্ণ নিশ্চয় জানে কী জন্যে আমি তাকে চাই। একটি পূর্ণ বয়স্কা ভদ্রনারী আমার সম্বন্ধে কী না জানি ভাব্‌লো। তা জেনেও সে যে এসেছে—ছি ছি কেমন নির্লজ্জ সে!

আমি তার চোখে চোখ রাখতে শিউরে উঠ্‌ছিলুম। ভদ্রতা ক'রে বল্‌লুম, 'না, না, তা কি হয়। আপনি কেন চা ক'র্‌বেন?'

তার ঘন পক্ষ্মের পর্দা সরিয়ে তার উজ্জ্বল তীব্র চাউনি আমার চোখের উপর টর্চের আলোর মতো প'ড়্‌ল। সে বল্‌লে, 'বিশ্বাস করুন, আমার কোনো রোগ নেই।'

আমি বিষম অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লুম, 'আ আ-মি তা-তা Mean করিনি। কিছু ম-ম-নে ক'রবেন না।' এই ব'লে এক হেঁচ্‌কি।

সে তখন বল্‌লে, 'অনুমতি দেন তো আমিই চা ক'রে আনি।'

আমি বল্‌লুম, 'না, না', সুবর্ণদেবী। আমার লোকজন থাক্‌তে আপনি কেন কষ্ট ক'র্‌বেন।'

সে ক্ষুণ্ণ হ'লো। বল্‌লে, 'তবে আমি কোন অধিকারে এখানে থাকব?'

আমি সত্যিই বুঝ্‌তে পারিনে কেমন ক'রে লোকে অপরিচিতা মেয়েকে বিয়ে করে। আমার পাপ মন বলে, ওটা ভণ্ডামি। অর্থাৎ কাম প্রবৃত্তির জন্যে প্রত্যেকের মনে যে ধিক্কার আছে সেই ধিক্কারটাকে মন্ত্র প'ড়ে শোধন ক'রে নিলে নিজেকে ও অপরকে বঞ্চনা ক'র্‌তে আর বাধে না, তখন সে তো কামপ্রবৃত্তি নয়, সে ধর্মসাধন, বংশ রক্ষা, কঠোর কর্তব্য, ইত্যাদি, তখন অপরিচিতা মেয়ের গায়ে হাত দিতে অনুমতির দরকার হয় না, মন্ত্রটাই তো অনুমতি।

তবু একে যদি বিয়ে করবার উপায় থাক্‌ত আমি বিয়ে ক'র্‌তুম। ভণ্ডামি না ক'রে, মনকে চোখ না ঠেরে এই দেবী প্রতিমার মতো নারীকে শয্যায় অংশ দিতে আমার যে লজ্জা, যে পুলক, যে দুঃসাহস তা আমার মতো বাজে লোকের সাজে না, তা অর্জুনের মতো বীরের পক্ষেই শোভন।

না, আমি বীর নই, বৃন্দাবনের কাছে বীরপনা জাহির না ক'র্‌লে ভালো ক'র্‌তুম।

আমাকে নির্বাক দেখে সে বল্‌লে, 'তা হ'লে এখানে আমার স্থান হবে না?'

এর উত্তর কী দেবার আছে? 'না' বল্‌লেই ফুরিয়ে যায়। অথচ সে চ'লে যাক্‌ এ কি আমি মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারি? বিলেত থেকে এসে অবধি আমি স্ত্রী-জাতির সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বল্‌বার সুযোগ পাইনি, মামুলি আদব কায়দা বাঁচাতে বাঁচাতে জান খতম। আর

এমনি এদেশে নারী দুর্ভিক্ষ যে বুড়ি মেম ও ভুঁড়ি বিশিষ্ট ইঙ্গ-বঙ্গিনী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে মিশ্‌তে পাই নে। এই মেয়েটি যখন দেড়শো মাইল দূর থেকে এসেছে তখন এর সঙ্গে দেড় ঘণ্টা আলাপ ক'র্‌বো না?

'দেখুন' আমি আরম্ভ করলুম। কিন্তু অগ্রসর হ'তে পার্‌লুম না।

সে অতিষ্ঠ বোধ ক'র্‌ছিল ব'লে বোধ হ'লো। 'দেখুন, আপনাকে বৃন্দাবন কী জানিয়েছে—'

'বৃন্দাবন বাবু এই জানিয়েছেন যে আপনার একটি পাচিকা চাই। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, মনে হয় মন্দ রাঁধিনে। তবে বিলিতী রান্নার কথা আলাদা।'

এইবার আমি একটা ছুতো পেলুম। বল্‌লুম, 'ঐটেই তো আমার পক্ষে আসল। আমি—বুঝ্‌লেন্ কিনা—একেবারে বিশুদ্ধ বিলেত ফেরৎ। গোরু ছাড়া বড় কিছু খাইনে।'

সে অবিচলিত স্বরে বল্‌লে, 'যদি কেউ শিখিয়ে দেয় তাই রেঁধে খাওয়াবো।'

আমি ভড়কে গেলুম! বল্‌লুম, 'তারপর—এই দেখুন—খানাই সব নয়, পি[illegible] আছে। ওসব বিষয়ে বুঝলেন কিনা—আমি একেবারে সে কেলে বিলেত ফেরৎ।'

সে বল্‌লে, 'দেখিয়ে দিলে তাও পারব।'

এর উপর আমি আর কী বল্‌তে পারি? তবু যতো রকম ভয় দেখাতে পা[illegible]খালুম। বল্‌লুম, 'ভীষণ বদ্‌রাগী মানুষ আমি। চাবুক নিয়ে যাকে কাছে পাই তাকে [illegible]। তা নইলে আমার আবার ঘুম হয় না।'

সে এতক্ষণ পরে একটু মুচ্‌কি হাস্‌ল। বল্‌লে, 'বেশ। না হয় দু'দশ ঘা মারবেন।'

তখন আমি মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বল্‌লুম, 'মাইনে—মাইনে কিন্তু আমি দিতে পার্‌ব না। পাচিকা চাই ব'লে পাচকটিকে যে ছাড়িয়ে দেবো এমন কথা তো বলিনি। ওকে ওর মাইনে না দিলে ওকি আপনাকে বিলিতী রান্না শেখাবে? উপরন্তু আপনাকে যে মাইনে দেবো—বুঝ্‌লেন কি না—আমার মাইনে থেকে উদ্বৃত থাক্‌লে তো দেবো? খানা পিনাতেই সব ফুঁকে দিই।'

'আচ্ছা, আমি বিনা বেতনেই চাক্‌রি কবুল কর্‌ছি।'

আমার ইচ্ছা ক'র্‌ল বলি, সুবর্ণ, তোমাকে আমি মাথায় ক'রে রাখ্‌ব। আমার সর্বস্ব তোমার। কিন্তু আমার এমন লজ্জা ক'র্‌তে লাগল তার সঙ্গে থাকার কথা ভাব্‌তে। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমি সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে সর্বনাশ ঘটাই নি।

আমি চুপ ক'রে থাক্‌লুম অনেকক্ষণ।

সে উঠে এসে আমার পায়ে প'ড়ে বল্‌লে, 'বিশ্বাস করুন। আমার ও রোগ নেই।'

তার চোখ সজল। তাকে যে কী রমণীয় দেখাচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হ'য়ে নিরীক্ষণ ক'র্ছিলুম, পা সরিয়ে নিতে ভুলে গেলুম। তাকে হাত ধ'রে তুল্‌তেও আমার সাহস হচ্ছিল না।

হৃদয়কে শক্ত ক'রে বল্‌লুম, 'কিন্তু আপনি পরস্ত্রী।'

সে মাথা তুলে বল্‌ল, 'না। আমি আপনারই স্ত্রী।' তার অশ্রু বাধা মান্‌ল না। বোধ হয় সারা দিন অনাহারে কেটেছে—ট্রেনে। সে আমার পদচুম্বন ক'র্‌ল।

এতো কঠিনতার মধ্যেও এতো কোমলতা ছিল। কিন্তু এ কী রোমান্স্! আমি তো আর্টিষ্ট নই, সঙ্গীত কলানিধি নই, আমি কাজের লোক, ব্যাঙ্কের চাকুরে। তাও বৃন্দাবন যতো বড় মনে করেছিল ততো বড়—অর্থাৎ এজেন্ট—নই। আমি কি রোমান্সের যোগ্য?

সামাদ যখন চা নিয়ে এলো সে তখন তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিয়ে আঁচল খস্‌খসিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে ব'স্‌ল। সামাদটা যে কী মনে ক'রলে! অতিরিক্ত গম্ভীর ভাবে চা রেখে দিয়ে দু'জনকেই সেলাম ক'রলে। যেতে যেতে হাসাহাসি ক'রলে বোধ হয় শুক্‌দেওরাম বেয়ারার সঙ্গে—আড়চোখে বেয়ারাও স[illegible] জুতো বার্নিশ করছিল বারান্দায়।

আমি বল্‌লুম, 'সুবর্ণ, তুমি বড় দুঃখিনী। কিন্তু তো[illegible] দুঃখ দূর করা আমার অসাধ্য। দু'দিন পরে তুমি চাইবে মা হ'তে। আমি কেমন ক'রে তার সমর্থন করি?'

সে বল্‌লে, 'সে অনেক পরের কথা। আমি ও কথা ভ[illegible]বিনি।'

আমি হেসে বল্‌লুম, 'তুমি না ভাব্‌লেও প্রকৃতি ভাব্‌বেন। তাঁর নিয়ম অমোঘ।'

সে তবু বল্‌লে, 'যা হবার তা হবে। এতে ভাব্‌বার কী আছে? সংসারে কেউ কি মা হচ্ছে না?'

'কিন্তু সমাজ যে তোমার সন্তানকে অসম্মান ক'র্‌বে?'

'আপনি থাক্‌তে?'

'আমিই বা এমন কী! আমার চেয়ে যাঁরা সব বিষয়ে বড় তাঁরাও অমন সন্তানের জনক হবার ভয়ে উর্দ্ধশ্বাস—।'

সে বোধ হয় বিশ্বাস ক'র্‌ল না। এমন একটা সহজ বিষয়ে এতো ভয় পাবার কী আছে? অন্য মনে কী চিন্তা ক'র্‌ল। চা খেলো না।

'চা খাও, চা খাও,' আমি একটু পীড়াপীড়ির সুরে বল্‌লুম[illegible] আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবো।'

সে জ্ব'লে উঠে বল্‌লে, 'চা খেতে আমি আসিনি।' উঠে বল্‌লে, 'আর ট্রেণে ওঠানামা ক'র্‌তেও আমি জানি।'

তার দু'বছর পরে আবার বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা। দু'চার কথার পর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, 'ভালো কথা সুবর্ণর খবর কী?'

সে আশ্চর্য হ'য়ে বল্‌লে 'সুবর্ণ!' তারপর হেসে বল্‌লে, 'ওঃ! তোর সেই পাচিকা সুবর্ণ?'

আমি অনুতাপের সঙ্গে লজ্জা মিশিয়ে বল্‌লুম, 'হ্যাঁ।—আমার সেই উপযাচিকা সুবর্ণ!'

'ওর নাম তো এখন সুবর্ণ নয়। ওর নাম ফরজন্দ্‌-উন্নেসা। ওর স্বামী এক পেশাওয়ারী ফলওয়ালা, আব্‌দেল ক্কাদের। ওর একটি ছেলে হ'য়েছে, জুলফিকার। বিবি এখন ঘোর পর্দানশীন।...ছি, ছি, শেষকালে মুসলমান হ'য়ে গেলো!'

অগ্রদানী

ও

প্রতিমা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়— জন্ম ১৮৯৮ বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। শিক্ষা, লাভপুর উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ও কলকাতায় সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে। শিক্ষার শেষে পৈতৃক বাসস্থান বীরভূম জেলায় বৈষয়িক কর্মের সঙ্গে দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তারই ফলে ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে স্থানীয় নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে কারাবরণ করেন। আধুনিক সাহিত্যের নবীন সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে ইনি নিজস্ব গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। তারাশঙ্করের সাহিত্য বাংলার বৃহত্তম সমাজ—পল্লীগ্রামকে কেন্দ্র ক'রে। রূঢ় বাস্তবের মধ্যে পল্লীর সুখ-দুঃখ, আশা, আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ, নীচতা-দীনতা, অকৃত্রিমভাবে ফুটে ওঠে এঁর সাহিত্যে। এর সৃষ্টির অন্তরালে যেন এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কথা বলে। "রসকলি" এঁর প্রথম গল্প; গল্পটি ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত বই "রাইকমল"। তার কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত এর বিখ্যাত উপন্যাস "চৈতালী ঘূর্ণী"। এ পর্যন্ত এঁর মাত্র নয়খানি বই প্রকাশিত হয়েছে, উপন্যাস—রাইকমল, চৈতালী ঘূর্ণী, পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, প্রেম ও প্রয়োজন, আগুন। গল্প—ছলনাময়ী, জলসা ঘর, রসকলি।

অগ্রদানী

একটা ছয়ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়; দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা। লোকে বলিত, মই আসছে, মই আসছে। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ কি রকম, হাসছ যে?

এই দাদা, একটা রসের কথা হ'চ্ছিল।

হুঁ। তা বটে, তা তোমার রসের কথা—ও তোমার রস ওয়ারই সমান।

একজন হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল, মই আসছে।

চক্রবর্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত হুঁ, তা বটে। তা কাঁধে চড়লে স্বর্গে যাওয়া যায়। বেশ পেট ভঁরে খাইয়ে দিলেই. বাস্, স্বর্গে পাঠিয়ে দোব।

আর পতনে রসাতল, কি বল দাদা?

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়িত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোনদিন রায়েদের বাগানে, কোনদিন মিঞাদের বাগানে ছেলেদের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম, জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরস পরিপক্ক ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি বোল্‌তার দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণের ভয়

দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না ; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, এ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, এ্যাঁ !

সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা দুই মুখে পুরিয়া বলিত, আঃ !

কেহ হয়তো বলিত, বাঃ পুন্ন কাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ ? ঠাকুরপূজো ক'রবে না ?

পূর্ণ উত্তর দিত, ফল—ফল, ভাত মুড়ি তো নয়, ফল—ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেদিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে ছিল ব্রাহ্মণ-ভোজন। শ্যামাদাসবাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ পাঁচটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বেও বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী শিবরাণী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে দেখ ; তারপর আমি বারণ ক'রব না, নিজে আমি তোমার বিয়ে দেবো।

শিবরাণী তখন আবার সন্তান-সম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা করিলেন যে, সে ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরাণীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক বলা হয় না, পুত্রেষ্টিযজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিৎ।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পংক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটীর নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কি নাই, কি চাই। একপাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতটি তাহার ছাঁদা ; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সেই শ্যামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে। আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এবং এই ক্ষেত্র বিশেষটিতে নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দিষ্ট কাজ এখানে পঞ্চ গ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন পূর্ণ চক্রবর্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয় ; হাঁটু পর্যন্ত কোনরূপে ঢাকে এমনই বহরের তাহার পোষাকী কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে, হুঁ, তা কর্তা কই গো, নেমন্তন্ন কি রকম হবে একবার ব'লে দেন ! ওঃ, মাছগুলো যে বেশ তেলুক-তেলুক ঠেকছে ! কই কই ! নিয়েছিল এক্ষুণি চিলে !

চিলটা উড়িতেছে দূর আকাশের গায়, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্খার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেরে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্তব্য সারিয়া আসে; সেই কর্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন, আর কয়েকখানা মাছ দিক চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর তখন খান বিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল, আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছো তো। হরে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া ইয়া ছানাবড়া ভাসছে আমি দেখে এসেছি!

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, সে তো হবেই; একটা মাছের মুড়ো?

পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, ছোট দেখে।

মাছের মুড়াটা শেষ করিতে করিতে ওপাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর সব, হুঁ। নইলে নোন্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলিনা, মাছসুদ্ধ প'ড়ে আছে!—বলিয়া ছোট ছেলেটার পাতের আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল, এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটিপি করিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল, চোখ দু'টো দেখ, চোখ দু'টো দেখ!

উঃ, যেন চোখ দিয়ে গিলছে!

আমি তো ভাই, কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ, কি দৃষ্টি।

ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল, ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

বাঃ, সে তো চারটে ক'রে মিষ্টি পান মশায়।

সে দু'টো করে যদি পাতে পড়ে, তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়েছে, তখন আটটা পাব না, বাঃ!

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন, ষোলটা দাও ওঁর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনি-মাইনেতে নেমন্তন্ন ক'রে আসেন; দাও দাও, ষোলটা দাও।

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, আঁচলে দাও, আমার আঁচলে দাও।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, কাল সকালে একবার আসবে তো? কেমন, এখানে এসেই জল খাবে!

যে আজ্ঞে, তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল, চক্রবর্তী, বাবুকে ধ'রে প'ড়ে তুমি বিদূষক হ'য়ে যাও—আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, হুঁ। তা তোমার, হ'লে তো ভালই হয়; আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কি? রাজা জমিদারের বিদূষক হ'য়ে যদি ভালমন্দটা—

বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া উঠিল।

বাড়িতে আসিয়া ছাঁদা বাঁধা গামছাটা বড়ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল, যা বাড়িতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজমেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো?

সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

এঁ্যা, তুমি লুকিয়ে রাখবে। ষোলটা মিষ্টি কিন্তু গুণে নোব; হঁ্যা।

আরে আরে, এ ব'লছে কি! ষোলটা কোথারে বাপু! দিলে তো আটটা, তাও কত ঝগড়া ক'রে।

মা, মা! দেখ' বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রেখেছে, এঁ্যা।

চক্রবর্তী-গৃহিনী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র; তবুও হৈমবতী যেন সত্যই হৈমবতী। কাঞ্চনিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি; প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল, ব'লছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না; না, মেয়ে চেঁচাতে—

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিওনা, মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন ক'রেছে বাবাকে, মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো, বেরো, বেরো ব'লছি আমার সুমুখ থেকে, হতভাগা ছেলে! বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন, আমি যে বাঁচি!

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল, দেখ না, ছেলের তরিবৎ যেন চাষার তরিবৎ!

হৈম বলিল, বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে সেটুকুও ভাগ্যি মে'ন। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবু মরে না ওরা! রাক্ষসের ঝাড়, অখণ্ড পেরমাই!

চক্রবর্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ দেখিরে, এক টুকরো হর্তুকি কি সুপুরী যদি পাস। তোর মার কাছে যেন চাস্ নি বাবা।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে, রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলেটারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্তত চক্রবর্তীর তাই মনে হইল; সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্দ্ধমান বহ্নি-শিখার মত জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল, শীর্ণ দুর্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সন্তান-সম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়ে। ছেলেগুলাও ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ, হৈম ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, হৈমর আঁচল হইতে দড়িতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল, ছানাবড়া খাব। বড়ছেলেটা ঘুর-ঘুর করিয়া বার বার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল, সব—সব—সবগুলো বের ক'রে দিচ্ছি, একটা কেন?

সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে, মিষ্টান্নগুলির অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে; মাত্র গোটা তিন চার মেঝের উপর পড়িয়া আছে, তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক, নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকাটাকে সে

একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়—টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, গিন্নীর একান্ত ইচ্ছে যে, তুমি এবার তাঁর আঁতুড়-দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকা-গৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে সব কটিই জীবিত, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি; তাহার সূতিকা-গৃহের দুয়ারে চক্রবর্তীই শুইয়া থাকে। তাই শিবরাণী এবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কল্যাণের এমনই সহস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামাদাসবাবুও তাহার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা আজ্ঞে---

একজন মোসায়েব বলিয়া উঠিল, তা, না, না—কিছু নেই চক্রবর্তী দিব্যি এখানে এসে রাজভোগ খাবে রাত্রে, ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে, বুঝেছ?—বলিয়া সে ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া দেখাইল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, তা হুজুর যখন বল্‌ছেন, তখন না পারলে হ'বে কেন?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, ব'স তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার আসছে।—বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একজন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্নপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

একজন বলিল, খাও চক্রবর্তী।

হুঁ, তা একটু জল, হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর একজন পারিষদ বলিল, গঙ্গা গঙ্গা ব'লে ব'সে পড় চক্রবর্তী। অপবিত্র পবিত্রো বা, ও বিষ্ণু স্মরণ ক'রলেই সব শুদ্ধ, ব'সে পড়।

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, পেট ভর্‌লো চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। একজন বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, কথা বলবার অবসর নেই চক্রবর্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল, আজ্ঞে পরিপুন্ন। তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে।

সে উঠিয়া পড়িল।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দোব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তা হ'লে তোমার কথা তো পাকা, কেমন?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত হইয়া উঠিল!

সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ—সে যে রাজভোগ!

হু, তা পাকা বইকি! হুজুরের—.

কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি দেখি ওহে, দেখি!

চোখ তাহার যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া ছিল। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মত বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্তী স্থান কাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, দেখি দেখি, ওহে, দেখি দেখি!

শ্যামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, কর কি, কর কি, এঁটো, ওটা এঁটো! নতুন এনে দিক!

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল, আজ্ঞে রাজার প্রসাদ!

আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্যায়টা মুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকিটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনরূপে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়িতে তখন মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলে-গুলা কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজমেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে, তাই দাদা ঝগড়া ক'রে মাকে মেরে পালালো। মা প'ড়ে গিয়ে—

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল; জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি ছি! তোমাকে কি ব'লব আমি, ছিঃ!

চক্রবর্তী হৈমর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চিৎকার করিয়া উঠিল, মাথা ঠুকে মরব আমি, ছাড়, পা ছাড়।

সমস্ত দিন হৈম নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া কহিল, তোমার বলছ আবার ওই সময়েই! তা হলে না হয় কাল ব'লে দেব যে পারবো না আমি।

হৈম চিৎকার করিয়া উঠিল, না না না। মরুক, মরুক, হ'য়ে মরুক আমার। আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসববেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল, হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল, যাও তুমি।

কিন্তু—

আমাকে আর জ্বালিও না বাপু, যাও। বাড়িতে বড় খোকা রয়েছে, যাও তুমি।

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার-বাড়ি তখন লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, এস চক্রবর্তী, এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্তী তখনই গিয়া রান্নাশালে উঠিল।

হুঁ, ঠাকুর, কি রান্না হচ্ছে আজ? বাঃ, খোসবুই তো খুব উঠেছে! কি হে ওটা মাছের কালিয়া, না মাংস?

মাংস। আজ মায়ের পূজা দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কিনা।

হুঁ, তা তোমার রান্নাও খুব ভাল। তার ওপর তোমার বাদলার দিন। কত দূর, বলি দেরি কত? দাও না, দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল।

ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী!

হুঁ, তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশি। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, সিদ্ধ হ'তে দেরি আছে নাকি?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখ, বল্‌লে তো বিশ্বাস ক'রবে না। নাও, হুঁ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াৎ করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল, হুঁ। বাঃ, ঝোলটা বেড়ে হয়েছে!

হুঁ, তা তোমার রান্না যাকে বলে উৎকৃষ্ট।

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোন উত্তর দিল না।

চক্রবর্তী আবার বলিল, হুঁ, তা তোমার, এ চাকলায় তো কাউকে তোমার জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি, তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চল্‌ছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হ'লে খবর দেবে চাকররা।

আমাকে কাজ ক'রতে দাও, যাও ওঠ।

চক্রবর্তী উঠিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সময়েই তাহার বড়ছেলেটা আসিয়া ডাকিল, বাবা!

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি রে?

একবার বাড়ি এস। ছেলে হয়েছে।

তোর মা, তোর মা কেমন আছে?

ভালই আছে গো, তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ি; নাড়ি কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

হৈম!

ভয় নেই ভালই আছি। তুমি শুদ্দুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ি কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে তো পাওয়া যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ি কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হইচে বাপু, মা-বাপ সোন্দর না হ'লে কি ছেলে সোন্দর হয়। মা কেমন—তা দেখতে হবে।

হৈম বলিল, যা যা বকিস নি বাপু; কাজ হ'ল তোর, তুই যা।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা হ'লে, তাই তো! খোকা যাক, ব'লে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুন ওঁরা।

হৈম বলিল, দেখ, জ্বালিও না আমাকে। যাও বল্‌ছি, যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ির দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদারবাড়ি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন

করিয়া নাড়ি কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পন করিয়া সে যখন বিদায় হইল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলেটার ভোররাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল হুঁ, তা—

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন, যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হ'য়ে উঠলে। কিসে যে কি হয়—হুঁ।

হৈম বলিল, ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সাটাকের সাবু কি দুধ যদি একটু পাও তো দেখ দেখি। আমাকে কাটলেও তো এক ফোঁটা দুধ বেরুবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ির দিকেই চলিল, দুধের জন্য। কাছারি বাড়িতে ঘটিটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর; যাও বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। একজন নিম্নশ্রেণির ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল; চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ বাবা ছেলের জন্যে গাই দোয়া হয় নি?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, ধারস্ব খাবে নাকি? আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক। না গাই দোয়া হয় নি; বাড়িতে ছেলের অসুখ, ওসব হবে না এখন যাও।

শিশুর অসুখ বোধ হয় শেষরাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সারারাত্রিব্যাপি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরাণীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রি জাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতে বেশ একটু বেলা হইলে শিবরাণী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিলেন। একি, ছেলে যে কেমন করিতেছে। তাহার পূর্বের সন্তানগুলিও তো এমনই ভাবেই—! চোখের জলে শিবরাণীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্রপুষ্পতুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরাণী আর্তস্বরে ডাকিল, যমুনা, একবার বাবুকে ডেকে দে তো!

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও, ছেলে কেমন হ'য়ে গেছে! সেই অসুখ!

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা দুর্গা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শ মত শহরেও লোক পাঠানো হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শিবরাণীর আশঙ্কা সত্য; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরাণীর শিশুগুলি এমনই করিয়াই সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্নে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল ডাক্তারবাবু ছেলে—

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি।

শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল। শ্যামাদাসবাবুর মাসীমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই ছেলে নিয়ে আয় তো দেখি!

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল রে!—বলিয়া ললাটে করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন, আরও বার ক'রে দিতে হয়েছে। কি ক'রেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোলেই বা—

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে ক'রবেন না শ্যামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব?

বলুন।

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্নে সংগ্রহ করিয়া বলিল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হ'ল আপনার সন্তানদের অকাল-মৃত্যুর কারণ।

তা হ'লে ছেলেটা কি—

না, আশা আমি দেখি না—বলিয়া ডাক্তার বিদায় হইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ির মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা। আচার-আচরণগুলোও মান্‌তে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোন প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে

আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরাণীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

তাহার কাছে রহিল দাই, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ, আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরাণীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ; কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি! তাহার শিশুটা মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত এক থালা! ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে!

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে।

চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল, একটু জল-টল মুখে দে রে বাপু!

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল, জল কি যাবে গো ঠাকুর? তা বলছ, দিই।

সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তারপর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর, তোমার কি আর ঘুম-টুম নাই!

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশ-জোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনই অন্ধকার। আঃ, ছেলেটা যদি যাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া ওঠে! চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্পর্শ করিল।

অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপে।

না না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল। দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরাণীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না। কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দরিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে! উঃ!

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক

মুহূর্ত। পরমুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত, সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মত!—নিঃশব্দে, লঘু দ্রুত গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, তাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাঙ্গা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই। হৈমর সূতিকা-গৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনরূপে আগলানো আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসের মত লঘু ক্ষিপ্র গতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যু-রোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিল না। চক্রবর্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরাণীর অস্ফুটক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল, দাই, ও দাই! ওমা, নাক ডাকছে যে! ঠাকুরও দেখছি মড়ার মত ঘুমিয়েছে! ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। যমুনা বলিল, এই বুঝি তোর ছেলে আগ্‌লানো! ছেলে যে কাতরাচ্ছে, মুখে একটু ক'রে জল দে।

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল; শুষ্ককণ্ঠ শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল।

এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওগো, জল খাচ্ছে গো ঠোঁট চেটে চেটে!

শিবরাণী দুর্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে, কারও কথা আমি শুনব না।

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে। এবার অন্য ডাক্তার আসিবে। মৃত্যুদ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে! হতভাগ্যের সন্তানটি মারা গিয়াছে। প্রায়ান্ধকার সূতিকাগৃহে

শিবরাণী জ্বর-কাতর শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্য-দেবতা, তাহার হারাণো মাণিক!

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদও এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই তেমনই করিয়া বেড়ায়।

লোকে বলে, স্বভাব যায় না ম'লে।

চক্রবর্তী বলে, হুঁ, তা বটে। কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক একটা ছেলে যে একটা হাতীর সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে ইস্কুলে দিয়াছে। বড়ছেলেটি এখন ইতরের মত কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, বাবার ব্যবহারে ইস্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার, মা। ছেলেরা যা-তা বলে। কেউ বলে, ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ কেউ আবার দেখলেই সড়াৎ ক'রে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু, বারণ ক'রে দিও বাবাকে।

হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল, চ'লে যাব, চ'লে যাব আমি সন্নেসী হ'য়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল, চক্রবর্তী!

কে?

বাড়ুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেয়ের বাড়ি তত্ব যাবে, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভালমন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।

আচ্ছা, চল যাই।

চক্রবর্তী বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ুজ্জেদের বাড়ি গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারি হইতেছিল সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণংগতি। হুঁ, তা যেতে হবে বইকি! উনোনের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল হে মোদক মহাশয়?

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৎসর দশেক পর। শিবরাণী হঠাৎ মারা গেলেন। লোকে বলিল, ভাগ্যবতী। স্বামী-পুত্তুর রেখে ডঙ্কা মেরে চলে গেল!

শ্যামাদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ওই-খানেই বাসা হইয়াছে। সকালবেলাতেই ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া গিয়া হাজির হয়; বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলি-বন্দোবস্ত দেখে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল, হুঁ, ছাঁদা একটা ক'রে তো দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা কখানা আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে?

একজন উত্তর দিল, হবে হবে। একখানা ক'রে লুচি, এই চালুনের মত। আর মিষ্টি একটা ক'রে, তোমার লেডিকেনি, এই পাশ-বালিশের মত, বুঝলে!

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটু থাম তো সব। হ্যাঁ কি হ'ল, পাওয়া গেল না?

একজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হ'য়ে গিয়েছে।

তা হ'লে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হ'লে তো শ্রাদ্ধ হয় না।

আচ্ছা, তাই দেখি, অগ্রদানী তো বড় বেশী নেই, দশ-বিশ ক্রোশ অন্তর একঘর আধ ঘর।

কে একজন বলিয়া উঠিল, তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে, চক্রবর্তী নাও না কেন দান। ক্ষতি কি? পতিত ক'রে আর কে কি ক'রবে তোমার?

শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মন্দ কি চক্রবর্তী। শুধু দান-সামগ্রী নয়। ভূ-সম্পত্তিও কিছু পাবে; পঁচিশ বিঘে জমি দোব আমি, আর তুমি যদি রাজি হও তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দোব আমি, দেখ।—বলিয়াই তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার মিষ্টি কি আছে, নিয়ে আয়।

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল, শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরাণীর শ্রাদ্ধ করিতেছে আর তাহার সম্মুখে অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্তী।

তারপর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

গল্পের এইখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্তীর আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই। লুব্ধ দৃষ্টি লোলুপ রসনা লইয়া সে তেমনই করিয়াই ফিরিতেছিল।

এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাসবাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থতরুর মত দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না পারলে উপায় কি চক্রবর্তী? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে—তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারবেনা বল্‌লে চল্‌বে কেন, বল? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশু পুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল খাও হে চক্রবর্তী।

প্রতিমা

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশে মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রংও ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে। রৌদ্রের রঙেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার পর এবার বর্ষা হইয়াছে ভাল, মাঠে ধানের রং কস্‌কসে কালো আর ঝাড়ে গোছেও সুন্দর পরিপুষ্ট। দেশে একটা প্রশান্ত ভাব। গৃহস্থবাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গেছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে। ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আল্‌পনা দেওয়া আছে, খই মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজার কাজের কি অন্ত আছে!

চাটুজ্জে-বাড়ির গিন্নী বলেন, মা, ও মেয়ের হ'ল দশ হাত, তারপর সঙ্গে আছে মেয়ে ছেলে সাঙ্গপাঙ্গ, আমরা দু হাতে উদ্যুগ ক'রে কি কুলিয়ে উঠতে পারি?

আজ চাটুজ্জে-বাড়িতে প্রথম মাটির 'চোঁব' পড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপে কারিগর আসিয়া গেছে, প্রতিমাতে আজ প্রথম মাটি পড়িবে।

বাল্‌তিতে করিয়া রাঙা মাটি গোলা হইয়াছে। বাড়ির বউ এবং ঝিউড়ি মেয়েরা গাছকোমর বাঁধিয়া হাতে সোনার অলঙ্কারের উপর ন্যাকড়া জড়াইয়া বসিয়া আছে, প্রতিমাতে মাটী পড়িলে হয়!

গিন্নী বলিলেন, ওরে, যা তো কেউ, দেখে আয় তো দেরি কত? ছেলেগুলো সব গেল কোথায়?

একটি মেয়ে বলিল সব গিয়ে ঠাকুর-বাড়িতে ব'সে আছে।

সত্যই, সব ছেলে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়া ছিল। বুড়া মিস্ত্রী কুমারীশ তখন লম্ফঝম্ফ করিয়া চৌকিদারের সঙ্গে বকাবকি করিতেছিল, বলি, তোর বিত্তিগুলো আমাকে দিবি? তোর কাজ আমি করব কেন শুনি?

চৌকিদার কালাচাঁদ বলিল, ওই দেখ আগ কর কেন গো! উ মাটী আনতে গেলে কেউ দেয় নাকি? ব'লে, গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না?

বলি, রাত্তিরে হাঁক দিতে বেরিয়ে লুকিয়ে খানিকটে আনতে পার নাই? না, হাঁকই দাও না রাত্তিরে?

ওই দেখ, কি বলে দেখ, হাঁক না দিলে হয়? একবার ক'রে তো বেরুতেই হয়। তা তুমি যে আজ আসবে, তা কি ক'রে জানব বল? ভুল হ'য়ে গেইছে।

চাটুজ্জে গিন্নী বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, অ কুমারীশ, বলি, হ'ল তোমার? মেয়েরা যে গোলা গুলে ব'সে আছে গো! আর বকাবকি—

শীর্ণ খর্বাকৃতি মানুষ কুমারীশ, হাত-পাগুলি পুতুল-নাচের পুতুলের মত সরু এবং তেমনই দ্রুত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে নড়ে। আর চলেও সে তেমনই খরগতিতে। কুমারীশ গিন্নীমায়ের কথা শেষ হইবার পূর্বেই তারস্বরে চিৎকার করিয়া আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, কালাচাঁদকে নিয়ে আমি আর কাজ ক'রতে পারব না; কোন উয্যুগ নাই, মাথা নাই, মুণ্ড নাই, হাত নাই, পা নাই—আমি আর কি ক'রব বলুন?

বলিতে বলিতেই সে গিন্নীমায়ের নিকটে আসিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া একেবারে প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল; তারপরে ভাল আছেন মা? ছেলেপিলে সব ভাল? বাবুরা সব ভাল আছেন? দিদিরা, বউমারা সব ভাল আছেন?

গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ সব ভাল আছে। তোমার বাড়ির সব ছেলেপিলে—

কথা কাড়িয়া বলা কুমারীশের অভ্যাস; সে আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, হাম, পেটের অসুখ, জ্বর—সব 'পইলটা' খেলছে মা, ডাক্তার বদ্যিতে ফকির ক'রে দিলে।

তারপর আবার অত্যন্ত প্রশান্তভাবে সে বলিল, শুনলাম, ছোটবাবু এসেছেন ফিরে—বড় আনন্দ হ'ল। তা এইবার বউমাকে নিয়ে আসুন, সব ঠিক হ'য়ে যাবে! ছেলে মানুষ, বুদ্ধির দোষে একটা—তা, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

গিন্নীমা সমস্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিলেন, তোমার আর দেরি কিসের শুনি? বউরা মেয়েরা গোলা দিয়ে চান-ই বা ক'রবে কখন, খাবেই বা কখন?

কুমারীশ বলিল, আর দেরি কি! সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে, কেবল এই বেম্মের আগুনের মাটি লাগে কিনা তাই—

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর তাহার পঞ্চমে উঠিয়া গেল, তাই শুধুন কেন ওই বেটা বাউড়িকে যে, মাটি কই? বাবু ভুলে গিয়েছেন। এ আমি কি করি বলুন দেখি, যাই, আমি আবার দেখে নিয়ে আসি। হুঃ, উয্যুগ নাই, আয়োজন নাই, আমারই হয়েছে এক মরণ! বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং অনুরূপ দ্রুতকণ্ঠে বকিতে বকিতে ওই মাটির সন্ধানে পথ ধরিল।—আমারই হ'য়েছে এক দায়, যাই, এখন কোথা পাই বেম্মের বাড়ি, দেখি। হারামজাদা বাউড়ি বলে, গাল দেবে! আরে, গাল দেবে কেন? কই, আমাকে গাল দেয় না কেন? যত

সব—। দক্ষিণে তো সেই মামুলী বার টাকা, বারো টাকায় কি মাথা কিনে নিয়েছে আমার? পারব না, জবাব দিয়ে দেব। অঃ, খাতির কিসের রে বাপু?

গণ্ডগ্রাম হইলেও পল্লীগ্রাম, এখানে শহর বাজারের মত প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোন রূপোপজীবিনী বাস করে না, তবে নিম্নশ্রেণীর জাতির মধ্যে কলঙ্কিনীর অভাব নাই। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণাংশে ডোমপল্লী, এই ডোমেদের পুরুষেরা করে চুরি, মেয়েরা করে দেহ লইয়া বেসাতি। মা বাপ লইয়া সংসারের গৃহাচ্ছাদনের আচরণ দিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা সব করিয়া থাকে। কুমারীশ এই ডোমপল্লীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বলি কই গো সব, দিদিরা সব কই, গেলি কোথা গো সব?

অদূরে একটা গাছতলায় চার পাঁচটি মেয়ে জটলা করিয়া বসিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কুমারীশের কণ্ঠস্বরে, ধ্বনিতে সকলে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

একজন বলিয়া উঠিল, ওলো, সেই পোড়ারমুখো আইচে লো, সেই মিস্ত্রী, মাটি নিতে আইচে মুখপোড়া।—বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসির একটা মস্ত কলরোল তুলিয়া দিল।

এই যে, এই যে সব ব'সে রয়েছিস। তারপর সব ভাল আছিস তো দিদিরা? রং নিয়ে আসিস, যাস সব, যাস। এবার ভাদু কেমন গ'ড়ে দিয়েছিলাম, তা বল?

কুমারীশ এক মুঠা মাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াই তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা মেয়ে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, মাটি নিতে আইচ বুঝি তুমি? কেনে, কেনে তুমি লিবে শুনি?

লে লে, কেড়ে লে, মুখপোড়ার হাত হ'তে, লে, কেড়ে লে।

কুমারীশ একরূপ ছুটিয়াই পথে নামিয়া অত্যন্ত খরবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, প্রতিমে হবে দিদি প্রতিমে হবে। যেও, যেও সব, রং দেব তুলি দেব। পদ্ম আঁকবে দোরে?

মেয়েরা আবার হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

একজন বলিল, ধর ধর, বুড়োকে ধর।

একজন বলিল, সবাইকে রং দিতে হবে কিন্তুক।

কুমারীশ চলিতে চলিতেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রং দেবার সময়, সেই—

সে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চাটুজ্জে-বাড়িতে মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া গোলা দেওয়া আরম্ভ করিল। মেয়েদের মধ্যে সে এক আনন্দের খেলা। গোলা দেওয়ার নাম করিয়া এ উহাকে কাদা মাখাইবে, নিজেও ইচ্ছা করিয়া মাখিবে। বেলা দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্যন্ত কাদা মাখামাখি করিয়া ঘাটে গিয়া মাথা ঘসিয়া জল তোলপাড় করিয়া তবে ফিরিবে। সমস্ত বৎসরের মধ্যে তাহাদের এ একটা পরম প্রত্যাশিত উৎসব।

বাড়ির বড়মেয়ে একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া গোলার প্রথম ছোপটা দেওয়ালে টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মেজমেয়ে বড়-ভ্রাতৃজায়ার গায়ে কাদা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমার মুখে গোলা দিয়ে নিকুতে হবে আগে—তুমি বাড়ির বড় বউ।

বড় বউ কিন্তু প্রতিশোধে মেজ-ননদের গায়ে কাদা দিল না, সে বড় ননদের গায়ে গোলা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তারপর ভাই বাড়ির বড়মেয়ে!

বড়মেয়ে হাতের কাদা-গোলা ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ্ করিয়া মেজ বউয়ের মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, তারপর আমাদের মেজগিন্নী!

মেজবউ টুলের উপর বড়-ননদের দিকে মুখ করিয়া মুখখানি বেশ উঁচু করিয়াই ছিল, ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ্ করিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর যেন সাঁটিয়া বসিয়া গেল। পরম কৌতুকে সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়েই একটি সুন্দরী তরুণী আসিয়া কাদা-গোলা লইয়া মেজ-ননদের গায়ে ছিটাইয়া বলিল, তোমায় কেউ দেয় নি বুঝি?

মেয়েদের হাসি কলরোল থামিয়া গেল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সকলে যেন বিব্রত হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বলিল, আমাকে বুঝি ডাকতে নেই বড়দি! আমি ব'লে কত সাধ ক'রে ব'সে আছি!

বড়বউ বলিল, ছোট বউ, তুমি ভাই মাকে জিজ্ঞেস ক'রে কাদায় হাত দাও।

মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, চাটুজ্জে গিন্নী নিজেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছোটবউকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কাদায় হাত দিও না, বউমা। অমূল্য দেখলে অনর্থ ক'রবে মা, কেলেঙ্কারির আর বাকি রাখবে না। তুমি স'রে এস।

ছোটবউয়ের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিয়া এক-পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কলরবের উচ্ছ্বাসে পূর্বেই ভাঁটা পড়িয়াছিল, তাহারা এবার কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বড়মেয়ে অত্যন্ত বিরক্তিভরে বলিল, সেই থেকে একটা বই ন্যাতা দেওয়ালে উঠ্‌ল না! নে নে, ন্যাতা দে না, অ বড়বউ!

ঠিক এই সময়েই কুমারীশ চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া বলিল, টুল নাই, মোড়া নাই, আমি কি তালগাছে চ'ড়ে মাটি দেব। কই গিন্নীমা কই? একটা টুল চাই যে মা, একটা টুল না হ'লে—আমি তো এই দেড়হাত মানুষ!

বাড়ির চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া গিন্নীমা বলিলেন, আর একটা টুল আবার কোথা গেল ? তুমি জান বড়বউমা ?

কুমারীশ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছোটবউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ বউটি কে গিন্নীমা ?

গিন্নীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ছোটবউমা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ মা ? ছি, বারবার ব'লে তোমাকে পারলাম না। যাও, ওপরে যাও।

ছোটবউ ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কুমারীশ বলিল, ইনিই আমাদের ছোটবউমা ? আহা হা, এ যে সাক্ষাৎ দুগ্‌গা-ঠাকুরুণ গো, এ্যাঁ এমন চেহারা তো আমি দেখি নাই ! আহা হা ! এ্যাঁ, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে, ছোটবাবু আমাদের, এ্যাঁ—ছি ছি ছি !

গিন্নীমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কুমারীশ, তুমি এসেছ প্রতিমে গড়তে, তোমার ওসব কথায় কাজ কি বাপু ? অ বড়বউমা, টুল আর একটা গেল কোথায় ?

কুমারীশ বারবার ঘাড় নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, তা বটে ; আপনি ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, তা বটে, আমাদের ও কথায় কাজ কি ? হ্যাঁ, তা বটে, তা আপনি ভাববেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে। আহা হা, এমন মুখ তো আমি—

বাধা দিয়া গিন্নীমা বলিলেন, তুমিও যাও কুমারীশ, আমি টুল পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে গল্প ক'র না, যাও আপনার কাজ কর গে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—আমার ব'লে কত কাজ প'ড়ে আছে ! সাতাশখানা প্রতিমে নিয়েছি। আমার ব'লে মরবার অবসর নাই !

কুমারীশ যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল, আহা, এ যে সাক্ষাৎ দুগ্‌গা-ঠাকরুণ গো !—সে কথাটা অতিরঞ্জন নয়। তবে উচ্ছ্বাসটা হয়তো অশোভন হইয়াছিল। চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবধূটি সত্যই অতি সুন্দরী মেয়ে। সকলের চেয়ে সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বড় বড় চোখ, বাঁশির মত নাক, নিটোল দুইটি গাল, ছোট্ট কপালখানি। কিন্তু চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটিই সর্বোত্তম, ওই চিবুকটিই মুখখানিকে অপরূপ শোভন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এত রূপের অন্তরালে লুকানো ছিল মেয়েটির দগ্ধ ললাট। তাহার এমন শুভ্র স্বচ্ছ রূপের অন্তরালে নির্মল জলতলের পঙ্কস্তরের মত সে ললাট যেন চোখে দেখা যাইত।

পাঁচ বৎসর পূর্বে, ছোটবধূ যমুনার বয়স তখন বারো, সে তখন সবে বাল্যজীবনের অনাবৃত সবুজ খেলার মাঠ হইতে কৈশোরের কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহার এ

বাড়ির ছোটছেলে অমূল্যের সহিত বিবাহ হয়। অমূল্যের বয়স তখন চব্বিশ। বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, খানিকটা জমিদারি আছে। তাহার উপর মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং তাহার স্বেচ্ছাচারী হইবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। সকাল হইতে সে কুস্তি, মুগুর, লাঠি লইয়া কাটাইয়া খান দশেক রুটি অথবা পরোটা খাইয়া বাহির হইত স্নানে। পথে সাহাদের দোকানে খানিকটা খাঁটি গিলিয়া স্নানান্তে বাটি ফিরিত বেলা দুইটায়। তারপর আহার ও নিদ্রা। সন্ধ্যায় আবার বাহির হইয়া ফিরিত বারোটায় অথবা আরও খানিকটা পরে, তখন সে আর বাড়ির দুয়ার খুঁজিয়া পাইত না। মা তাহার জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না, আজ ইহাকে প্রহার, কাল তাহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া, কোনদিন বা কাহারও গৃহে অনধিকার প্রবেশ প্রভৃতি নানা ধরণের বহু অভিযোগ। এই সময়েই প্রথম পক্ষ বিয়োগের পর খুঁজিয়া পাতিয়া এই সুন্দরী যমুনার সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সে যমুনাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কয়দিন পরই গেল গঙ্গাস্নান করিতে। সেখানে এক যাত্রিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার অপরাধে তাহার কয় বৎসর জেল হইয়া যায়। তারপর এই মাসখানেক পূর্বে অমূল্য বাড়ি ফিরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যমুনাকেও আনা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে সেদিন এজন্য চাটুজ্জে-বাড়ির মাথাটা লজ্জায় মাটিতে নত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে লজ্জা বেশ সহিয়া গিয়াছে; মাটিতে যে মাথা ঠেকিয়াছিল, সে মাথা আবার ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। এখন অমূল্যকে লইয়া শুধু অশান্তি আর আশঙ্কা। অশান্তি সহ্য হয়, কিন্তু আশঙ্কার উদ্বেগ অসহনীয়, পাছে সে আবার কিছু করিয়া বসে, এই আশঙ্কাতেই সকলে সারা হইয়া গেল। সকলে আশঙ্কা করিয়াই খালাস, কিন্তু সে আশঙ্কা নিবারণের দায়িত্ব ওই বধূটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই বধূটির প্রতি সতর্কবাণীর অন্ত নাই, অহরহ তাহাকে সকলে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যমুনা ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপে।

কুমারীশ রাত্রেও প্রতিমার গায়ে মাটি ধরাইতেছিল, তাহার ভাইপো যোগেশ হ্যারিকেনের লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কুমারীশ প্রতিমার গায়ে মাটি দিতে দিতেও ভাবিতেছিল ওই বধূটির কথা। মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, আর তাহার স্বামী কিনা এমন! সে এ বাড়িতে বহুদিন প্রতিমা গড়িতেছে, ওই ছোটবাবুকে সে ছোট ছেলেটি দেখিয়াছে। এইখানেই সে এমনই করিয়া প্রতিমাতে মাটি দিত, আর ছোট ছেলেটি বলিত, দেবে না মিস্ত্রী, দেবে না?

সে বলিত, দেব গো দেব।

কবে দেবে?

কাল।

না আজই দাও, ও মিস্ত্রী !

হ্যাঁ বাবু, এই ঠাকুরই তো তোমার, আবার কার্তিক দিয়ে কি হবে ?

না, আমায় কার্তিক গ'ড়ে দাও।

সে হাসিয়া বলিত, বাবু আমাদের ক্যাপা বাবু।

সেই ছেলে এমন হইয়া গেল! গেল গেল, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে—! মিস্ত্রীর চোখের সম্মুখে প্রতিমার মত মুখখানি যেন জলজ্বল করিতেছে। সে স্থির করিল, ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে হয়, সে তাহাকে বেশ করিয়া বলিবে।

যোগেশ বলিল, কাকা, রাত হ'ল অনেক, আজ আর থাকুক।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, থাকুক! কালও একবেলা এইখানেই কাটুক, না কি? বলি, প্রতিমে যে সাতাশখানা, তা মনে আছে?

যোগেশ ক্লান্তভাবে বলিল, তা হোক কেনে। ওই দেখ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে।

হাতের কাদার তালটা থপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কুমারীশ বলিল, ওই নে, ওই নে। মরগা যেয়ে তোরা, দেখে নিগে, বুঝে নিগে সব, আমি আর কিছু পারব না।

সে উঠিয়া আসিয়া বালতির জলে হাত ডুবাইয়া থলথল করিয়া ধুইতে আরম্ভ করিল।

অপ অপ, এ্যাও, অপ!

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিতেছিল, দৃপ্ত এবং উচ্চকণ্ঠে শাসন-বাক্য ধ্বনিত হইতেছে। কুমারীশ অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, তাই তো রে, চৌকিদারই বটে! উঃ, খুব বলেছিস বাবা! রাত অনেক হয়েছে রে! হুঁ, রাত একেবারে সনসন করছে! নে, একবার তামুক সাজ দেখি।

যোগেশ তামাক সাজিতে বসিল।

অপ অপ, কোন্ হ্যায়? এ্যাও উল্লুক!

কুমারীশ চমকিয়া উঠিল। লণ্ঠনের আলোতে সভয়ে দেখিল, অসুরের মত দৃঢ় শক্তিশালী এক জোয়ান সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখ দুইটা অস্থির, পা টলিতেছে, হাতের শক্ত বাঁশের লাঠিগাছটা মাটিতে ঠুকিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে, এ্যাও উল্লুক!

মুহূর্তে সে চিনিল, চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবাবু। কিন্তু তাহার সে মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, ছোটবাবু, পেণাম, ভাল আছেন?

লণ্ঠন, প্রতিমা, মাটি এবং কুমারীশকে একসঙ্গে দেখিয়া ছোটবাবুর মনে পড়িল। সে বলিল, মিস্তিরী, তুমি মিস্তিরী?

কৃতার্থ হইয়া কুমারীশ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কুমারীশ মিস্ত্রী।

লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া কুমারীশকে দেখিয়া বলিল, A sly fox met a hen!—Sly fox মানে খ্যাঁকশেয়ালী। মাটি দিচ্ছ, বেশ, মা জগদম্বা, মাগো মা!

মিস্ত্রী তাহাকে খুশি করিবার জন্যই আবার বলিল, শরীর ভাল আছে ছোটবাবু ?

শরীর, নশ্বর শরীর। Iron man—লোহার শরীর। দেখ, দেখ!—বলিয়া সে এবার তাহার ব্যায়ামপুষ্ট দৃঢ়পেশী একখানা হাত বাহির করিয়া মুঠি বাঁধিয়া আরও শক্ত করিয়া মিস্ত্রীর সম্মুখে ধরিল।

দেখ, টিপে দেখ।—অপ!

মিস্ত্রী সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অমূল্য নিজের হাতের লাঠিটা প্রসারিত হাতখানায় আঘাত করিয়া বলিল, টমটম চালা দেগা—টমটম। এই পেতে দিলাম হাত, চালিয়ে দাও টমটম।

কুমারীশ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে পুকুরটার পাড়ে বাঁশবনে বাতাসের বেগে বাঁশগুলি দুলিয়া পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া শব্দ তুলিতেছিল, ক্যাঁ ক্যাঁ—ক্যাঁট্‌ ক্যাট্‌। নানাপ্রকার শব্দ।

অমূল্য লাফ দিয়া হাঁকিয়া উঠিল, অপ! কোন্‌ হায়! এ্যাও!

বাঁশবনের শব্দ থামিল না, বায়ুপ্রবাহ তখনও সমানভাবে বহিতেছিল। অমূল্য হাতের লাঠিগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিল, ভূত।

মিস্ত্রী বলিল, আজ্ঞে না, বাঁশ।

আলবৎ ভূত, কিম্বা ছেনাল লোক ইসারা ক'রছে।

তারপর অত্যন্ত আস্তে সে বলিল, সব খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। সব চরিত্র খারাপ। ওই শালা যদো, যদো শালা বাঁশি বাজায়, শালা কেষ্ট হবে! শালা মারে ডাণ্ডা!

বাতাসের প্রবাহটা প্রবলতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের শব্দও বিচিত্রতর এবং উচ্চতর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। অমূল্য ক্ষিপ্ত হইয়া লাঠিখানা লইয়া সেই দিকে চলিল, অপ অপ অপ, আমাকে ভয় দেখাও শালা? শালা ভূত, আও আও, চলা আও—অপ।

মিস্ত্রী অবাক হইয়া অমূল্যকেই দেখিতেছিল। সহসা সে এক সময়, ঊর্দ্ধলোকে, বোধকরি দেবতার উদ্দেশেই দৃষ্টি তুলিতে গিয়া দেখিল, শূন্যলোকের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের দীর্ঘ ধারা ভাসিতেছে। সে দেখিল, সম্মুখেই চাটুজ্জে-বাড়ির কোঠার জানালায় আলো জ্বালিয়া জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছোটবধূটি। আলোকচ্ছটায় তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইবে সে খেয়াল বোধকরি তাহার ছিলনা। সে উপরে আলোক-শিখা জ্বালিয়া নীচে অমূল্যের সন্ধান করিতেছে। কুমারীশ বিষণ্ণ অথচ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বধূটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাঁশের বনে তখন অমূল্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অপ অপ—আও আও আও—আপ! বলিয়া হাঁক মারিতে মারিতে ঠকাঠক শব্দে বাঁশের উপর লাঠি দিয়া আঘাত আরম্ভ করিল।

যোগেশ আসিয়া কুমারীশের হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিল, চল, টানতে টানতেই চল বাপু। যে মশা, বাবা, এ যেন চাক ভেঙেছে! গা হাত পা ফুলে উঠল।

কুমারীশ চকিত হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগো বউমা, গিন্নীমাকে ডেকে দাও বরং, ও কি!

অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আলোটা সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জানালাটাও বন্ধ হইয়া গেল।

কুমারীশ বলিল, ওগো, ও ছোটবাবু, ও ছোটবাবু!

ছোটবাবুর কানে সে কথার শব্দ প্রবেশই করিল না, সে তখনও সমানে বাঁশবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

যমুনার জীবন নিজের কাছে যে কতখানি অসহনীয়—সে যমুনাই জানে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না। শরতের চঞ্চল চাঁদের মত তখনই তাহার মুখ মেঘে ঢাকিয়া যায়, আবার তখনই সে উজ্জ্বল চাঞ্চল্যে হাসিয়া উঠে।

কিন্তু কুমারীশ মিস্ত্রীর তাহার জন্য বেদনার সীমা রহিল না। সে মনে মনে 'হায় হায়' করিয়া সারা হইল। দিন বিশেক পরে প্রতিমাতে 'তু'মৃত্তিকা' অর্থাৎ তুষ-মাটীর উপরে কালো মাটি ও ন্যাকড়ার প্রলেপ লাগাইয়া, মুখ বসাইয়া, হাতে পায়ে আঙ্গুল জুড়িয়া মাটির কাজ করিবার জন্য কুমারীশ আসিয়া হাজির হইল। চাটুজ্জে-বাড়িতে তখন পূজার কাজ লইয়া ব্যস্ততার আর সীমা ছিল না। মুড়ি ভাজার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গেছে। পূজার কয়দিনের খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়া-দশমী ও একাদশীর দিনের খরচ একটা প্রকাণ্ড খরচ;—অন্তত পাঁচ শত লোক আসিয়া আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইবে। বড়বউ, বড় মেয়ে, মেজবউ প্রকাণ্ড বড় বড় ধামায় মুড়ি ভরিয়া ঘরের মধ্যে তুলিতেছে। মেজমেয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়িগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার তুলিয়া রাখিতেছে, নূতন মশলাপাতি ভাণ্ডারজাত হইবে। ছোটবধূটিকে পর্যন্ত কাজে লাগানো হইয়াছে। সে বারান্দার এককোণে বসিয়া সুপারি কাটিতেছে।

কুমারীশ প্রতিমার গায় লাগাইবার জন্য পুরানো কাপড়ের জন্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল, কই, গিন্নীমা গেলেন কোথায়? একি বিপদ দেখ দেখি! গিন্নীমা গেলেন কোথা গো? ও গিন্নীমা!

মুড়ির ধামাটা কাঁখে করিয়া যাইতে যাইতে বড়বউ বলিল, না বাপু, মিস্ত্রী দেখছি বাড়ি মাথায় ক'রলে! তোমার কি আস্তে কথা হয় না নাকি?

বড়মেয়ে বলিল, মিস্ত্রী আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে আসে কিনা, ঘোড়া দাঁড়ায় না।

কুমারীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুণ বলেছেন বেশ! ওটা আমার অভ্যেস। আমার শাশুড়ি কি ব'লত জানেন? ব'লত, কুমারীশকে নিয়ে পরামর্শ করা বিপদ, পরামর্শ করবে তো লোকে মনে ক'রবে, কুমারীশ আমার ঝগড়া করছে।

বড়বউ অল্প হাসিয়া বলিল, তা যেন হ'ল। এখন কি চাই বল দেখি তোমার?

পাচিকা পাঁচুদাসী বলিল, চেঁচিয়ে, গাঁ মাথায় করে কুমারীশ।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া গেল। তোমার. ঠাকুরুণ, বড় ট্যাকটেকে কথা! না চেঁচালে এ বাড়িতে জিনিস পাওয়া যায়? পুরানো কাপড় চাই, তা ঠাকরুণরা জানে না নাকি? আমার তো বাপু, এক জায়গায় ব'সে হাঁড়ি ঠেলা নয়! সাতাশখানা—

বাধা দিয়া বড় বউ বলিল, সব ঠিক ক'রে. রেখেছি বাবা, গোছানো পাট করা সব ঠিক হ'য়ে আছে।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কাকেই বা বলি! ও ছোটবউ, দাও তো ভাই, ওই কাঠের সিন্দুকের ওপর ভাঁজ করা আছে এক পুঁটলি কাপড়।

কুমারীশ তাড়াতাড়ি বড়বধূর নিকট আসিয়া চুপি চুপি কহিল, বড়বউমা, আমাদের ছোটবাবু এখনও তেমনই রাত ক'রে আসে?

বড়বধূ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই অর্ধপথে সে নীরব হইয়া গেল।

বড়বধূ বলিল, কেন বল তো?

এই—না, বলি, ঘরথাই হ'ল নাকি, মানে, ছোটবউমা আমাদের সোনার পুতুল। আহা মা, চোখে জল আসে আমার।

বড়বউ চুপি চুপিই বলিল, আমাকে যা বললে বেশ ক'রলে, কিন্তু ও কথা আর কাউকে শুধিও না মিস্ত্রী। মা শুনলে রাগ ক'রবেন, ছোটবাবু শুনলে তো রক্ষে থাকবে না।—বলিয়াই সে খালি ধামাটা সেইখানেই নামাইয়া নিজেই কাপড় আনিতে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে ছোটবউই কাপড়ের পুঁটলিটা বাহির করিয়া আনিয়া দাঁড়াইল। বড়বউ তাহার হাত হইতে পুঁটলিটা লইয়া কুমারীশের হাতে দিয়া বলিল, আর যদি লাগে তোমার কাছে এসে [illegible]টবে, আমরা আর দিতে টিতে পারব না।

ছোটবউ মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে মেজদিদির মত একটা হাতী গ'ড়ে দিতে বল [illegible]দি!

কুমারীশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে তো আমি দিয়েছি মেজদিদিমণিকে। দেব, দেব, দুটো হাতী গ'ড়ে এনে দেব। হাতীর ওপর মাহুত সুদ্ধ।

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ঘরের ভেতর যাও। কুমারীশ, যাও বাবা, কাপড় তো পেলে, এইবার যাও।

কুমারীশ কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন ছেলের দল এমন ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে যে, যোগেশ এবং আর একজন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কে একজন মহিষের মুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া পলাইয়াছে। কুমারীশ পিছন হইতে বলিল. মাটি ক'রলে রে বাবা, মাটি ক'রলে। কই কই বিবকাদা কই, দে দে, সব লাগিয়ে দে। ধর ধর, যোগেশ, ধর সব।

বিষকাদাকে ছেলেদের বড় ভয়, বিষকাদা গায়ে লাগিলে নাকি ঘা হয়। আর যে বিশ্রী গন্ধ! ছেলের দল ছুটিয়া সরিয়া গেল। কুমারীশ একটা মোটা তুলিতে গোবর ও মাটির তরল গোলা তুলিয়া ছিটাইতে ছিটাইতে বলিল, পালা সব, পালা এখন। সেই হ'য়ে গেলে আসবি সব।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার একটি দুইটি করিয়া জমিতে আরম্ভ করিল।

কুমারীশ একজনকে বলিল, কই, তামুক আন দেখি খানিক।

রাত্রে জানালার উপর আলোটি রাখিয়া যমুনা একা বসিয়া ছিল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। পূজার কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একা ঘরে যমুনার শুইতে বড় ভয় করে। অমূল্য মদ খাইয়া ভীষণ মূর্তিতে আসিলেও সে আশ্বস্ত হয়, মানুষের সাহস পাইয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। অমূল্যের অত্যাচার প্রায় তাহার সহিয়া আসিয়াছে। অমূল্যের প্রহারের চেয়ে আদরকে তাহার প্রথম প্রথম বেশি ভয় হইত, সেও তাহার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম দিকের এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার ভয়ের আর অন্ত থাকে না। কেবল মনে হয়, যদি ভূত আসে! ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া প্রাণপণে চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া থাকে, ঘরের মধ্যে আলোটা দপদপ করিয়া জ্বালিয়া দেয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপে মিস্ত্রীরা প্রতিমা গড়িতেছে, খানিকটা দূরেও জাগ্রত মানুষের আশ্বাসে সে জানালা খুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লাগিতেছেও বেশ। উহারা গুজগুজ করিয়া কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে, একজন ছোট মিস্ত্রী কাঠের পিঁড়ার উপর মাটি নেচি দ্রুত পাক দিয়া লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলি গড়িতেছে, একজন ছাঁচে ফেলিয়া মাটির গয়না গড়িতেছে, আর কুমারীশ প্রতিমার মুখগুলি গড়িতেছে। বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রূ চোখ মাটির তালের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহার পর মুখের উপর গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া মাজিবে। যমুনা ছেলেবেলায় কত দেখিয়াছে। সিমেন্ট করা মেজের মত পালিশ হইবে।

বউমা, জেগে রয়েছেন মা।

যমুনা চকিত হইয়া উঠিল. মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নিজেই একটু জিভ কাটিল, মিস্ত্রী দেখিয়া ফেলিয়াছে!

আমি খুব ভাল হাতী গ'ড়ে এনে দেব এক জোড়া। দুটো মাটির বেরাকেটও এনে দেব। তারই ওপর রেখে দেবেন।

যমুনা সসংকোচে আবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল, ব্র্যাকেট দুটোর নীচে দুটো পরী গ'ড়ে দিও। যেন তারাই মাথায় ক'রে ধ'রে আছে।

কুমারীশ বলিল, না, দুটো পাখি ক'রে দেব? পাখি উড়ছে, তারই পাখার ওপর বেরাকেট থাকবে।

যমুনা ভাবিতে বসিল, কোন্‌টা ভাল হইবে।

কুমারীশও নীরবে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরেই আবার সে বলিল, আর দুটো ঘোড়াও গ'ড়ে এনে দেব বউমা।

যমুনা পুলকিত হইয়া বলিল, না, তার চেয়ে বরং দুটো চিংড়িমাছ গ'ড়ে দিও।

এবার সে ঘোমটাটা সরাইয়া ফেলিল। যে গরম!

চিংড়ি-মাছ? আচ্ছা, ঘোড়াও আনব, চিংড়ি-মাছও আনব। কিন্তু শিরোপা দিতে হবে মা।

যমুনার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি দুটো হাতীই এনে দিও শুধু।

কেন মা, শিরোপার কথা শুনে ভয় পেলে নাকি! সব এনে দেব মা, একখানি তোমার পুরানো কাপড় দিও শুধু। আর কিছু লাগবে না।

অন্ধকার নিশুতি রাত্রে ধীরে ধীরে ভীত তরুণী বধূটির সহিত মিস্ত্রির এক সহৃদয় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতেছিল—ওই দেবী-প্রতিমাটির মতই।

অপ অপ, চ'লে আও, বাপকো বেটা হোয় তো চ'লে আও!

অমূল্য আসিতেছে। ভীত হইয়া মিস্ত্রী উপরের দিকে চাহিয়া বধূটিকে সাবধান করিতে গিয়া দেখিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে আপন মনে কাজ করিতে বসিল।

এ্যাই মিস্ত্রী!

ছোটবাবু, পেণাম!

ওই শালা রমনা, শালা পেসিডেনবাবু হইছে, শালা! শালা মারব এক ঘঁ শালা ট্যাক্সো লিবে! শালা ফিষ্টি ক'রে খাচ্ছে পাঁঠা মাছ পোলাও, শালা! হাম দেখ লেঙ্গে!

কুমারীশ চুপ করিয়া রহিল।

আজ সটান বাড়ির দরজায় গিয়া অমূল্য বন্ধ দ্বারে লাথি মারিয়া ডাকিল, এ্যাও কোন হ্যায়? খোল কেয়াড়ি!

কিছুক্ষণ পরই যমুনার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। অমূল্য মারে এবং শাসন করে, চোপ, চোপ বলছি, চোপ!

পূজার দিন চারেক পূর্বে কুমারীশ আবার আসিয়া প্রতিমায় রং লাগাইয়া দিয়া গেল। যমুনার আনন্দের আর সীমা রহিল না; কুমারীশ একটা প্রকাণ্ড ডালায়

করিয়া ব্র্যাকেট, হাতী, ঘোড়া, চিংড়িমাছ, একজোড়া টিয়া পাখি পর্যন্ত আনিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে।

মা কিন্তু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, অমূল্যকে না ব'লে এই সব কেন বাপু! তা এখন দাম কি নেবে বল?

কুমারীশ পুলকিত হইয়া বলিল, দাম! এর আবার দাম লাগে নাকি মা! দেখুন দেখি! আমারও তো বউমা উনি।

বড়মেয়ে হাসিয়া বলিল, সুন্দর মানুষকেই সবাই সব দেয়, আমরা কালো মানুষ—

কুমারীশ প্রচণ্ড কলরব করিয়া উঠিল, আপনাকেও এনে দেব দিদিমণি। দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, আপনি হ'লেন বড়দিদি!

সে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

মা আবার বলিলেন, অমূল্যকে ব'ল না যেন বউমা। যে মানুষ!

রাত্রে সেদিনও যমুনা জানালায় বসিয়া মিস্ত্রীকে বলিল, ভারি সুন্দর হয়েছে মিস্ত্রী! ভারি সুন্দর!

উচ্ছ্বসিত কুমারীশ বলিল, পছন্দ হয়েছে মা!

যমুনা পুলকিত মুখে আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব, খুব পছন্দ হয়েছে। হাতী দুটো মেজদির চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।

তুমি একটু ব'স মা, আমি চক্ষুদানটা ক'রে আসি। লক্ষ্মীর হয়েছে, সরস্বতীর হয়েছে, এইবার ঠাকরুণের চোখ মা।

যমুনা ওই স্থানটির দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

এ্যাও, কোন্ হ্যায়? চুরি—চুরি করেগা? ছেনালি করেগা! শালা মারেগা ডাণ্ডা! অপ অপ!

কোন কল্পিত ব্যক্তিকে শাসন করিতে করিতে আজ একটু সকালেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যমুনা তাহাকে খেলনাগুলি না দেখাইয়া পারিল না। তাহার অন্তরও ছিল পুলকিত, তাহার উপর আজ অমূল্য আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইল। যমুনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডালার কাপড়খানা খুলিয়া তাহাকে পুতুলগুলি দেখাইয়া বলিল, কেমন বল দেখি? খুব সুন্দর নয়?

চিংড়ি-মাছটা তুলিয়া ধরিয়া অমূল্য বলিল, গলদা চিংড়ি হ্যায়, মারেগা কামড়!

যমুনা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘোড়াটা দেখিয়া অমূল্য বলিল, কেয়াবাৎ রে পক্ষীরাজ—চিঁহিহি!

যমুনা বলিল, মিস্ত্রী আমাকে এনে দিয়েছে।

মিস্তিরী—sly fox—ওই খ্যাকশেয়ালী? এ্যাই মিস্তিরী!—সঙ্গে সঙ্গে সে জানালাটা খুলিয়া বলিল, গুড ম্যান, The sly fox is a good man, আচ্ছা আদমি।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া যমুনাকে কাছে টানিয়া লইল।

* * * *

লজ্জায় আক্ষেপে আশঙ্কায় মায়ের অবস্থাটা হইল অবর্ণনীয়। দারুণ লজ্জায় চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত প্রতিবেশীদের সম্মুখে আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। কোনরূপে দেবকার্য শেষ করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাঁচিলেন; কিন্তু বাড়িতেও তখন মৃদু গুঞ্জনে ঐ আলোচনাই চলিতেছিল। বড়মেয়ে গালে হাত দিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া [illegible]তেছিল, বড়বউ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

মা জোড়হাত করিয়া বলিলেন, তোমাদের পায়ে পড়ি মা, ওকথা আর [illegible] না। ছি ছি ছি রে আমার কপাল!

বড়বউ বলিল, আমরা চুপ ক'রলে আর কি হবে মা, পাড়াপড়সী তো গা টেপাটিপি করছে!

বড়মেয়ে বলিল, মেয়েমানুষের যার রূপ থাকে, তাকে একটু সাবধানে থাকতেও হয়, বাড়ির গিন্নীকেও সাবধান রাখতে হয়। রামায়ণ পড়, মহাভারত পড়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, দোহাই মা, চুপ কর, তোমাদের পায়ে ধরছি। [illegible] শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছোটবধূটি তখন উপরে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া [illegible] ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মিথ্যা তো নয়, দেবী প্রতিমার মুখে যে তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব!

মেয়ে-মহলে সেই কথারই আলোচনা চলিতেছে। প্রতিচ্ছবি এত সুস্পষ্ট যে, কাহারও চোখ এড়ায় নাই।

দেবতার কাছে অপরাধ, মানুষের কাছে অপরাধ, অপরাধের বোঝা যমুনার মাথায় পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর তাহার স্বামী! ভয়ে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু যমুনার ভাগ্য ভাল যে, অমূল্য পূজার কয়দিন বাড়িমুখোই হইল না। গ্রামে পূজো-বাড়িগুলির বলিদানের খবরদারি করিতেই তাহার কাটিয়া গেল। হাড়িকাটে পাঁঠা লাগাইলে সে ঘাড়টা সোজা করিয়া দেয়, খানিকটা ঘি ডলিয়া একটা থাপ্পড় মারিয়া বলে, লাগাও—অপ!

বলিদান হইলে ঢাকী ও ঢুলীদের মধ্যে লাঠি লইয়া পাঁয়তাড়া নাচ নাচে। রাত্রে কোন দিন লোকজনে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কোন দিন কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিকানা কেহ জানিতে পারে না।

বিজয়া-দশমীর দিন কিন্তু কথাটা তাহার কানে উঠিল। কানে উঠিল নয়, সে সেদিন স্বচক্ষেই দেখিল। গ্রামেও সেদিন এই আলোচনাটা ওই ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মতই প্রবল হইয়া উঠিল।

চাটুজ্জে-বাড়ির বাউড়ী ঝি মাঝপথ হইতেই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মা, দাদাবাবু আজ ক্ষেপে গেইছে! লাঠি নিয়ে সে যা করছে আর বলছে, 'আমার বউয়ের মত এ্যা—', আর 'অপ অপ' করছে।

বাড়িসুদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। অমূল্যের এই কয়দিনের অনুপস্থিতিতে ও চৈতন্যহীনতার অবকাশে যমুনা খানিকটা সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার সেই আতঙ্কের আকস্মিক আগমন সম্ভাবনায় সে দিশাহারার মত খুঁজিতেছিল—পরিত্রাণের পথ। তাহার উপর সমস্ত গ্রামটা নাকি তাহার কথা লইয়া মুখর! এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? আপনার ঘরে সে লুকাইয়া গিয়া বসিল দুইটা বাক্সের আড়ালের মধ্যে। নীচে বাড়ির মধ্যে ওই আলোচনাই চলিতেছে। পা[illegible]র বাড়িতেও ওই কথা। খোলা জানালাটা দিয়া যমুনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, ছি ছি ছি!

কিছুক্ষণ পরই অমূল্য ফিরিল নাচিতে নাচিতে। অপ অপ! মা [illegible]ই, মা, পেনাম করি, আচ্ছা বউ করেছ মা, ফাষ্ট, চাকলার মধ্যে ফাষ্ট! দুগ্‌গা-মায়ের ম[illegible]এক বউয়ের মত মা! দুগ্‌গা-প্রতিমে! এ্যাই ছোটবউ, এ্যাই! কই ছোটবউ!

কিন্তু কোথায় ছোটবউ? সমস্ত বাড়ির মধ্যে ছোটবউয়ে[illegible] সন্ধান মিলিল না। সমস্ত রাত্রি অমূল্য পাগলের মত চীৎকার করিয়া ফিরিল।

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে পূজার খরচের জন্য রাজ্যের লোক আসিয়া জমিতেছিল। সকলে বৃত্তি পাইবে। নানা বৃত্তি—কাপড়, পিলসুজ, ঘড়া, গাম[illegible], পূজার যত কিছু সামগ্রী মায় নৈবেদ্য পর্যন্ত বৃত্তি বিলি হইবে। কুমারীশও এই গ্রামের মুখে আসিতেছিল, তাহারও পাওনা অনেক। পরণে তাহার নূতন লালপেড়ে কোরা কাপড়, গলায় কোরা চাদর, বগলে ছাতা, হাতে একটা পুঁটুলিতে বাঁধা কয়টি মাটির পতুল ও খেলনা। সে হন হন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা-বাহকেরা জল হইতে দেবী-প্রতিমার খড়ের ঠাট তুলিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে নামাইয়া দিয়া বিদায়ের জন্য দাঁড়াইল। তাহারা চাহিল, মা, বেসজ্জনের বিদেয় আমাদের মুড়কি নাড়ু!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ঝিটা দেখিল, বাড়ির খিড়কির ঘাটেই যমুনার দেহ ভাসিতেছে। তাড়াতাড়ি তোলা হইল—বিবর্ণ শবদেহ। অমূল্য আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কুমারীশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া গেল।

...আগুন হ'য়ে উঠেছিল।

...মার একটু

সিংহাসন
ও
প্রেতিনী

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রবোধকুমার সান্যাল—জন্ম ১৯০৭ কলকাতা। আদি পৈতৃক বাস ফরিদপুর। শিক্ষা, কলকাতায় স্কটিশচার্চ স্কুলে ও সিটি কলেজে। প্রবোধকুমার সমাজ ও সংসারের চিরাচরিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নীতির বিরুদ্ধে আবাল্য বিদ্রোহী। ফলে আত্মীয়বন্ধু থেকে অনেক আঘাত, উপেক্ষা অবহেলা সহ্য করেছেন। অনেক দুঃখকষ্ট ও দুর্দিনের মধ্যে এঁর প্রথম জীবন কাটে। স্বাধীনচিত্ত কিশোর প্রবোধকুমার স্বীয় সম্পাদনায় একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে নিজের হাতে পথে পথে ফিরি করেছেন। আশৈশব দুঃসাহসী বালক প্রবোধকুমার সমুদ্রপথে সুদূর আমেরিকা যাত্রা ক'রে বর্মা-পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। ইনি একজন পাকা ভ্রমণকারী। একাধিকবার সমুদ্রযাত্রা ও তিনবার সমগ্র ভারতবর্ষ ও নেপাল পরিভ্রমণ করেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে নানা কাজে ও কারণে বিপর্যস্ত হন। দুর্গম দেশে নানা দুর্যোগে দুঃসাহসিক কাজে, অরণ্যশিকার ও পার্বত্য অভিযানে, সকল রকম ব্যায়াম, খেলাধুলা, নৌকাচালনা ও বন্দুক ব্যবহারে ইনি আবাল্য অগ্রণী। একদা ভারত সরকারের অধীনে সীমান্ত সৈন্যবিভাগে চাকরি করেছেন। হুগলী ডাকবিভাগে সহকারী পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা "স্বদেশ" ও "বিজলী" এঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় –১৩৩৭ সালে। কল্লোলের সঙ্গে গোড়া থেকেই সংলিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে 'যুগান্তর' পত্রিকায় সাহিত্যবিভাগে সম্পাদনা করেন।

প্রবোধকুমারের সাহিত্য আপন পটভূমিকার মাধ্যা বৈচিত্রে ভরা। নানা ধরণের চরিত্র সৃজনে এঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। এঁর কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস— প্রিয় বান্ধবী, হাগতম্, অরণ্যপথ, তরুণী সঙ্ঘ। গল্প—নিশিপদ্ম, কলরব, অঙ্গরাগ, অবিকল। ভ্রমণ—মহাপ্রস্থানের পথে, দেশদেশান্তরে।

ঐ সমস্তই তোমার ?—মিস্টারের চোখ দুটো আগুন হ'য়ে উঠেছিল।

না, সব আমার নয়। মহেশবাবুদের কিছু কিছু আছে।

তুমি অন্যের কাজ ক'রবে, অন্যের বাজার ক'রে আনবে, কি সর্তে? তোমার একটু অপমান-বোধ নেই ?

নরেন ধীরে ধীরে বললে,—এতে অন্যায় মনে হয়নি।

তা মনে হবে কেন ? ভগবান তোমায় গণ্ডারের চামড়া দিয়েছে সে কি এতসহজে বেঁধে ?

এমন সময় উপরের সিঁড়ি থেকে ললিতার স্পষ্ট গলার আওয়াজ এল—নরেনবাবু, শিগ্‌গির চান্ ক'রে আসুন, আপনার আপিসের যে বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।

ললিতা গলা বাড়িয়ে ছিল, তিনজনেই একবার চোখোচোখি হ'ল: ললিতা তাড়াতাড়ি ভিতরে চ'লে' গেল।

মিস্টারের রাগ কেমন জানি একটু শান্ত হ'য়ে এলো। বল্‌ল—আজকাল বুঝি ওপরে ওঁদের কাছেই খাওয়া হয় ? আমার রান্নাঘর বয়কট্ ক'রলে ক'বে থেকে ?

ওঁরা যেদিন থেকে এসেছেন সেদিন থেকেই আমি—

আই সী। আমি তো আর তোমার খবর-টবর রাখি না, কেমন ক'রে জান্‌ব বলো! অল্ রাইট্!

মিস্টার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

বিকেল বেলা ফিরে এসে মিস্টার আবার চেয়ারে বসলো। বয় এসে টেবিলের উপর চা ও খাবার রেখে দরজার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তার হুঁস-ই নেই। হাত পা ধোবার গরম জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। কলার, নেকটাইটা অন্তত ইতিমধ্যে খুলে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু সে গ্রাহ্যই ক'র্‌ল না।

অনেকক্ষণ পরে সে উঠ্‌ল, বাইরে এল, বাথরুমের পাশে যে ছোট অন্ধকার ঘরটি,—ওই ঘরটিতেই নরেন কায়ক্লেশে রাত কাটায়—মিস্টার সেই ঘরটির মধ্যে এসে দাঁড়ালো। কেন ? কেন তা সে নিজেই জানে না। দেখ্‌ল ঘরের মধ্যে ভাঙা একটি আধখোলা টিনের বাক্স, একখানি অল্পদামের পুরোনো বিলাতী কম্বল, বালিশের বদলে কয়েকখানি খবরের কাগজ রোলার ক'রে একটি ফালি দিয়ে বাঁধা, সামান্য কিছু লেখার সরঞ্জাম—এ-ছাড়া ঘরটির মধ্যে আর কিছুই নেই। দারিদ্রের চিহ্ন ঠিক নয়—একটি অখণ্ড রিক্ততা।

আজ সমস্ত দিন ধরে একটি অতৃপ্তি তার সারা দেহের কোনে কোনে বাসা বেঁধেছিল। অনুক্ষণ রি রি ক'রে শরীরে যেন জ্বালা ধরেছে। এই যার গৃহসজ্জা, এমনি যার জীবন যাত্রা, অর্বাচীন অপোগণ্ড ওই কালো ছেলেটার জন্যে এই গৃহস্থটির এত মাথা ব্যথা ? যার কোনো পরিচয় নেই, আভিজাত্য নেই, জীবনে যার কোনো শৃঙ্খলাই নেই, এই বিদেশে যে একমুঠো অন্নের কাঙাল—সেই হ'ল এত বড় ক্ষমতার অধিকারী ?

মিস্টার নিজের ঘরে এসে বসলো। কিন্তু ব'সে থাকতে সে পারলো না। চাবুক মেরে কে যেন তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল। তার অহংকারে কে যেন প্রচণ্ড আঘাত করেছে।

নীচে নেমে সে রাস্তায় এল। তার নিজের ছোট মোটরখানি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আজ প্রথম সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে হাঁটতে সুরু ক'রল। হেঁটে হেঁটে আজ সে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলবে। আজ সে শুধু আহত হয়নি, ক্ষুব্ধ হয় নি, আজ সে নিতান্তই বিপন্ন। তার আত্মসম্মান পর্যন্ত আজ বিপদগ্রস্ত।

রেলের পুল্ পার হ'ল, বাবুল্‌নাথের মন্দির ছাড়ালো, কয়েকটা বড় বড় হোটেল পিছনে রইল— সে এল সোজা একেবারে সমুদ্রের তীরে। এদিকটা বন্দর নয়, বেড়াবার জায়গা, বাঁ দিকে বহুদূরে ডক্‌গুলি দেখা যাচ্ছে --জাহাজে ডিউটিতে যাবার তার আর বিশেষ দেরি নেই— দিন ফুরিয়ে এসেছে।

সমুদ্রের তীর বহুদূর পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি হ'য়ে ঘুরে গেছে। অপরাহ্ণ শেষ হয়েছে। দিক-চক্ররেখাহীন মহাসমুদ্র চারিদিকে থৈ থৈ করছে। ঢেউগুলি একটু মন্থর। ফিকেসবুজ আর সোনালী আলোয় মেশানো ছলছলে জল। আকাশটা ঠিক নীল নয়, একটু ঝাপ্‌সা,— সূর্যের কয়েকটা রাঙা রশ্মি আকাশের বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ঝড়ো হাওয়া বইছে হু হু ক'রে।

সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে বহুসংখ্যক বেঞ্চি সাজানো। মেয়ে, পুরুষ, বোম্বাই, মারহাট্টি, গুজরাটি, তৈলঙ্গী, পার্শী—বহু জাতের অগণন নরনারী জটলা ক'রে ব'সে রয়েছে। ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে মিস্টার তাদের ভিতর দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

এই যে, আপনি কতক্ষণ ?—রায় বাহাদুর নমস্কার ক'রে সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মিস্টার বল্‌ল—এই মিনিট কয়েক। একটু ঘুরতে এসেছিলাম এইদিকে।

নরেন আর আত্মগোপন ক'রতে পারলো না। একটু সরে যেতেই ললিতা ও তার মা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহেশবাবু বললেন—ভাল ক'রে আপনার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি সেদিন। নরেন আপনার প্রশংসা করছিল!

মিস্টার বল্‌ল—ভুলেই গেছি, সামাজিক আলাপ পরিচয় ওসব আর আসেনা। চিরকালের জন্যেই দলছাড়া। নরেনের দিকে সে একবার তাকালো। মেয়েরা তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন।

আচ্ছা, আসি এখনকার মতন—ব'লে মিস্টার একটি প্রতিনমস্কার ক'রে তৎক্ষণাৎ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ভয়চকিত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে নরেনের কানদুটো তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে!

সে রাত্রে সহজে মিস্টারের চোখে ঘুম এল না। তার জীবনটা সত্যিই অদ্ভুত। তার কোনো

সমাজ নেই, ধর্ম নেই, শিকড় নেই, আত্মীয় স্বজন পরিজন কোথাও কিছু নেই,—বিদেশে বিভূঁয়ে নির্বান্ধব অবস্থায় এতগুলি বছর তাকে কাটাতে হয়েছে। তাকে কেউ ভালোও বাসেনি, ঘৃণাও করেনি; কাছেও টেনে নেয়নি; তাচ্ছিল্যও করেনি, তার জীবন সুখকরও নয়, দুর্বহও হ'য়ে ওঠেনি। সমস্ত বয়সটা খুঁজ্‌লে একটিমাত্র নারীর আস্বাদও নেই, একটিমাত্র পুরুষের বন্ধুত্বও নেই। নিজে সে ছন্নছাড়া নয়, কিন্তু কোথাও কোনো শৃঙ্খলাও নেই। নিজেকে চির নির্বাসন দিয়েই তার দিন কেটেছে। সে ভবঘুরে নয়, কিন্তু সংসারচ্যুত!

আলোটা জ্বলছিল, সেই দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগ্‌লো তার মুখের চেহারাটা কেমন! তার কি কোনো আকর্ষণ নেই, সে কি কারো মোহ আনতে পারে না? এই পৃথিবীর দিকে দিকে যে স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মোহ-ভালবাসার শোভাযাত্রা চলেছে—এর মধ্যে তার কি কোনো স্থানই নেই?

আস্তে আস্তে সে উঠ্‌ল, ঘর থেকে অনভ্যস্ত নগ্নপদে সে বাইরে এল, বারান্দায় এসে দেখ্‌ল, নরেনের ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। এত রাতে তার ঘরে আলো? এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বল্‌ল— কি হচ্ছে হে এত রাতে?

হাতের বইটা বন্ধ ক'রে নরেন বল্‌ল—এই একটু পড়ছিলাম। কিছু বলছেন?

মিস্টার বল্‌ল—না, এমনি দেখতে এলাম। এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকো কেন?

নরেন উঠে বস্‌লো—এইবার শোবো।

মিস্টার বল্‌ল—তোমার কাজকর্মে একটু অবহেলা এসেছে দেখতে পাচ্ছি, কেন বলো তো? এসব ভালো নয়—বুঝ্‌লে? যাকে পরিশ্রম ক'রে খেতে হয়, তার পক্ষে ভদ্রতা সৌজন্য রাখা অচল। ওঁদের নিয়ে তোমার নেশা ধরেছে, ওঁরা যখন চ'লে যাবেন তখন তোমার সকল কাজে অনিচ্ছা এসে যাবে। সমস্ত উৎসাহ তোমার ফুরোবে।

নরেন একটু মৃদু প্রতিবাদ ক'রে বল্‌ল—তা তো নয়, আমি—

তাই, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওঁদের সঙ্গে থাকা, খাওয়া, ওঁদের নিয়ে বেড়ানো, ওঁদের কথা আলোচনা করা—এ মাখামাখির ফলাফল বড় খারাপ। ওঁরা বড়লোক, ওদিক দিয়েও তোমার বিশেষ সুবিধে হবে না। এই আমি শেষ কথা ব'লে রাখলাম! আমার হাতে থাকতে গেলে তোমাকে ওঁদের ত্যাগ ক'রতে হবে।

শেষের দিকটায় গলার আওয়াজে জোর দিয়ে মিস্টার আবার চ'লে গেল।

বিছানায় শুয়ে সে সত্যই আনন্দ বোধ ক'রল। রায় বাহাদুরের পরিবার থেকে সে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনতে পেরেছে—এই তার পরম তৃপ্তি। সে-রাত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে ঘুমুতে পেরেছিল।

দিন তিনেক বাদে সেদিন দুপুর বেলা সে কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এসে শুন্‌লো নরেন আজ কাজে বেরোয়নি।

কেন ?

আর্‌দালিটা বল্‌ল—সকাল বেলা তিনি ওপরে উঠেছেন, এখনও নামেননি।

রাগে একেবারে মিস্টার অন্ধকার দেখ্‌ল। কাজে যদি নরেন কামাই করে, লজ্জা যে তারই। কর্মঠ, তৎপর এবং নিয়মানুবর্তী ব'লে সে যে নরেনের সম্বন্ধে পরিচয়-পত্র দিয়েছে। তার সম্মান বজায় থাকবে কেমন ক'রে ?

বোলাও উস্‌কো।

আর্‌দালি ছুটলো। কিন্তু মিনিট কয়েক পরে এসে জানালো, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

জামা-কাপড় না ছেড়ে মিস্টার নিজেই গেলো। হন্‌ হন্‌ ক'রে ওপরে উঠে গিয়ে ডাক্‌ল—মহেশবাবু ?

বার-দুই ডাকবার পর দরজাটা খুলে গেলো। ললিতা বেরিয়ে এসে বল্‌ল—মহেশবাবু নেই।

নেই ? দরকার ছিল যে !

দরকার ছিল বল্‌লেই কি তাঁকে থাকতে হবে ?

তা নয়—মিস্টার বল্‌ল—আমি শুধু দরকারের কথাটা বলছি।

গোপনীয় বা লজ্জাকর যদি না হয় আমাকে বলুন।

মেয়েটির কণ্ঠে সে কী দৃঢ়তা! মিস্টারের রাগ যেন উবে গেল।

সোজা হ'য়ে মিস্টার বল্‌ল—নরেন কোথায় ? এখানে আছে ?

কি দরকার তাকে বলুন ?

কি দরকার সেটা আপনার কাছে না বল্‌লেও চলবে। তার এত বড় স্পর্দা, এতখানি সাহস কবে থেকে হ'ল যে, সে আমাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসে এখানে আড্ডা দেয় ? ডাকুন তাকে।

ললিতা দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌ল, আপনারা কতো ক'রে তাকে মাইনে দেন্‌ ?

মাইনে ? সে কী এমন কাজের লোক যে মাইনে পাবে ? কী তার কাজের দাম যে—

ললিতা বল্‌ল—তবে যান্‌, রেখে দিন্‌গে আপনার চাকরি, সে ক'রবে না—তার হ'য়ে আমিই জবাব দিচ্ছি। যান্‌, কি হবে তার কাছে এ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে। যে কাজের কোনো দাম নেই, সে কাজ সে আর ক'রবে না।

মুখের উপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ললিতা ভিতরে চ'লে গেল।

অপমান! তা অপমান বৈ আর কি। কিন্তু মিস্টার যে সৃষ্টিছাড়া নিয়মের মানুষ! তাকে যে আঘাত ক'রবে, আহত ক'রবে, তাকে যে মুখের উপর অপ্রতিভ ক'রবে, মিস্টার মনে মনে তাকেই গ্রাহ্য করে, শ্রদ্ধা করে—তার প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ বেড়ে যায়। ললিতা ভিতরে চ'লে গেল কিন্তু তার অপরূপ রূপের মাধুর্যটুকু সে যেন মিস্টারের চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

মিস্টার যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল তখন তার মুখে অল্প অল্প একটু হাসি লেগে রয়েছে।

তারপর এ গল্পের আর একটিমাত্র অধ্যায় বাকি। তুনিয়ার নানা ঘাটে ঘুরে মিস্টার অনেক দেখেছিল—এ হচ্ছে তার অভিজ্ঞানের শেষ পরিচ্ছেদ।

আজ সন্ধ্যায় তার যাত্রার দিন, এবার আবার অনেক দিনের জন্য তাকে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজে তার ডিউটি পড়েছে।

তুপুর পার হ'য়ে অপরাহ্নে গড়িয়েছে। সাজসজ্জা তার হ'য়ে গেছে—এবার শুধু নরেনের অপেক্ষা। নরেনকে সে ভাল চোখে দেখতে পারে না, তাকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, জনসমাজে তার অবস্থার দৈন্যকে ব্যঙ্গোক্তি করে—কিন্তু যাবার সময় এই ঘর-দোর, জিনিসপত্র যথাসর্বস্ব—সমস্ত কিছুর দায়িত্ব তার উপর সে দিয়ে যাবে। নরেনকে বিশ্বাস না ক'রে গেলে তার চলে না।

আফিস থেকে ফিরতে নরেনের তখনও একটুখানি বিলম্ব আছে। মিস্টার শিস্ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নরেনের ঘর খোলা, ঘরে সে চাবি বন্ধ করে না। মিস্টার একবার ঢুকলো। গত রাত্রের জীর্ণ বিছানাটি তখনও ছড়ানো রয়েছে, আজ নানা কাজের জন্য চাকরটা তার ঘরে ঢোকেনি। মিস্টার পায়ের জুতোর কোণ দিয়ে বিছানাটাকে একপাশে সরিয়ে দিল। এটা তার চরিত্রের জঘন্যতা নয়—এ হচ্ছে তার অভ্যাস। বালিশটা যখন ছিট্‌কে এক পাশে গিয়ে পড়লো, তার তলা থেকে বেরোলো একখানা চিঠি। গোলাপী রঙের কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। মিস্টার সেখানি হাতে ক'রে তুলে নিলো।

অন্যের পত্র পড়া তার কোনোদিনই অভ্যাস নয় কিন্তু নরেনের সম্বন্ধে এ নিয়ম পালন ক'রে চলা তার পক্ষে অসম্ভব।

বাংলা ভাষা সে ভালো প'ড়তে পারে না, তবু হাচিয়ে হাঁচিয়ে দেখে চললো—

শ্রীচরণেষু,

তু'দিন ধ'রে ভেবেছি তোমাকে এ চিঠি লিখবো কি না। আমি যতবার তোমাকে বলবার চেষ্টা করেছি তুমি উদাসীন হ'য়ে থেকেছ। মা ও বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। আমাকে ওঁরা যার-তার হাতে তুলে দেবেন, আমি সেটা পছন্দ করিনে। আমি তোমারই কাছে থাকতে চাই।

তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো তাহ'লে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। বাবা

মা আড়ালে সেদিন যে কথা বলছিলেন তা শুনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোমাকে এ চিঠি লিখ্‌তে পারলাম।

আমার ভালবাসা নিও। তোমারই ললিতা

পুঃ—কাল আমরা দেশে ফিরবো, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। নিজেকে লুকিয়ে রেখো না, তোমার অবস্থা তো ভালই, তবুও এমন দীনহীন ব'লে নিজের পরিচয় দাও কেন? এ যে আমারও অপমান! নিজেকে ছোট ক'রে দেখলে বড় হব কেমন ক'রে?—ইতি ল।

কিন্তু শেষ ছত্রটি পড়বার সময় আর মিস্টার পেলে না, নরেন ঘরে এসে ঢুকলো।

চিঠিখানা হাতে ক'রে নিয়ে মিস্টার উঠে দাঁড়ালো তারপর একটু হেসে কাছে গিয়ে নরেনের একখানা হাত টেনে নিয়ে চেপে ধরলো। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বল্‌ল—মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ লোক, এখনো তোমার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে। বসো।—নরেনকে জড়িয়ে ধ'রে সে নিজের চেয়ারটার উপর তাকে বসালো।

তারপর চিঠিখানা তার হাতের ভিতর গুঁজে দিয়ে ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত পুরে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—যদি একটু সেন্টিমেন্টাল্ হই কিছু মনে করোনা। তোমার ঐ চিঠিখানা প'ড়ে আমার মনে হলো, তুমি great, তোমার ভাগ্যটা যদি আমি পেতাম নরেন, তাহলে—but I should check myself.

সন্ধ্যার অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল, ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। পকেট থেকে একটি সিগারেট বার ক'রে দেশালাই জ্বেলে সে যখন ধরাতে লাগলো, সেই চকিত আলোয় নরেন দেখলে তার চোখ দুটিতে জল চক্ চক্ করছে।

সমুদ্রে ভেসে যাবার আগে—really, I was thinking of my own life—এ জীবনে কিছুই তো নেই,—infinitely alone.

হৃদয়াবেগ আপনার ভাষা আনে সঙ্গে ক'রে।

দেশালাইটা আর একবার জ্বেলে হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিস্টার পুনরায় বল্‌ল—যাক্ সময় হ'য়ে গেছে, আর দেরি ক'রতে পারিনে। আর্‌দালি—আর্‌দালি?—All right, চললাম ভাই!—আর একবার নরেনের করমর্দন ক'রে বল্‌ল—Good bye, good luck!

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল, সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সে আর একবার বল্‌ল—yes, my last request, ললিতাকে বিয়ে ক'রতে তুমি অমত করো না ভাই। She is your beloved Helen.

ছড়িটা ঘুরিয়ে শিস্ দিতে দিতে সে টক্ টক্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ললিতার চোখদুটি তখন আনন্দ ও বেদনায় ভরে উঠেছে।

প্রেতিনী

সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচে যায়—তখন তের বছরের মেয়ে। বিয়ের তিন দিন না যেতেই স্বামী হ'ল দেশত্যাগী। কপালের সিঁদুরের চিহ্নটুকু রইল কিন্তু হাট গেল ভেঙে। সে ভাঙা-হাটে আসর আর জম্‌লো না। সধবা, বিধবা ও কুমারীর একত্র সমাবেশে চন্দ্রময়ী হ'য়ে রইল সকলের চোখে একেবারে অপূর্ব !

সংযম এবং সতীত্বের পরীক্ষা চল্‌ল বছরের পর বছর। চন্দ্রময়ীর হৃদয়াবেগ ছিল না, ব্যর্থতার বেদনা ছিল না, সুতরাং পথ চল্‌তে গিয়ে পা তার এতটুকু টলেনি। হেসে-খেলে, ভালমন্দ খেয়ে, ঝগড়া-ঝাটি ক'রে পরের সেবা ক'রে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে, রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে দিব্যি বয়সটা গেল কেটে।

যে টুকু চঞ্চলতা ছিল থেমে গেল, আগুন যেটুকু ছিল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে গেল ছাই হ'য়ে। রক্তের মধ্যে জল মিশে পাত্‌লা হ'য়ে গেল, বুদ্ধিবৃত্তিটাকে আচ্ছন্ন ক'রল আসন্নবার্ধক্যের একটি অস্পষ্ট ছায়া !

চন্দ্রময়ীর বয়স এই সবেমাত্র চল্লিশ পার হয়েছে। জীবনে তার একটিও ভালোবাসা হয়েছিল কি না কে জানে ! হ'য়েও থাকতে পারে ! স্ত্রীর মতো ক'রে একজনও কেউ ভালবাসেনি—বয়স্থা কোনো মেয়ের পক্ষে এ কথা যে অতিরিক্ত সম্মানহানিকর ! ভালবাসিনি এ কথা অনেক মেয়েই বল্‌তে পারে , কিন্তু ভালবাসা পাইনি এ কথা বল্‌তে মেয়েদের মুখে কেমন যেন আটকায়।

চন্দ্রময়ীর বাসস্থানটি,—বাড়িটি নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু কে যে কর্তা এবং কে কে যে বাস করে তা আজও পর্যন্ত জানা যায়নি। তিনটি তলায় সবশুদ্ধ অনেকগুলি বারান্দা এবং দালান, ধর্মশালা ব'লে ভুল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয় ; আতিথ্য নেবার এমন অবাধ সুবিধাও সহজে মেলে না। মাঝের তলায় যে ঘরখানি এতদিন খালিই পড়েছিল, সেদিন দেখা গেল একটি স্বামী ও স্ত্রী এসে সেখানি দখল ক'রে বসেছে।

বউটি ছেলেমানুষ। নিজেই রাঁধে-বাড়ে, নিজেই সব কাজ-কর্ম করে, এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে খিল এঁটে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। যে পুরুষমানুষের ভিড় চারিদিকে!—লোকজনের যাতায়াত একদণ্ডও কামাই নেই!

তেতলা থেকে চন্দ্রময়ী একদিন নেমে এল, দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে বউটি দরজা খুলে দিল, চন্দ্রময়ী একটুখানি হেসে জিজ্ঞাসা ক'রল, তোমার নাম কি মা?

এমন আকস্মিক কৌতূহলের সঙ্গে বউটির পরিচয় ছিল না। আস্তে আস্তে বল্‌ল—নিরুপমা।

নিরুপমা? বেশ নাম। আচ্ছা নিরু ব'লেই ডাকব।—ও কি, অবেলায় মাথার চুল এলো কেন? চুল তোমার একেবারে মেঘের মতন বাছা! ব'সো বেঁধে দিয়ে যাই।

নিরুপমা আর প্রতিবাদ ক'রতে পারলো না। কাঁটা, চিরুনি, ফিতে বা'র ক'রে আন্‌লো। চন্দ্রময়ী ভিতরে ঢুকে তাকে কোলের কাছে নিয়ে চুল বাঁধতে ব'সে গেল।

কি করেন তোমার স্বামী, হ্যাঁ বৌমা?

দোকান আছে।

ও।—ছেলেপুলে ক'টি?

—এখনো কিছু হয়নি।

চুল বাঁধতে বাঁধতে চন্দ্রময়ী এদিক ওদিক তাকায়। বদ্ অভ্যাস একটি তার ছিল বৈ কি! ভ্রূ-কুঞ্চিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার কেমন একটা পীড়াদায়ক সন্দেহ আর উদ্বেগ দেখা যেত।

ও ছবিটি কার বৌমা? ওই যে জান্‌লার পাশে?

উনি আমার বড়কাকা।

ও, সেলাইয়ের কাজ রয়েছে দেখছি; সেলাই কর?

হুঁ!

আচ্ছা, বাসিফুল অতগুলো জমিয়ে রেখেছ কেন? তোমার স্বামী বুঝি এনে রেখেছেন?

হুঁ।

তা বেশ বেশ, বলি হ্যাঁ মা, ঘরটা ঝাঁট্ দাওনি?

বউটি বল্‌ল,—দেবো এইবার।

চুলের মধ্যে কাঁটা গুঁজে দিয়ে চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। পরে বল্‌লে,—তোমরা বুঝি কলাইয়ের বাসন ব্যাভার কর বৌমা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ও গুলো কিসের কৌটো? মশলা-পাতি থাকে বুঝি?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে নিরুপমা ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে উঠেছিল। চন্দ্রময়ী বুঝতে পারলো কি না কে জানে! উঠে যাবার আগে বল্‌ল,—দেখি বৌমা, একবার এদিকে ফেরো তো!

নিরুপমা ঘুরে ব'সতেই তার মুখখানি ধ'রে চিবুকটি নেড়ে আদর ক'রে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—বেশ

বৌ, খুব পছন্দসই। তারপর উঠে চ'লে যাবার সময় ব'লে গেল—তুমি আমার মেয়ের বয়সী! আচ্ছা মা, আবার আসব'খন।

নিরুপমা অবাক হ'য়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাড়াতাড়ি সে তেতলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে খুব হাসতে লাগলো। এ হাসির মধ্যে নারীর অন্তর-মাধুর্যের চেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণতাই ছিল পরিমাণে কিছু বেশি। এ হাসি দেখলে জয়ের উল্লাসকেই শুধু মনে পড়ে।

চন্দ্রময়ীর জীবন-যাত্রার যে কোনো শৃঙ্খলা নেই তা বেশ বোঝা যায় তার অগোছালো ঘরখানির চারিদিকে তাকালে। কাপড়ের কুটি, ভাঙ্গা টিন, ছেঁড়া বিছানা, পুরানো হাঁড়ি, ফুটো থালা-বাসন প্রভৃতিতে ঘরখানি একেবারে বোঝাই। আম কাঠের একটা খোলা মাঝারি সিন্দুকের মধ্যে আরসোলা গিজ্‌গিজ্ করছে, পায়াভাঙ্গা জলচৌকি চিৎ ক'রে তার উপর রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো করা, কাঁচকড়ার একটা তোবড়ানো পুতুল মাথা-কাটা অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। চন্দ্রময়ীর এসব কোনোদিন খেয়ালেই আসে না। সে যে রান্নাবান্না ক'রে, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে কেমন ক'রে, এটি ভাব্‌বার কথা।

সারাদিন চন্দ্রময়ীর কাজ ফুরোতো না, অবসর ছিল না তার এতটুকু। কিন্তু কি যে সে কাজ, সমস্তক্ষণ ঘুরে ঘুরে কেন যে সে শশব্যস্ত থাকত,—বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ না ক'রলে তার হদিস্ পাওয়া যেত না। সকলের সঙ্গে একটু-আধটু জড়িয়ে থাকলেও তার কোনো স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব নেই; সকলের মাঝখানে থেকেও সকল মানুষের থেকে দূরে ছিল তার স্থান। রাসভারিও ছিল না তার, হাঁটলে বা ছুট্‌লে তার পায়ের শব্দও হ'ত না! চোরের মতো গোপন আনাগোনায় সে ছিল অতিরিক্ত অভ্যস্ত।

নীচের তলার ঘরগুলি বিশেষ বাসযোগ্য ছিল না, দু'তিন খানি নোংরা ঘর এই সেদিন পর্যন্ত খালিই প'ড়ে ছিল। অনেকদিন অনেক সময় এই ঘরগুলি থেকে চন্দ্রময়ীকে চট্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে যেতে দেখা গেছে। কারণ জিগ্যেস ক'রলে বল্‌ত—এমনি, যদি কেউ আসে···ঘর-দোর পরিষ্কার থাকলে ভাল দেখায়!

অনুমান তার মিথ্যে নয়, লোকজন এল। গুটি তিন-চার যুবক ছুটিতে পশ্চিমে হাওয়া খেতে এসেছে। থাকবে কিছুদিন।

চন্দ্রময়ী কার একটা ফুটো-সারানো বাল্‌তি নিয়ে উপর থেকে নেমে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—কুলোবে তো বাবা, দুখানি ঘরে তোমাদের চল্‌বে? কাশীর বাড়ি সব এমনই বাবা, সব জায়গাতেই অন্ধকার!

একটি ছেলে বল্‌লে, চ'লে যাবে কোনো রকমে। এটা তো আপনার বাড়ি, নয়?

আর বাবা, আমার জিনিস কি আর বলা চলে? এসব তোমাদেরই, আমি শুধু আগ্‌লে দরোয়ানের মতন ব'সে আছি। তোমার নাম কি?

ভূপতি। আর এই আমার বন্ধু সদানন্দ, আর উনি নিখিল।

চন্দ্রময়ী গিয়ে কল্ থেকে এক বাল্‌তি জল এনে রাখলো, পরে জলের উপর [illegible] নিয়ে ঝাঁটা এনে ঘর ঝাঁট দিতে সুরু ক'রে দিল। ছেলেরা নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকালো, পরে বল্‌ল,—কি করছেন? একি ভাল হচ্ছে? এত ক'রলে আমাদের এখানে থাকতে লজ্জা হবে যে।

চন্দ্রময়ী একটুখানি হাসলো শুধু। এবং সে হাসি এমনিই যে একাজে যেন আর কারো অধিকার নেই, এ শুধু তারই একার!

এমনি ক'রেই হ'ল আত্মীয়তা, এমনি মুখ-থাবা দিয়েই নিল চন্দ্রময়ী পরের উপর অধিকার! অনাত্মীয়ের সেবার এই যে অনাহূত আতিশয্য—এর টান ছিল চন্দ্রময়ীর ভয়ানক বেশি।

দোতলায় যিনি থাকেন তিনি একজন প্রবীণ ডাক্তার। বয়স আন্দাজ বছর-পঞ্চাশ কাঁচা-পাকা চুল। বিপত্নীক। একটি তরুণী প্রমুখ কয়েকটি ছেলেপুলে নিয়ে তিনি বেশ শান্তিতেই বসবাস করেন।

মেয়েটির বিবাহের কথা চলছিল। তা বয়স হয়েছে বৈ কি! চন্দ্রময়ী একদিন তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল,—কলঘরের মধ্যে! একহাতে গলাটা জড়িয়ে আর একহাতে চিবুকটি ধ'রে বল্‌ল,—বিয়ে হবে, হ্যাঁরে বিনীতা?

বিনীতা লেখাপড়া-জানা মেয়ে, সুতরাং তার চেহারায় একটি গাম্ভীর্যের ছায়া আছে। সে বল্‌ল—এমন আড়ালে ডেকে চুপি-চুপি জিগ্‌গেস কচ্ছেন কেন? হ'লে তো আর লুকিয়ে হবে না!

না, তাই বলছি—চুপি চুপি চন্দ্রময়ী বল্‌ল,—সত্যি হবে?

মেয়েরা আর কবে চিরকাল আইবুড়ো থাকে, মাসীমা?—

বিনীতা গর্‌গর্ ক'রতে ক'রতে উপরে উঠে এল।

কোন মানুষের অবজ্ঞা চন্দ্রময়ীকে আঘাত করে না।

ভূপতি এবং তার বন্ধুরা বাড়ি ছিল না, চন্দ্রময়ী একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল।

কি তার উদ্দেশ্য তা শুধু সে-ই জানে। ফিরে এসে উপরের সিঁড়িতে পা দিতেই তার নজর প'ড়ল কতকগুলি এঁটো বাসনের উপর। বাসনগুলি ভূপতিদের। চন্দ্রময়ী নেমে এসে সেগুলো কল্‌তলায় নিয়ে গিয়ে মাজতে ব'সে গেল। বামুনের মেয়ে—কিন্তু জাতিভেদের সংস্কার তার তখন মনেই এল না।

কাজ হ'য়ে গেলে ধোয়া বাসনগুলি এনে দরজার কাছে গুছিয়ে রেখে তৃপ্ত মনে সে উপরে উঠে এল। হঠাৎ সুমুখে ডাক্তারবাবুকে দেখেই লজ্জায় ও সরমে মাথার কাপড় আর একটু টেনে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সে আবার তেতলায় উঠে গেল। ডাক্তারবাবুকে দেখলে তার বুকের রক্ত বুকের মধ্যেই দাপাদাপি করে!

নিজের ঘরে এসে সে হাঁপাতে লাগলো। উত্তেজনায় মুখখানা তার রোমাঞ্চ হ'য়ে এসেছিল। ডাক্তারবাবু কি তার মুখের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন ?

রূপ ? চন্দ্রময়ীকে দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। বিরলকেশ, দাঁত উঁচু, সাপের চোখের মতো দুটো ছোট ছোট চোখ, হাত-পাগুলি কদাকার, চির-উদাসীর মতো একখানি শীর্ণ দেহ,—চন্দ্রময়ী যেন বিধাতার সৃষ্টির ব্যর্থতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপরাহ্ণের আলো ম্লান হ'য়ে এসেছে। চন্দ্রময়ী আবার আস্তে আস্তে নেমে এল। দোতলার সিঁড়ির কাছে দরজাটায় একটু ধাক্কা দিল, দরজা গেল খুলে। নিরুপমা নীচে তখন কাপড় কাচ্তে গেছে।

ঘরে ঢুকে চন্দ্রময়ী দেখ্লো দু'তিনখানি ধুতি ও শাড়ি মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছে, সেগুলি সে গুছিয়ে রাখলো। বিছানাগুলা এক-জায়গায় জড়ো করা ছিল, সেগুলি অতি যত্নে বিন্যাস ক'রে মেঝের উপর ছড়াতে লাগলো। আগে মাদুর, তারপর সতরঞ্চি, সতরঞ্চির উপর তোষক, তার উপর একখানি ধবধবে চাদর। চাদরখানি পেতে পাশ-বালিশ সাজিয়ে রাখলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ফিরতেই একেবারে নিরুপমার সঙ্গে মুখোমুখি! নিরুপমার মুখখানি তখন বিছানার দিকে তাকিয়ে রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

এই যে বউ মা, এই নাও বাছা তোমার ঘর-দোর...তুমি একা আর কতো পারবে মা ?

নিরুপমা বল্‌ল,—রোজই তো করি!

চন্দ্রময়ী একটু হাসল। বল্‌ল,—ইচ্ছে হ'ল, ক'রে দিয়ে গেলাম। আমার তো আর হাতে কোনো কাজ নেই মা! দাঁড়াও বাছা, রাতের জন্যে জল তুলে এনে দিচ্ছি।

না না, থাক—কেন এত কষ্ট করবেন আপনি ?

দরজার বাইরে এসে চন্দ্রময়ী কয়েক মুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর নীচে নেমে এসে যাবার সময় তার সেই কদাকার মুখে একটুখানি হেসে বল্‌ল,—তা হোক বৌমা, দয়া ক'রে একটু-আধটু কিছু আমাকে ক'রতে দিয়ো। এতে তো তোমারই লাভ মা ?

চন্দ্রময়ী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। নীচের ঘরে তখন আলো জ্বল্‌ছে। ভূপতিরা ঘরের মধ্যে বসে বসে গল্প করছিল। রান্নাঘরের ভিতর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে রাতের খাবার তৈরী করছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে চুপি চুপি বল্‌ল,—এই ?

ছেলেটা মুখ তুলে তাকালো। চন্দ্রময়ী বল্‌ল—চেঁচামেচি করিস্‌নে। তোর মশলা পিষে দেবার দরকার আছে তো ?

ঘাড় নেড়ে ছেলেটা জানালো, আছে। বাস্ তখন আর কি, চন্দ্রময়ী ভিতরে ঢুকে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ব'সে গেল বাট্‌না বাট্‌তে। অতি যত্নে, অতি সাবধানে এবং অতি গোপনে সে

একে একে লঙ্কা, হলুদ, ধনে-জিরা-মরিচ চমৎকার মিহি ক'রে বেটে দিতে লাগলো। মনে হচ্ছিল, তার হৃদয়ের সমস্ত দাক্ষিণ্য, মমতা, মায়া—যত কিছু হৃদয়-বৃত্তি তার গুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে ছিল, সেগুলি একে-একে জেগে উঠে এই সব ছোট ছোট কাজের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে যাচ্ছে।

—কে তোকে ডেকে আনল রে ?

ছেলেটা বল্‌ল, ভূপতিবাবু।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল,—মাইনেটা একটু কম ক'রে নিস্ বাছা। ভূপতির এখন অনেক খরচ !

ছেলেটা চুপ ক'রে রইল। চন্দ্রময়ী পুনরায় বল্‌ল,—শরীরটা আমার ভাল নেই কি না, তাই তোকে রাখতে হ'ল ! বাবুকে একটু যত্ন-আত্তি করিস, মাইনে বাড়িয়ে দেবো :

বাইরের ঘরে তখন কি একটা কথায় হাসির ধুম প'ড়ে গেছে ছেলেগুলি ঠিক শিশুর মত উচ্ছল, চঞ্চল,—প্রাণের প্রাচুর্যে তারা যেন টলমল করছে। চন্দ্রময়ীর কান দুটো সেইদিকে খাড়া হ'য়ে ছিল। বল্‌ল—যে বয়সের যা, বাইরের লোকে কি আর এ সব বুঝবে ? একটু হাসি তামাসা না ক'রলে শরীর ভাল থাকবে কেন ?

ছেলেটা এবার বল্‌ল,—বাবু তো এখানে শফরে এসেছে !

তুই থাম ! তুই তো সবই জানিস্। কলকাতাতেই বাবুর সব কাজ, এখানে তাই জন্যে সব সময় থাকা চলে না। বলি ও কি হচ্ছে ? অমনি ক'রে কি মাছ স'ত্‌লায় ? মাছগুলো তো পুড়িয়েই ফেল্‌লি ! নে স'রে ব'স।

হলুদ-মাখা হাত দু'খানা ধুয়ে এসে চন্দ্রময়ী ছেলেটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে রাঁধতে ব'সে গেল। বল্‌ল—দু'একদিন দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে পারবিনে দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়া দাঁড়া, যাস্‌নে এখন কোথাও, শোন্ বলি।

ছেলেটা ফিরে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী উঠে গিয়ে বাজার-থেকে আনা মিষ্টি তার হাতে দিয়ে বল্‌ল—গালে দিয়ে এইখানেই ব'সে জল খা, যাস্‌নে কোথাও বুঝলি ?

ছেলেটা তাকে বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী বিবেচনা ক'রে নির্বিচারে তার এই আদেশ মেনে নিয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

ও ঘর থেকে আওয়াজ এল—এই গিরধারী, বেটা ভাত চড়িয়ে দেনা, পেট যে চুঁই-চুঁই করছে !

গিরধারী উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী চঞ্চল হ'য়ে উঠে বল্‌ল,—এইখান থেকে উত্তর দে, বল্—'ভাত চড়ান হ'য়েছে বাবুজি !'

খুন্তিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে সে একবার বাইরে এসে উঁকি মারলো, তারপর বল্‌ল,—দেখিস্, আমি এখানে আছি একথা ভূপতি শোনে না যেনো। আমার অসুখ করেছে কি না তাই নীচে নাম্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু তার এই চৌর্যবৃত্তি গিরধারীর ভাল লাগছিল না। সে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল।

আত্মগোপন করবার শক্তি যার অনেকখানি, মানুষের মনের কথা জান্‌বার একটি বিবিদত্ত ক্ষমতা তার আছে। চন্দ্রময়ী একবার বাইরের দিকে তাকালো, রাত্রি অন্ধকার কি না কে জানে, হয়তো চন্দ্রোদয় হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু নীচেটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। আলো নেই, হাওয়া নেই, আকাশ নেই, অবকাশ নেই,—নিরুদ্ধ নিশ্বাসের মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ ছেঁড়া তব্‌লার শব্দের মতো ঢ্যাব্‌ ঢ্যাব্‌ করে। চন্দ্রময়ী ঘাড় ফিরিয়ে গিরধারীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল—ভূপতি আমার ছেলে কিনা তুই তা জান্‌বি কি ক'রে, সবে এসেছিস বৈ তো নয়! বত্রিশনাড়ি ছেঁড়া যে ছেলে, সে তার মায়ের শরীর দেখবে না?

গিরধারী একথা আগেই বুঝেছিল।

ভাত নামিয়ে খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে চন্দ্রময়ী লুকিয়ে চ'লে গেল। ছেলেরা যখন খেতে এসে বস্‌লো, সে তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে চোরের মতো তাদের দিকে তাকাতে লাগলো, গিরধারীর পরিবেশনের মধ্যে কতটুকু যত্ন আছে তাও তার নজর এড়ালো না। নিজের হাতে সে যদি ভূপতিদের খাইয়ে দিতে পারতো তা হ'লেই হ'ত ভাল!

চন্দ্রময়ী নেমে এসে পা টিপে তাদের ঘরে গেল। বিছানাগুলি ঝেড়ে-ঝুড়ে অতি যত্ন ক'রে পেতে দিল। ঘরের মধ্যে সিগারেট ও দেশলাইয়ের কতকগুলি কুচি ছড়ানো, সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিল। পাছে ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট্‌ দিলে শব্দ হয়, এজন্যে আঁচল দিয়ে সমস্ত ঘরের মেঝেটা সে পরিষ্কার ক'রলো।

পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে সে যখন নিঃশব্দে উপরের সিঁড়িতে উঠে গেল, ছেলেরা তখন সোৎসাহে আহার সাঙ্গ ক'রে উঠেছে। উল্লাসে চন্দ্রময়ীর সর্বাঙ্গ একবার কেঁপে উঠ্‌ল। সন্তানের ভোজন-তৃপ্ত মন মাকে কি আনন্দিত করে না?

ঘরের মধ্যে স্বামীকে খেতে বসিয়ে নিরুপমা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দ্রময়ীকে এমনি ভঙ্গিতে আসতে দেখে বল্‌ল—অন্ধকারে এতবার যাতায়াত করছেন, একটা আলো হাতে রাখুন না!

আর মা, আলো!—চন্দ্রময়ী বল্‌ল—সময় কই? ছেলে হ'লে মায়ের যে কত জালা তা তো আর তুমি এখনও জান্‌লে না!—ব'লে সে তেতালায় চ'লে গেল।

কথাটা ঘরের মধ্যে খেতে খেতে স্বামীর কানে গিয়েছিল। তিনি ভ্রূ কুঁচ্‌কে নাক সিঁটিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন—মাগীটা কেন কথা কয় যখন-তখন তোমার সঙ্গে? বদমাইস—'আগ্‌লি।'

নিরুপমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার দৃষ্টি নত ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। জীবনকে মানুষ কি ঠিক এমনি ক'রেই বিচার ক'রবে?

উপরে উঠে চন্দ্রময়ী ঘরে ঢুকে ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লো। ভূপতির রান্না ক'রতে পেয়ে আজ সে যেন ধন্য হ'য়ে গেছে। আজ এই রাত্রিটিতে দুঃখের একবিন্দু চিহ্নও যেন তার মধ্যে নেই।

চোখে আজ তার হয় তো ঘুম আসবে না, মনের নিত্য-নিয়মিত ক্লান্তি আসবে না—সমস্ত রাত আনন্দের উত্তেজনায় আজ হয়তো তাকে ছাদের উপর ঘুরে ঘুরেই বেড়াতে হবে!

জানলা-দরজাগুলো খোলাই রইল, বিছানা হ'ল না, না হ'ল ঘর পরিষ্কার,—আলোই বা সে কি জন্যে জ্বাল্‌বে!

কিন্তু তার সমস্ত মন বিশৃঙ্খল, জীর্ণ ও মলিন গৃহসজ্জাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভ'রে উঠতে লাগলো। আজ তার সমস্ত দৈন্য সার্থক ক'রে দীপশিখা জ্বলে উঠেছে!

সারাদিন পরিশ্রমের পর তার চোখ বুজে এলো। কিন্তু চোখ বুজে সে দেখলে শিশু-ভূপতিকে। ফুটফুটে ছ'বছরের ছেলে, অশান্ত, পাথরের কুচির মতো কঠিন, স্তন্য পিপাসায় শিশু-ব্যাঘ্রের মতো সে যেন চন্দ্রময়ীর বক্ষস্থল প্রথম দাঁতের আঘাতে জর্জরিত করছে! ভাবতে ভাবতে চন্দ্রময়ীর গা ডোল হ'য়ে এল।

মাদুরের উপর ব'সে নিরুপমা কি একখানা মাসিকের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল; চন্দ্রময়ী ঘরে এসে ঢুকলো।

—এসে যে দুদণ্ড বসবো বৌমা, তার আর সময়ই পাইনে। তোমার সেই যে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ ছিল, শেষ হ'য়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ, সে সামান্যই!

সেলাইটাও যদি শিখতাম!—চন্দ্রময়ী বল্‌ল—কোনো কাজই হাতে থাকে না কিনা, ত[illegible] কোনো কাজের সময়ও ক'রতে পারিনে। চিরকালটা ভূতে পেয়েই রইলাম মা!

কণ্ঠস্বরের মধ্যে তোষামোদের যে ঈষৎ আভাসটুকু ছিল, তা নিরুপমার লক্ষ্য এড়ালে[illegible]। কিন্তু সে ব্যথিত দৃষ্টিতেই চন্দ্রময়ীর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—ভগবানের রাজ্যে এমন যে কেন হয় বোঝাই যায় না।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—সেই প্রথম দিনটি থেকে, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বৌমা! মনে মনে তোমাকে নিয়ে অনেক কথা ভেবেছি।

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে নিরুপমা বল্‌ল—কি রকম?

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—না তা নয়, এই ধরো পেটের মেয়ের মতন তোমাকে আমি ভাবতে পারিনে বৌমা! যদি তোমাকে আমি এ জন্মেই ছেলের বউ ক'রে পেতাম!

ও কথা ব'লে আর লাভ কি বলুন? ইচ্ছে মানুষের অনেক রকমই থাকে। ভেবে ভেবে শুধু দুঃখই বাড়ানো!

তাই বলছি!—মেঝের উপর আঙুল দিয়ে দাগ টানতে টানতে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—ভাগ্যবতী

নৈলে ভূপতির মতন ছেলে পেটে ধরা যায় না। যেমন রূপ, তেমনি গুণ! তিনটে পাশ করেছে, কলকাতায় কারবার—দেশে জমিদার। বালকের মতন সরল, বিনয়ী—বাছা আমার দুঃখের ধন বৌমা!

পরের ছেলের প্রতি এমন একান্ত মমতা, এবং তাই নিয়ে এমন মনোহর স্বপ্নজাল রচনা করা,—নিরুপমা একটুখানি অবাক হ'য়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—অনেক জিনিস ঘটে না বৌমা যা ঘট্‌লে ভাল হ'ত। স্বামী নিয়ে তুমি ঘর কর্‌ছো অথচ ভূপতি আজও বিয়ে ক'রলে না, একথা কি কেউ ভেবেছিল? সংসারে অনেক জিনিসেরই আমরা হদিস্ পাইনে মা।

অর্থাৎ— ?

নিরুপমা ঘাড় ফিরিয়ে তার প্রতি তাকালো। কোথাকার কে ভূপতি বিয়ে করেনি সে আলোচনা তার কাছে কেন? ভূপতির বিয়ে না করার সঙ্গে তার স্বামী নিয়ে ঘর করার সম্পর্ক কি?

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—তা ধরো মা, ভূপতি আমাদের কিছু অপছন্দর নয়। ভূপতির হাঁড়িতে চাল দিলে কোন মেয়েই কি অসুখী হবে তুমি মনে কর মা?

আপনার কাছে কি কোনো পাত্রী আছে?—নিরুপমা বল্‌ল।

সে কথা বলছিনে বৌমা—একটু হেসে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—পাত্রী কোথা পাবো? আমার হাত দিয়ে তো কেউ মেয়ে পার ক'রতে চাইবে না। বলছি মা তোমার কথা···তোমাকে দেখে অবধিই আমি এই কথা ভাবছি।

নিরুপমা বড় বড় চোখে তাকালো।

হ্যাঁ, তোমার কথাই বলছি বৌমা···তোমার যে স্বামী আছে বৌমা, একথা আমি ভাবতেই পারিনে! তুমি তো কুমারী মেয়ে! আচ্ছা চুপি চুপি বল তো বৌমা সত্যি ক'রে···আমাকে মা পাগল মনে কোরো না···বল তো ভূপতিকে তোমার পছন্দ হয় না? সত্যি বল্‌ছি মা, ভূপতি তোমার স্বামী হ'লে বুঝতে যে—

আহত ক্রুদ্ধ সর্পের মতো নিরুপমা উঠে দাঁড়াল। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌ল—চ'লে যান্—যান্ শীগ্‌গির বলছি···এক মিনিটও আর এ ঘরে বসবেন না!

তার মুখের চেহারা দেখে চন্দ্রময়ী আর বসতে পারলো না, উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে ঢোক গিলে বল্‌ল—অন্যায় হয়েছে বৌমা?

বৌমা তার উত্তরে বল্‌ল—কই এখনও বেরোলেন না ঘর থেকে? উনি যা বলেন মিথ্যে নয়, উনি মানুষ চেনেন। খবরদার আমাকে আর বৌমা ব'লে ডাকবেন না! আপনার কি ধর্মভয় নেই? যান এ-ঘর থেকে। আপনার বাড়িতে ভাড়া ক'রে আছি ব'লে অপমান করেন কোন্ সাহসে?

মাথা হেঁট ক'রে চন্দ্রময়ী বেরিয়ে চ'লে গেল।

গেল বটে কিন্তু এতটুকু আঁচ তার গায় লাগল না। উপরের ঘরে গিয়ে সে যখন আবার প্রতিদিনের কাজ কর্মে মন দিল, মনে হ'ল অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। আঘাত পেয়ে আহত হ'ল না, সামাজিক নীতিকে পদদলিত ক'রতে সে কুণ্ঠিত হ'ল না—স্বচ্ছন্দে নির্বিকার চিত্তে সে ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল।

নিরুপমার ঘরের পাশ দিয়ে আনাগোনা করে কিন্তু কথা বলতে আর সাহস করে না। এ ঘরটি চিরকালের জন্য তার মুখের উপর বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দোতলায় নেমে ডাক্তার বাবুর ছেলে-মেয়েগুলির সঙ্গে সে হেসে হেসে কথাবার্তা কয়। একটু আধটু খেলাও করে। ছেলেমেয়েগুলি তার বড় প্রিয়। বিনীতা প্রায়ই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে,—এই কদাকার স্ত্রীলোকটার গতিবিধির প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন সে মনেই করে না।

চন্দ্রময়ী যে লুকোচুরিও খেলতে পারে একথা ছোট ছেলেমেয়েগুলির জানা ছিল না। সুতরাং এই পরম স্নেহময়ী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিলে-মিশে তারা চমৎকার আমোদ পায়। হুড়যুদ্ধ ক'রে সারাদিন বেড়াতে পারলে তারা আর কিছু চায় না!

এক একবার একটু থেমে কোনো একটা ছেলে কিম্বা মেয়েকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রময়ী অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে।

—তোর বাবা খুব হো হো ক'রে হাসেন, না রে মণ্টু?

মণ্টু বলে—হুঁ, খুব। খুব হাসে মাসিমা, হা হা ক'রে।

বাবা তোর কি খেতে ভালবাসেন রে?

মেজ মেয়েটা ব'লে উঠ্‌ল পুঁই শাক মাসিমা, ইলিশ মাছ দিয়ে। ইলিশ আর পুঁই চচ্চড়ি!

ও,—চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ উদাসীন হ'য়ে রইলো। পরে বল্‌ল—রাত্তিরে কি খান?

রাত্তিরে? লুচি।

ডাক্তার বাবু তোদের খুব ভালবাসেন, না রে?

হুঁ—আমাকে সবচেয়ে বেশি!

বাস্, অমনি গোলমাল সুরু হ'ল। সবাই চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—আমাকে বাবা সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসে, মাসিমা আমাকে!

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—আচ্ছা লটারি ক'রে দেখি দাঁড়া।

লটারি হ'ল,—উঠ্‌ল কিন্তু ফোক্কা! চন্দ্রময়ী বল্‌ল—থাক্ লটারি—যাক্ গে! আচ্ছা, রাত্তিরে ডাক্তার বাবুর কাছে কে শোয়?

মন্টু তখন বীরের মতো এগিয়ে এল। বলল্—আমি!

চন্দ্রময়ী তাকে ভুলিয়ে কোলে তুলে নিয়ে উপরে চ'লে গেল।

উপরে গিয়ে তার হাতে সন্দেশ দিল, ঠাকুরের প্রসাদী কিশমিশ দিল। কোলের মধ্যে বসিয়ে তাকে আদর ক'রল, আষ্টেপৃষ্টে চুম্বন ক'রল। তারপর তাকে তুলে এনে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—লাটু কিন্‌বি মন্টু! কত দাম বল্ দিচ্ছি।

মন্টু বল্‌ল—চার পয়সা।

আচ্ছা দেবো, আগে আমি যা বলবো শুনবি?

হুঁ, শুনবো।

উত্তেজনায় এবং দুরন্ত উল্লাসে চন্দ্রময়ী থর-থর ক'রে কাঁপছিল—রক্তের তরঙ্গ প্রচণ্ড আকারে উদ্দাম হ'য়ে তার বুকের মধ্যে মাতামাতি করছিল? বল্‌ল—ডাক্তার বাবু তোর কে হয়?

বাবা।

আমি তোর কে হই?

মাসিমা।

চুপ!—ব'লে সে মন্টুর মুখটা হাত দিয়ে টিপে ধরলো। বল্‌ল—খুন করবো এখুনি। বল্—'তুমি আমার মা হও।' বল লক্ষীটি, এখুনি লাটু কিনতে দোবো বল?

মন্টু সাত বছরের ছেলে। মা মরেছে তো এই বছর দুই হ'ল—বেশ মনে আছে। তবু ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—মা!

আঁচল খুলে চারিটি পয়সা তার হাতে দিয়ে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—মা পালো এইবার। এবার থেকে হাতের মধ্যে পয়সা টিপে দিলেই কিন্তু চুপি চুপি ওই ব'লে ডেকে যাবি—কেমন?

মন্টু ঘাড় নেড়ে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু এই ক্লেদোক্ত জঘন্য কৌশল, বিকৃত চিন্তাধারার এই কুৎসিত প্রকাশ—এর মধ্যে তার যে ক্ষুধাই প্রকাশ পাক,—আপনার আনন্দে আপনি বিহ্বল হ'য়ে এই মনোবিলাসিনী নারীটি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ সন্তান-সন্ততি থাকার আনন্দ যে কেমন—ঠিক এই রকমটি কি না—চন্দ্রময়ী হাসতে হাসতে কেবল এই কথাটাই বারে বারে ভাবতে লাগলো।

গভীর রাত পর্যন্ত ডাক্তার বাবু লেখা পড়া করছিলেন। বারান্দার সমুখেই খোলা জানলার ধারে একটি টেবিল—চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়ানো মাঝখানে একটি উগ্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ডাক্তার বাবু চোখে চশমা লাগিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আলো পার হ'য়ে বাইরে তাঁর নজর আসার উপায় নেই, বাইরের সমস্তই অন্ধকার দেখায়।

রাত বোধ করি অনেক। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। নীচে ভূপতিদের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই,—নিরুপমার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। নিস্তব্ধ রাত্রে দূরে কোথায় কোন্ একটা মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ তখনও ভেসে ভেসে আসছিল।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে!

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনীতা এসে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী থতমত খেয়ে বল্‌ল--বিনীতা? ···ঘুমোওনি এখনো?

কটুকণ্ঠে বিনীতা বল্‌ল—না, বেশ শাদা চোখেই আমি জেগে ছিলাম। আলোর সামনে ছায়া পড়ছে দেখে······জান্‌লার ভেতর চেয়ে কি দেখছিলেন শুনি? রোজ রাত অবধি বাবাকে কাজ ক'রতে হয়, এখানে এসে দাঁড়িয়ে আপনার কি লাভ?

ভিতর থেকে ডাক্তার বাবু সাড়া দিয়ে বললেন—কি হ'ল রে বিনু?

কিছু না বাবা, আপনি কাজ করুন—বিনীতা বল্‌ল।

মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে একটুখানি স'রে এসে অপরাধীর মতো চন্দ্রময়ী বল্‌ল—আলো নিভে গেছে মা, তাই একটা দেশলাইয়ের জন্যে—

দেশলাই আমার কাছে চাইলেই তো হ'ত? হাতড়ে মাতড়ে একটা দেশলাই বা'র ক'রে ঠক্ ক'রে ফেলে দিয়ে বিনীতা বল্‌ল—যান্ যদি কিছু দরকার হয় তো দিনের বেলায় সকলের সুমুখে আমাদের কাছে চাইবেন, দেবো। নইলে অমন চোরের মতন রাতের বেলা—ছিঃ!

হাতে ক'রে দেশলাইটা নিয়ে চন্দ্রময়ী আবার উপরে উঠে গেল। ঘরে আলো জ্বলছে। এঁটো-কাঁটা, আহারের সামগ্রী চারিদিকে ছড়ানো। আঁচলের ভিতর থেকে একবাটি তরকারী সে মেঝের উপর নামিয়ে রাখ্‌ল,—ইলিশ মাছ এবং পুঁইশাকের তরকারী!

ব'সে প'ড়ে সে খানিক চুপ ক'রে রইল। মনে হ'ল, বড় কষ্টে ও যত্নে নিতান্তই আগ্রহে সারাদিন ধ'রে সে আজ রান্না করেছে। এই বাড়ির সমস্ত লোককে সযত্নে খাওয়াতে পারলে নিতান্ত মন্দ হ'ত না!

অনেকক্ষণ অনেক রকম ক'রে সে ভাবলো। মনে হ'ল, তার সে চিন্তার কূল নেই, অতীত নেই, বর্তমান নেই!—আজকের এই সামান্য ব্যর্থতায় মনে হ'ল তার জীবনের পরিপূর্ণ স্পষ্ট ছবিটি ফুটে উঠেছে! এ চিন্তায় রাতই হয় তো শেষ হ'য়ে যাবে।

আলোটা সরিয়ে এনে সারাদিনের পর ভাত বেড়ে সে যখন ইলিশ মাছ ও পুঁইশাকের তরকারী দিয়ে গ্রাসের পর গ্রাস তুল্‌তে লাগলো, তখন তার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখদুটো দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল নেমে এসেছে!

বিনীতা কিন্তু এই চৌর্যবৃত্তিকে ক্ষমা ক'রতে পারলো না।

পরদিন চন্দ্রময়ী সম্বন্ধে একটি অস্ফুট গুঞ্জন অগ্নির মতো ক্রমে বৃহদাকার ধারণ ক'রলো বেলা তখন অবেলা!

নিরুপমার স্বামী খগেন হঠাৎ এমন একটি মন্তব্য ক'রে বসল, ডাক্তার বাবু যার প্রতিবাদ না ক'রে পারলেন না। বিনীতা আগুন হ'য়ে উঠেছিল, নীচে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ভদ্রভাষায় রীতিমতো চন্দ্রময়ীকে সে অপমান ক'রতে সুরু ক'রে দিল।

খগেন তার উত্তরে ঘৃণিত কণ্ঠে বলল—ঠিক বলেছেন···ভদ্রঘরের মেয়ে হোক্ কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মাগীটা যে-কোনো অন্যায় অনায়াসে ক'রতে পারে। ওকে দেখলে শুধু গা ঘিন্ ঘিন্ করে না, গা ছম্ ছমও করে। 'ফেরোসাস্ উয়োম্যান্'!

চন্দ্রময়ী নেমে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল! এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্তই সে নিঃশব্দে শুনেছে। নির্বিচার অপমান তাকে এতটুকু আহত করে না!

নিরুপমার উদাসীন মুখখানির দিকে তাকিয়ে বিনীতা বলল—এতটুকু ওকে আমি বিশ্বাস করিনে, বুঝলেন বৌদি? কাশী হচ্ছে এইসব মেয়েমানুষদের উপযুক্ত জায়গা—মাকড়সার মতন এরা নানা জায়গায় জাল বেঁধে ব'সে থাকে। মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের কাছে নিজের কথা লুকিয়ে রাখবে—এতবড় ওর সাহস!

নীচে ভূপতি এবং তার বন্ধুরাও এবার সোরগোল ক'রে উঠলো! খগেন এসে বারান্দায় দাঁড়াল। নীচে থেকে ভূপতি বলল—ওই বাড়িওয়ালীর কথা বলছেন তো? আমরাও বলব মনে করেছিলাম! মাগীটা ইতরের একশেষ! দিন নেই, রাত নেই, আমাদের আশেপাশে কি মৎলবে যে ঘুরে বেড়ায়—ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে আসে। বুড়ো মাগি, চুরি ক'রে খায়; তা ছাড়াও অনেক গুণ—বুঝলেন না?

খগেন বললো—'ফার্স্ট ক্লাস ককেট্'!—আমরা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করি ভূপতি বাবু, এ বাড়ি ছেড়ে দেবো!

বিনীতা বললে—বাবাকে দিয়ে আজ সকালেই আমি বাড়ি ঠিক করেছি, কালই আমরা চ'লে যাবো।

ভূপতি বলল—আমাদেরও কনশেসন টিকিটের সময় হ'য়ে এসেছে, শীগ্‌গিরিই কলকাতায় রওনা হচ্ছি!

চন্দ্রময়ী একে একে সমস্তই শুনল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবার সময় একটু ম্লান হেসে ব'লে গেল—কি আর বলব মা, উঠে যাবে···তা যেও, ধ'রে তো আর রাখতে পারবো না। তা ব'লে বাড়িও কখনও খালি পড়ে থাকবে না···ছেলেপুলেয় মেয়েপুরুষে আবার ভর্তি হ'য়ে যাবে! পরকে নিয়েই তো আমার ঘর করা! ···কতো মানুষ এখানে এল কতো মানুষই চ'লে গেল। বাড়ি আমার ধর্মশালা!

অবসন্ন দিনের পাণ্ডুর আলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিরুপমার চোখে যেন জল চক্ চক্ ক'রে উঠেছে। নিরুপমা মানুষের হৃদয়ের বিচার করে।

শৃঙ্খল

ও

পুন্নাম

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র—জন্ম ১৯০৪ কাশী। পড়াশুনা করেছেন কলকাতায় ও ঢাকায়। স্কুলের মাষ্টারী থেকে পত্রিকা সম্পাদনা, মায় ওষুধের বিজ্ঞাপন লেখা পর্যন্ত নানা রকম কাজ করেছেন। এঁর প্রথম প্রকাশিত বই—"পাঁক," ষোল সতেরো বছরের লেখা। প্রথম কবিতার বই—"প্রথমা"। "কল্লোলের" সঙ্গে গোড়ার দিকে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মুরলীধর বসুর সাহায্যে "কালিকলম" মাসিক পত্রিকা বার করেন। তারপর "বাংলার কথা" ও "বঙ্গবাণী" দৈনিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে এবং "সংবাদ" ও "নবশক্তি" সম্পাদনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন সহযোগে প্রথম বৎসর "কবিতা" সম্পাদনা করেন। বর্তমানে ছেলেদের "রংমশাল" মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এঁরা দুইজনেই আধুনিক বাংলা গল্পের মোড় ফিরিয়ে দেন। এঁদের এখন দিককার গল্প বাংলা কথাসাহিত্যে একদা যুগান্তর এনেছিলো বললেও অত্যুক্তি হয় না। সবদিক থেকে দেখতে গেলে, ছোটো গল্প লেখায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো প্রতিভা আধুনিক বাংলা দেশে আর কারুর নেই। এঁর গল্পের বিশেষত্ব নিরাভরণ স্বল্পভাষিতা ও সমসাময়িক নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি। ছোটোদের জন্য সম্পূর্ণ মৌলিক ও বাস্তবিকই উঁচুদরের "রোমাঞ্চকর" গল্প একমাত্র ইনিই লিখেছেন। অথচ সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় এঁর বইএর সংখ্যা খুব বেশি নয়—ইনি খুব কম লেখেন। শক্তিমান লেখক হয়েও কম লেখেন, এটাও একটা বিশেষত্বের পরিচয়। এঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস,—পাঁক, উপনায়ন, মৃত্তিকা, মিছিল। গল্প—বেনামী বন্দর, কুয়াশা, পুতুল ও প্রতিমা, নিশীথ নগরী। কবিতা—প্রথমা।

শৃঙ্খল

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই যাইতেছে, ভূপতি বাড়ি আসে অনেক রাত করিয়া, দরজায় দুইটা মৃদু টোকা দেয়, দরজা খুলিবার পর ঘরে গিয়া ঢোকে নীরবে। ভাল কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইবার পর ঘরে খাবার আসনে আসিয়া বসে, খাবার দাবার সামনেই সাজান, আহার শেষ করিয়া নিঃশব্দে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে, সারাক্ষণের মধ্যে বিনতির সহিত একটা কথাও বিনিময় হয় না। এই বাড়িতে যে দুইটি লোক পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করিতেছে এবং আজ সাত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে তাহার কোন পরিচয় তাহাদের মধ্যে যেন অসীম মহাদেশের ব্যবধান। দুই হাত মাত্র তফাতে বড় তক্তাপোষটার দুইধারে যাহারা রাত্রি যাপন করে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ বলিয়া বুঝি এতখানি সুদূরে তাহারা পরস্পরের কাছ হইতে সরিয়া যাইতে পারিয়াছে। কিন্তু শুধু সুদূর বলিলে ইহাদের মধ্যকার ব্যবধান বুঝি কিছুই বোঝান যায় না।

সকালে উঠিয়া ভূপতি নিজেই বাজারে চলিয়া যায়। বাজার হইতে ফিরিয়া মোটটা নামাইয়া দেয় রান্নাঘরের ধারে। আহারের পর নিজের ঘরে গিয়া অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সংসারের কাজ কিন্তু ঠিক নিয়ম মত সুশৃঙ্খল ভাবেই চলিতেছে। কোথাও এতটুকু গোল নাই। বাহির হইতে চেষ্টা করিলেও সেখানে কোন অসঙ্গতি কেহ দেখিতে পাইবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার স্তব্ধতাটা সেই জন্যই যেন আরও ভয়ঙ্কর। সাধারণ মান অভিমানের ক্ষণিক পালা ইহা নয়, ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আবদ্ধ এই দুইটি নরনারীর অসাধারণ এই বিমুখতার হেতু তাহাদের অতীত ইতিহাসেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বাহিরের ইতিহাসে সব কিছু ধরাই কি পড়ে!

বিবাহ হইয়াছিল নিতান্ত সাধারণ ভাবে। ভালো ছেলে খুঁজিবার দুঃসাহস বিনতির বাপ

মায়ের ছিল না। বাড়িঘর আত্মীয় স্বজন না থাক, উপার্জনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান বলিয়া ভূপতিকে কন্যাদান করিতে পারিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শুধু স্বামী ও শাশুড়ীকে লইয়া বিনতিকে সংসার করিতে হইবে। দা—দেইজি না থাকায় একরকম ভালই থাকিবে! ছেলেটি অবশ্য কেমন একটু···

কেমন একটু যে কি তা অবশ্য তাঁহারা স্পষ্টভাবে নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই। তবু খটকা একটু লাগিয়াছিল, এই খটকা লাগাও আশ্চর্য। সত্যিই ভূপতিকে দেখিয়া বা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া খুঁত ধরিবার কিছুই পাওয়া যায় না। বিনতির বাপ মায়ের সচেতন মনে নয়, তাহার চেয়ে গভীর কোন স্তরে যেন সন্দেহের ছায়া দেখা দিয়াছিল। সে ছায়াকে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমল দেন নাই, না দেওয়াই স্বাভাবিক।

বিনতি তখন চোদ্দ পনেরো বছরের লাজুক ভীরু একটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। ফুলশয্যার রাতে নিজের শরীরের তুলনায় অনেক বড় ভারি জামা কাপড়ের বোঝায় আড়ষ্ট ও জড়-সড় হইয়া শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিয়াছিল।

রাত তখন অনেক। নিমন্ত্রিতদের ভোজনের হাঙ্গামা চুকিবার পরই ভূপতি আসিয়া আগেই শয্যার উপর মাথার নীচে হাত রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয় স্বজনের অভাবে পাড়া প্রতিবেশীরাই বিনতিকে সাজাইয়া আচার অনুষ্ঠান পালন করাইয়া ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে তাহার পর।

বিনতি ঘরে ঢুকিতে ভূপতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াছিল। তাহার পর নিজে উঠিয়া সমবেত মেয়েদের কৌতুক-হাসা উপেক্ষা করিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

বিছানায় উঠিবার সময় পাশের বালিশটা বুঝি অসাবধানে পা লাগিয়া মাটিতে তখন পড়িয়া গিয়াছে। বিনতি নিজের অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক কর্তব্যবোধেই সেটা তুলিয়া বিছানায় আবার আনিয়া দিতেই ভূপতি পা দিয়া আবার সেটা মেঝেয় ফেলিয়া দিল।

বিস্মিত ও একটু ভীতভাবেই বিনতি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল! না, ভয় করিবার কিছুই নাই। ভূপতি হাসিতেছে নিঃশব্দে।

এবারে কৌতুক অনুভব করিয়া বিনতি নিজের হাসিটুকু বুঝি গোপন করিতে পারে নাই। মাথায় কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া আবার সে বালিশটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া রাখিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভূপতি আবার পা ছুড়িল। বালিশটা বিনতির হাত হইতে পড়িয়া তো গেলই, আর একটু হইলে বুঝি আঘাত তার হাতেও লাগিত।

বিনতি এবারে ঠিক কৌতুকটা উপভোগ করিতে পারিল না!

কিন্তু সচকিত হইয়া সে হাত সরাইয়া লইতেই ভূপতির উচ্চ হাসি শোনা গেল। ভূপতি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

বিনতিও হাসিল কিন্তু এবার আর বালিশ তুলিবার চেষ্টা করিল না। খাটের একেবারে শেষ প্রান্তে দেয়ালের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। ভূপতি খানিক তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—'কই বালিশটা তুললে না?'

বিনতি একবার তাহার দিকে সকৌতুক ভৎসনার দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাথা নত করিল। ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখ আর দেখা যায় না।

'তোলো বালিশটা।'

মুখ নীচু করিয়াই বিনতি মাথা নাড়িয়া জানাইল সে তুলিবে না। তাহার পর ফিক করিয়া একটু হাসিয়াও ফেলিল।

ভূপতি বিছানার উপর তাহার দিকে সরিয়া আসিল এবার। তারপর তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'বালিশটা কিন্তু না তুললে হবে না।'

স্বামী তাহাকে এই প্রথম স্পর্শ করিয়াছেন।

বিনতি তখন ভয়ে আনন্দে লজ্জায় কেমন হইয়া একরকম হইয়া গিয়াছে। জড়-সড় হইয়া সরিয়া গিয়া দুর্বলভাবে হাতটা একটু ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার শরীরে যেন আর এতটুকু জোর নাই—সমস্ত অবশ হইয়া আসিতেছে, অপূর্ব আনন্দ শিহরণে!

তাহারই ভিতর কানে আসিয়া বাজিল,—'তোলো বলছি।'

বিনতি আবার সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে না তাকাইয়া পারিল না। আশ্চর্য! গলার স্বর যেন রূঢ় বলিয়াই মনে হইয়াছিল কিন্তু মুখে তাহার কোন আভাসই নাই! ভূপতি হাসিতেছে।

বিনতি সাহস পাইয়া অস্ফুট লজ্জাজড়িত স্বরে বলিল,—'আর ফেলে দেবে না তো?'

'আগে তোলো তো।'

স্বামীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পদ্ধতিটা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও বিনতি সমস্ত ব্যাপারে একটু অস্বাভাবিক কৌতুক-প্রিয়তার বেশি আর কিছু দেখিতে পায় নাই। দেখিবার ছিল কি কিছু?

সে বালিশটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছিল,—'হয়েছে তো!'

কিন্তু সে পালা তখনও শেষ হয় নাই। বিনতিকে আর একবার বালিশটাকে কুড়াইতে হইয়াছিল। কৌতুকের চেয়ে বিস্ময় তাহার বুঝি মনে তখন প্রবল!

অস্বাভাবিক হইলেও অত্যন্ত অর্থহীন একটা ঘটনা। বিনতির মনে তাহার স্মৃতিও

থাকিবার কথা নয়। কিন্তু যত দিন গিয়াছে বিনতির মনে হইয়াছে সেই প্রথম রাত্রির ব্যাপারটিতেই বুঝি তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত ছিল।

সংসারে গোড়া হইতেই একটু খিটি-মিটি বাধিয়াছে। গায়ে মাখিবার মতো এমন কিছু হয়ত নয়। কিন্তু তাহার ভিতর স্বামীর ব্যবহারের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার অনুকূল হইলেও বিনতির মনে কোথায় যেন একটা অহেতুক আশঙ্কা তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছে। শাশুড়ী ওই একটি মাত্র ছেলেকে লইয়া আজ কুড়ি বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন। ভূপতির বয়স তখন ছিল পাঁচ বৎসর। পরের সংসারে আশ্রিত হিসাবে মানুষ হইয়া একদিকে ঔদাসিন্য এমন কি নির্যাতন ও অন্যদিকে মায়ের অতিরিক্ত অন্ধ স্নেহ ও আদর পাইয়া ভূপতি হয়ত ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার প্রকৃতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝে বিদ্রোহে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু একথা মানিলেও তাহার অদ্ভুত সব ব্যবহারের অর্থ পাওয়া যায় না।

শাশুড়ী বিনতির বিবাহের বছর দুই বাদেই মারা গিয়াছেন। আগেকার কথা জানা নাই কিন্তু জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছেন এবং সে কষ্টের কারণ বিনতি নয়।

শাশুড়ী-বধুর ছোট খাট গরমিল হয়ত আপনা হইতেই ঘুচিয়া যাইতে পারিত। শাশুড়ীর দিক হইতে স্নেহ না থাক বিদ্বেষ ছিল না. বিনতিরও ভালবাসা না থাক শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ ছিল। কিন্তু মাঝে হইতে ভূপতি সমস্ত গোলমাল করিয়া দিয়াছে।

রান্নাঘরে সামান্য কি একটা কাজের ত্রুটি লইয়া বিনতি হয়ত একটু বকুনি খাইয়াছে শাশুড়ীর কাছে। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। স্বামীকে তাহা নিজে হইতে বিনতি জানাইবার কল্পনাও করে নাই।

অফিসে যাইবার সময় খাইতে বসিয়া ভূপতি হঠাৎ বলিয়াছে—'আর একটা ঝি না রাখলে তো চলছে না, কি বল মা!'

মা ছেলের আহারের সময় বরাবর কাছে আসিয়া বসেন। হাতের পাখাটা থামাইয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন! ঝি তো আমাদের দরকার নেই!'

ভূপতি খানিকক্ষণ কোন কথা বলে নাই। নিঃশব্দে আহার করিতে করিতে হঠাৎ আবার বলিয়াছে—'একটাতেই ঠিক চল্‌ছে কি!

মা ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াই গুম্ হইয়া গিয়াছেন।

ভূপতি আবার বলিয়াছে,—'না হয় আর একটা বিয়েই করি! এমন তো কত লোক করে!'

মায়ের হাতের পাখা থামিয়া গিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে চোখে জলও আসিয়াছে বুঝি।

ভূপতি তবু কিন্তু ক্ষান্ত হয় নাই। বলিয়াছে—এযুগের ছেলেরা তো আর মায়ের সম্মান রাখে না। মাতৃভক্তির জন্যে স্ত্রী-ত্যাগ ক'রলে একটা কীর্তিও থাকবে।'

মা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন—'আমি তো বৌকে কিছু বলিনি বাবা। ঘর সংসার ক'রতে

হ'লে একটু আধটু শিক্ষা দিতে হয়। বৌ যদি তাতে রাগ করে, না হয় আর কিছু বলবো না।'

লজ্জায় বিনতির মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। শাশুড়ী নিশ্চয় ভাবিয়াছেন যে সে-ই স্বামীর কাছে ভৎসনার কথা লাগাইয়াছে। কিন্তু সে কিই বা করিতে পারে।

স্বামীকে রাত্রে নির্জনে শুধু একবার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণভাবে বলিয়াছে—'ছি, ছি, তুমি মাকে অমন ক'রে বল্‌তে গেলে কেন বলত? আমি কি তোমায় কিছু বলেছি।

ভূপতি হাসিয়াছে—'না, আর একটা বিয়ে ক'রতে তুমি বলনি বটে!'

'তাও তুমি পার!' বিনতির মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

ভূপতি আবার তেমনি হাসিয়া বলিয়াছে—'আমার শক্তিতে তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে দেখে সুখী হ'লাম।

ইহার পর আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বিনতির নিরর্থক মনে হইয়াছে।

কিন্তু এমন ঘটনা তাহাদের সাংসারিক জীবনে এই একটিই নয়। সংসারের মসৃণ সামঞ্জস্যকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল বিকৃত করিয়া তোলায় ভূপতির যেন অহেতুক একটা আনন্দ আছে। তাহার চেয়েও বেশি—ছোটোখাটো নিষ্ঠুরতাই যেন তার বিলাস।

সংসারের খরচপত্র আগে মা-ই করিতেন। টাকাকড়ি তাঁহার হাতেই থাকিত। মাস শেষ হইবার পরও টাকা না পাইয়া মা একদিন আসিয়া বলিয়াছেন—'হাতে যে আর কিছু নেই রে! মাইনে পেতে এবার এত দেরি যে!'

ভূপতি খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিয়াছে, 'দেরি কোথায়!'

'আজ সাত দিন হয়ে গেল, দেরি নয়!'

'মাইনে তো অনেকদিন পেয়েছি। ও, দেওয়া হয়নি বুঝি তোমায়! আচ্ছা দেব'খন।'

'আমার যে আজই দরকার,' মাসের চাল-ডালগুলো আনিয়ে নিতে হবে।'

ভূপতি আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়া বলিয়াছে, 'আচ্ছা—ওর কাছেই দেব'খন। চেয়ে নিও যা দরকার।'

আঘাত হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট। মা একেবারে মর্মাহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। নির্বিকার নিষ্ঠুরতা এতদূর পর্যন্ত বুঝি কোন রকমে বোঝা যায়। ভূপতি কিন্তু তাহার পরও হঠাৎ কাগজটা সরাইয়া বলিল—'বৌয়ের কাছে হাত পেতে নিতে আবার মান যাবে না তো?'

মা আর সহিতে পারেন নাই। পারা সম্ভবও বুঝি নয়। হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যা নয় তাই বলিয়া মনের সমস্ত রুদ্ধবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

বলিয়াছেন যে মা বলিয়া সম্মান না করুক, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি যে দুঃখভোগ করিয়া তাহাকে পালন করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কি এই !

ভূপতি তবু হাসিয়া বলিয়াছে—'ছেলে বৌয়ের উপর রাজত্ব করবার লোভেই তাহ'লে এত কষ্ট ক'রে মানুষ করেছিলে !'

মা আর উত্তর দিবার ভাষাই বুঝি খুঁজিয়া পান নাই। সেই দিন হইতে তিনি নিজেকে সমস্ত সংসার হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। বিনতির করিবার কিছু ছিল না—শাশুড়ী মনে মনে তাহাকেও যে দোষী ভাবিবেন ইহা স্বাভাবিক। তাহার সন্তোষ বিধানের দুর্বল চেষ্টারও তাই তিনি ভুল অর্থ করিয়াছেন। বিনতি শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। স্বামীকে কিন্তু তখন হইতেই বিনতি ভয় করে। স্বামীর এ সমস্ত ব্যবহার সত্যই দুর্বোধ্য। স্ত্রীর প্রতি উৎকট ভালবাসার পরিচয় যে ইহা নয়—তাহা বিনতি ভালো করিয়া জানে। তবে এই অসাধারণ হৃদয়হীনতার মূল কোথায় ?

বিনতি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহার সমস্ত মনে গভীর অর্থহীন একটা আশঙ্কার ছায়া জাগিয়া থাকে। সর্বদাই একটা অস্বস্তি, একটা নামহীন অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন সে অনুভব করে স্বামীর সংস্পর্শে।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাহা যেন আরো গভীর হইয়া উঠিল। সংসারের আর কেহ নাই। স্বামীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া ধরিতে পারিলে এই নিঃসঙ্গতাই মধুর হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু খুলিয়া ধরা দূরে থাক, ক্রমশঃ তাহাদের সম্বন্ধ যেন আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্য প্রাচীর কে যেন গড়িয়া তুলিতেছে—দুজনের মাঝখানে। নিজের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার দরুণ বুঝি বিনতির অদ্ভুত একটা পরিবর্ত দেখা দিয়াছে। সেই ভীরু সরল মেয়েটি বিদায় লইয়াছে অনেক দিন আগেই। বিনতির প্রকৃতি ক্রমশঃ রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে, শিথিলতা আসিয়াছে তাহার সব কাজে। সংসারের কাজ সে নিয়ম মতই করিয়া যায় কিন্তু তাহাতে যেন আর গা নাই। নিজের সম্বন্ধেও সে উদাসীন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে অন্ধকার, সেজন্য সে মাথাও ঘামায় না—কোন মতে দিনটা কাটানোই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

রাত্রে অবশ্য তার ঘুম আসিতে চাহে না। ঘুমাইলেও সে সচকিত ভাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া ওঠে।

কিন্তু তাহাদের জীবনে এই যে গাঢ় ভয়াবহ ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, সত্যই ভূপতি কি তার হেতু ? হৃদয়হীন নির্বিকার মানুষ তো সংসারে বিরল নয়। তাহাদের সহিত ঘরকরা সুখের নয়, সহজও নয়, কিন্তু সম্ভব।

ভূপতির ভিতর কি নির্বিকার হৃদয়হীনতারও বেশি কিছু আছে!

বোঝা যায় না কিছুই। বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যে অদৃশ্য প্রাচীর পরস্পরের মধ্যে বিনতি সারাক্ষণ অনুভব করে, ভূপতির কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই বলিয়া মনে হয়।

বরাবর যেমন ছিল সে এখনও তেমনই আছে। বিনতির সহিত স্পষ্ট কোন দুর্ব্যবহার সে করে না। তাহাকে শাসন করেনা, তাহার সংসার পরিচালনার স্বাধীনতায় পর্যন্ত বাধা দেয় না এতটুকু।

স্ত্রীর সহিত সে যে আলাপ করে তাহাকে সহজ বলিয়া মনে হয়। কণ্ঠও তাহার একান্ত সরল।

'তোমার চুল যে সব উঠে যাচ্ছে।'

বিনতি ধোবার বাড়ির ফেরৎ কাপড়গুলো পাট করিয়া তোরঙ্গে তুলিতেছিল, উত্তর দেয় নাই।

ভূপতি আবার বলিয়াছে,—'কি ভাগ্যি তোমার কপাল ছোট। চওড়া কপালের ওপর চুল উঠে গেলে মেয়েদের ভারি খারাপ দেখায়।'

বিনতি এবার রুক্ষস্বরে বলিয়াছে—'পোড়াকপালে উঠ্‌লে দেখায় না।'

'তুমি আয়নায় দেখেছ?' ভূপতি হাসিয়া উঠিয়াছে।

'আয়নায় দেখবার দরকার নেই। আমি জানি।'

'তা হ'লেও চুল থাকলে পোড়াকপাল ঢাকা থাকে। কাল-ই একটা ভালো তেল আনতে হবে।'

কাপড়গুলো তুলিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া বিনতি বলিয়াছে—'দরকার নেই আমার। আমার চুল উঠ্‌লে ক্ষতি নেই।'

'একটু আছে যে। চুল সব উঠে গেলে সিঁথিতে যে সিঁদুর পড়বে না ঠিক মতো। সেটাও তো দরকার; কি বল?'

বিনতি চুপ করিয়াছিল।

ভূপতি আবার বলিল—'কালই একটা তেল আনবো।'

ভূপতি তাহার পরদিন একটা তেল লইয়া আসিয়া বলিল—'এই নাও, রোজ ঠিক মতো মেখো।'

মাথার তেলের শিশি এত ছোট দেখিয়া বিনতি না জিজ্ঞাসা করিয়া পারে নাই—'এত ছোট শিশি যে, এ তো একবার মাখ্‌লেই ফুরিয়ে যাবে।'

ভূপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'ওটা মাথার নয়, কপালে লাগাবার জন্যে। প'ড়ে দেখনা, পোড়া ঘায়ে ধন্বন্তরি ব'লে লিখেছে।'

অতীত যুগের সে নিরীহ লাজনম্র মেয়েটি কি করিত বলা যায় না, কিন্তু এখনকার বিনতি

নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারে নাই। একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সে সবলে শিশিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

মেঝের উপর ছড়ানো তেল ও কাঁচের ভাঙা টুকরার দিকে চাহিয়া ভূপতি শুধু বলিয়াছে—'তোমার হাতের তাগ নেই।'

তাহার কণ্ঠস্বরে এতটুকু বিস্ময় বা উত্তেজনার আভাষ নাই।

স্বামী স্ত্রীর আলাপ এমনি ধরণের। ভূপতি কোন দিন হয়ত সকাল বেলা খবরের [illegible] পড়িতে পড়িতে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলে,—'শুনে যাও।'

বিনতি কি একটা কাজে ভাঁড়ারে যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলে,—'কেন!'

'শুনে যাওনা।'

বিনতি কাছে আসিলে খবরের কাগজের একটা জায়গা তাহাকে দেখাইয়া ভূপতি বলে, পড়োনা, ভারি মজার খবর একটা।' 'আমার সময় নেই এখন।' বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ভূপতি হঠাৎ তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিয়া বলে,—'খুব আছে, এইটুকু পড়তে আর কতক্ষণ!'

বিনতি অগত্যা কাগজটা হেলাভাবে হাতে তুলিয়া লয়। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া ওঠে। নিঃশব্দে কাগজটা স্বামীর কোলের উপর নামাইয়া দিয়া কঠিন মুখে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে ভূপতি তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলে,—ভারি মজার 'না?"

বিনতি স্বামীর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলে—'হুঁ!'

'পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাস নেই। কিছুই আশ্চর্য নয় কি বলো?'

'না' বলিয়া বিনতি হাতটা ছাড়াইয়া এবার চলিয়া যায়।

ভূপতি তখনকার মতো আর কিছু [illegible] না। কিন্ত খাবার সময়, প্রথম ভাতের গ্রাস [illegible] তুলিতে গিয়া হঠাৎ নামাইয়া রাখিয়া বলে, 'এমনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে লোকটাও তো মুখে ভাত তুলতেছিল! সারাদিন খেটেখুটে হায়রাণ হ'য়ে এসেছে, ক্ষিদেয় সমস্ত অন্ধকার দেখছে। কেমন ক'রে বেচারা জানবে সেই অন্ধকারই খানিক বাদে চিরদিনের মতো নেমে আসবে। কেমন ক'রে জানবে তার জীবনের ওই শেষ গ্রাস।'

বিনতি বুঝি একটু শিহরিয়া ওঠে। সে দিকে একবার চাহিয়া ভূপতি বলিয়া যায় 'তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তখনও তার সামনে ব'সে, স্বামীর জন্য অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে সে এমন খাওয়ার আয়োজন ক'রেছে। ক্ষিদে শুধু মিটবে না,—জীবনের ক্ষিদে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কেমন ক'রে স্বামী সে গ্রাস মুখে তোলে তাকে দেখতে হবে তো!

ভূপতির মুখে একটু হাসির রেখা যেন দেখা দেয়। সে আবার বলে—'তার স্ত্রীর সেই

সাগ্রহে ব'সে থাকা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। অমন সে—কত দিন কত রাত আগেও বসেছে, কিন্তু এত আগ্রহ নিয়ে বোধ হয় না।'

হঠাৎ বিনতি সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভূপতিরও একটু পরিবর্তন বুঝি দেখা দিল। বিনতি কিছু না বলিলেও নিজে হইতে সে একদিন বাড়িতে একটি ঝি রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছে। একদিন অফিস ফেরৎ গোটাকতক রঙিন ছিটের কাপড় আনিয়া নিজেই বিনতিকে বলিয়াছে,—'সস্তা[illegible] পেয়ে গেলুম। বহর বড় কম, তবে ছোট পেনি কয়েকটা হ'তে পারে।'

বিনতি সন্তান-সম্ভবা। শরীর তাহার অত্যন্ত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। গায়ে যেন রক্ত নাই, হাত পা শীর্ণ।

সন্তান লাভের কামনায় আনন্দ হয়ত তাহারও আছে কিন্তু উৎসাহ নাই। উৎসাহ তাহার আর কিছুতেই নয়। হয়ত ইহা তাহার ক্লান্ত দুর্বল শরীরেরই প্রতিক্রিয়া, হয়ত তাহার চেয়েও বেশি কিছু। হয়ত ভাবী সন্তান সম্বন্ধেও তাহার আশঙ্কা আছে। ভূপতিরই ছায়া যদি তাহার মধ্যে দেখা দেয়! তেমনি অপরিচিত, ভয়ঙ্কর দূরত্ব যদি থাকে তাহার মধ্যে! মাতৃত্ব দিয়াও যদি তাহাকে আপন করা না যায়! বিনতি সে কথা ভাবিতে চায় না,—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।

ভূপতির চোখে মুখে কিন্তু কেমন যেন একটু উজ্জ্বলতা দেখা দিয়াছে। একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—'এই বিছানাটুকু পেতে এত হাঁপাচ্ছ কেন?'

বিনতি উত্তর দিল না। সে সত্যই ক্লান্ত, অত্যন্ত দুর্বল। [illegible] কোনো রকমে মনের জোরে, সে যেন খাড়া হইয়া কাজ করিয়া বেড়ায়, তাহার সমস্ত শরীর কিন্তু প্রতিবাদ করে। একবার [illegible]লে তাহার যেন আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় ঘুম যদি মৃত্যুর মতো গাঢ় হইয়া নামে তাহা হইলেও যেন আর কিছু আসে যায় না।

ভূপতির সন্তান যেন এখন হইতেই তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করিয়াছে।

তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি সে নির্মমভাবে শোষণ করিয়া লইবে।

ভূপতি একদিন হঠাৎ ডাক্তার ডাকিয়া আনিল নিজে হইতেই। বিনতি ডাক্তার দেখাইতে চায় না—কিন্তু তবু আপত্তি টিকিল না। ডাক্তার ওষুধপত্র লিখিয়া দিয়া গেল। সাবধানে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেল অনেক।

ভয়! ভয় একটু আছেই বই কি! ডাক্তার ভূপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে তাহাই বলিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর বিনতি অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া বলিল,—'ডাক্তার ডাকতে গেছলে কেন? আমি মরব না, ভয় নেই!'

ভূপতি উত্তর দিয়াছিল,—বলা যায় না, তুমি এখন তা পার।'

বিনতি মরে নাই, কিন্তু মৃত্যুর একেবারে প্রান্তে উপনীত হইয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে।

নিরাপদে ভালোভাবে প্রসব যাহাতে হয় সেজন্য ভূপতি স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছিল। সন্তান প্রসব করিবার পর বিনতির নিজের জীবনী লইয়াই অনেকক্ষণ টানাটানি চলিয়াছে। তাকে খানিকটা সামলাইবার পর ভূপতি স্ত্রীকে দেখিবার অনুমতি পাইয়াছিল। যে ডাক্তারের উপর বিনতির ওয়ার্ডের ভার ছিল তিনি বলিয়াছিলেন—'এ যাত্রায় খুব আপনার ভাগ্যি জোর মশাই। কেটে ছিঁড়ে ছেলেটাকে সময় মত না বার ক'রলে স্ত্রীকে আপনার বাঁচান যেতো না।'

অদ্ভুতভাবে ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া ভূপতি বলিয়াছে—'আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত!'

ডাক্তারই কেমন যেন বিব্রত হইয়া গিয়া বলিয়াছেন—'না ধন্যবাদ কিসের! এ তো আমাদের কর্তব্য!'

'কর্তব্যই ক'জন বোঝে।' বলিয়া ভূপতি একটু হাসিয়াছে।

বিনতির ঘরে ঢুকিবার সময়ও বুঝি তাহার মুখে সেই হাসিটুকু লাগিয়াছিল। শুভ্র শয্যার সঙ্গে একেবারে যেন মিশাইয়া বিনতির দেহ পড়িয়া আছে। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। শীর্ণ মুখটুকু চাদরের মতই বিবর্ণ।

কিন্তু ভূপতি গিয়া কাছে দাঁড়াইতে তাহার চোখে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অর্থ [illegible] বলিয়া [illegible] পারা যাইত কিন্তু তাহার সহিত দৃপ্ত অবজ্ঞা [illegible]নিত ঝিলিক কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর দ্বার হইতে বিনতি কি ইহাই [illegible] করিয়া আনিল।

ভূপতি পাশের চেয়ারে বসে নাই। খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়াছে—'আবার তো ফিরে যেতে হবে।'

'তাই তো ভাবছি।' বিনতির স্বর অস্ফুট—কিন্তু তবু অসাধারণ তীক্ষ্ণতা তাহাতে।

হাসপাতাল হইতে বিনতিকে তাড়াতাড়ি ছাড়িতে চাহে নাই। তাহার বিপদ না কাটিলে তাহাকে ছাড়িতে পারে না জানাইয়াছে। কিন্তু ভূপতি জেদ করিয়া সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে নানারকম চেষ্টা চরিত্র করিয়া বাড়িতে লইয়া আসিয়াছে।

সেই ডাক্তার বলিয়াছিলেন—'আপনি ভুল ক'রেছেন মশাই। স্নেহ ভালবাসা বড় জিনিস কিন্তু রোগ, হাসপাতালের এই হৃদয়হীন কলের মতো সেবাতেই সারে। আর ক'টা দিন রাখলেই তো আর ভয় থাক্‌ত না।'

ভূপতি অদ্ভুত উত্তর দিয়াছিল—'আপনাদের সব কথা যদি বিশ্বাস ক'রতে পারতাম!'

কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়া দিন দিন আশ্চর্যভাবে বিনতি সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকে এমন তুচ্ছ করিবার জোর সে কোথায় পাইল। কে জানে? তাহার চোখে যে শাণিত অবজ্ঞা আজকাল উদ্ধত হইয়া আছে তাহাতেই কি তাহার সেই গোপন নূতনলব্ধ, শক্তির ইঙ্গিত আছে!

স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তা বন্ধ হইয়াছে মাত্র কয়েক দিন! ব্যাপারটা বোধহয় এমন কিছু নয়। ভূপতি অফিস হইতে ফিরিয়া জামা কাপড় না ছাড়িয়াই বলিয়াছে, 'শীগ্‌গীর তৈরি হ'য়ে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।'

অত্যন্ত অস্বাভাবিক আদেশ। গত দুই বৎসর স্বামীর সঙ্গে হাসপাতালে ছাড়া আর সে কোথাও গিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

বিনতি একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলিয়াছে—'কোথায়?"

'বায়স্কোপের দুটো পাশ পেয়ে গেলাম এমনি পয়সা দিয়ে তো আর হবে না। চল দেখেই আসি।'

'তুমিই দেখে এস!' বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ভূপতি দরজা আগলাইয়া বলিয়াছে—'কেন, তুমি যাবে না কেন! আমার সঙ্গে যেতে কি ভয় করে নাকি?'

বিনতি হাসিয়াছে একটু। আজকাল সে হাসে। বলিয়াছে—'ঘরেই যখন কাটাতে পারলাম এতদিন, তখন বেরুতে আর ভয় কিসের?

ভূপতি তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছে—'তাহলে চলো না!'

'আচ্ছা চলই।'

একবার ট্রাম বদল করিয়া আর একটা ট্রামে উঠিবার সময় বিনতি বলিয়াছে 'কাছাকাছি বুঝি বায়স্কোপ ছিল না।'

'ছিল, কিন্তু অমনি দেখবার পাশ ছিল না—।'

সিনেমা সত্যই সহরের আর এক প্রান্তে। ভূপতি সেখানে গিয়া স্ত্রীকে উপরে মেয়েদের সীটে উঠাইয়া দিয়াছে। বিনতি একবার বলিয়াছিল—'এক সঙ্গে বসলেও তো ক্ষতি ছিল না।'

'না নীচে বড় ভীড়, কষ্ট পাবে।'

বিনতি অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া সিনেমার ঝির সঙ্গে উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

ভূপতি তারপর কি করিত বলা যায় না—কিন্তু পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, লোকটা হাসিয়া বলিল—'সখ তো মন্দ নয়, এতদূর এসেছিস্ বৌকে বায়স্কোপ দেখাতে?'

তাহ'লে আর সখ কিসের! বলিয়া ভূপতি নিজেও বায়স্কোপ হলে গিয়া ঢুকিয়াছে। বন্ধুটিও পাশেই বসিয়াছিল। সে একবার ভূপতিকে চিমটি কাটিয়া বলিয়াছে—অত ঘনঘন ওপরে তাকাসনি। তোর বৌ পালিয়ে যাবে না।

ভূপতি যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া বলিয়াছে,—'না, না, ভারি লাজুক ঠিক মতো জায়গা পেল কিনা দেখ্‌ছিলুম্।'

বায়স্কোপ আরম্ভ হইবার খানিক পরেই কিন্তু উস্‌খুস করিতে করিতে হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িয়াছে।

'আবার কি হ'ল?' বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

'কিছু না আমি আস্‌ছি।'

বন্ধু হাসিয়া বলিয়াছে 'বুঝেছি! এমন বায়স্কোপ দেখান কেন? ঘরে শিক্‌লি দিয়ে থাকলেই পারতিস্।'

ভূপতি আর কোন কথা বলে নাই। তাড়াতাড়ি হল হইতে বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সিতে সটান উঠিয়া বসিয়া একদিকে চালাইতে বলিয়াছে।

ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট পড়িবার পরও ড্রাইভারকে হুইল ধরিয়া থামিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্ত মুখে ভূপতি কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সে কথা আর বলা হয় নাই। ট্যাক্সি চালকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দরজা নিজেই খুলিয়া ধরিয়া, হাসি মুখে সে বলিয়াছে—এসো, ঠিক সময়ে এসে পড়েছো—'

বিনতি ভিতরে উঠিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়াছে—হ্যাঁ তোমায় বেরুতে দেখলাম যে।

'লক্ষ্য করছিলে বুঝি।'

'তা করছিলাম।'

খানিকক্ষণ আর কোন কথা নাই। বিনতি হঠাৎ বলিল,—'তুমি এমন কাঁচা কাজ ক'রবে ভাবিনি। তোমায় দেখ্‌তে না পেলেও কিছু আসত যেত না। আমি বাড়ির ঠিকানা জানি। তোমার নামটাও বল্‌তে পারতাম লোককে! এক সঙ্গে এমন ক'রে না হয়, একটু বাদেই গিয়ে উঠতাম। সব দিক ভেবে বোধ হয় কাজটা করো নি?'

'না সবই ভেবেছিলাম। মনের ঘেন্নায় তুমিতো নাও ফিরতে পারতে, সেইটের ওপর জোর দিয়েই যা ভুল করেছিলাম।'

'মনের ঘেন্নায় মানুষ কি ক'রতে পারে, কেউ জানে কি?' বিনতির সেই বুঝি শেষ কথা। তাহার পর ট্যাক্সিতেই তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে নিঃশব্দে। মৃত্যুর মতো সে নিঃশব্দতা সমস্ত সংসার এখনও ভারাক্রান্ত করিয়া আছে।

অন্যান্য কথা হয় তো তাহারা আবার কহিবে, সংসারের প্রয়োজনে, পরস্পরকে আঘাত করিবার অদম্য প্রেরণায়, কিন্তু তবু অন্তরের এ নিঃশব্দতার ভার ঘুচিবার নয়, জীবনের একটি মাত্র বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য এ নিঃশব্দতার নির্বাসন তাহাদের নিঃসঙ্গ আত্মা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লইয়াছে।

তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ, ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িতেও চায় না। ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল, জীবনের কি আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।

পুন্নাম

অসুখ আর কিছুতেই সারে না।

কাশি সর্দি সারে তো খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ফেঁপে।—তারপর জ্বাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে তো চলেইছে।

প্যাকাটির মতো সরু চারটে হাত পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি শুধু জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে' সে চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো।

শিশুর চোখ সে নয়—জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।

সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক এক সময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে বলে, 'মর্‌না, মর্‌লে যে হাড় জুড়োয় আমার।'

শিশু আরো জোরে নিশীথ গগন বিদীর্ণ করবার আয়োজন করে। পাশের বিছানায় ললিত একবার পাশ ফিরে শোয়, একটু ছট্‌ফট্‌ করে কিন্তু কিছু বলে না। আগে অনেকবার স্ত্রীকে সে এই নিয়ে ধমকেছে। দুজনের এই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু আজকাল আর কিছু বল্‌তে পারে না। ছবির এই আকস্মিক অসহিষ্ণুতার পেছনে কি বিপুল বেদনা, হতাশ ও ক্লান্তির ভার যে আছে তা সে বোঝে। কিন্তু তবু বুকটা যেন টন্‌ টন্‌ ক'রে ওঠে।

কিন্তু উপায় নেই। ডকের মাল-তোলা ও নাবানোর সামান্য সরকার। জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দুপয়সা আসে। নইলে নিছক বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

শিশু আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে—সে চীৎকার আর থামতে চায় না। সে চীৎকারে বেদনা নেই—আছে শুধু যেন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হ'য়ে নানা রকম ক'রে ভোলাতে চেষ্টা করে ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল

কিনা। নিজের দু'চোখ সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তিতে ঘুমে জড়িয়ে আসে। কিন্তু শিশু কিছুতেই থামে না। আদর নয়, খেলনা নয়, খাবার নয়, কিছু সে চায় না। শুধু তার অন্তরের অসীম বিদ্বেষ কান্নার আকারে উথ্‌লে ওঠে। কান্না নয়—সে সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ!

ললিত ঘুমের ভাণ ক'রে প'ড়ে থাকে আর ভাবে হয়তো।

জীবনের অন্ধ নিষ্ঠুরতারতার কথা ভাবে না, নিজের বিপুল ব্যর্থতার কথা ভাবে না—দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসা করবার চেষ্টা করে না—ভাবে শুধু ডাক্তার বলেছে, ও ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে না গেলে চলবে না—কিন্তু সে কেমন ক'রে সম্ভব।

শুনতে পায় ছবি কি কাতর ভাবে কত রকম আদর ক'রে শিশুকে ভোলাবার চেষ্টা করছে।

লখ্‌খি বাবা আমার কাঁদে না; কাল তোমাকে একটা লাল মটর গাড়ি কিনে দেব, তুমি ব'সে ব'সে চালাবে—'

শিশুর সেই একঘেয়ে অশ্রান্ত চীৎকার—'কেন তুমি আমায় মারলে—'

ছবি আবার আদর ক'রে কোলে নেবার চেষ্টা করে—'শোন না; তুমি মটর গাড়িতে ব'সে ভোঁ ভোঁ ক'রে হর্ন বাজাবে।'

শিশু হাত-পা ছুঁড়ে মাকে ঠেলে দিয়ে—সেই একঘেয়ে সুর ধ'রে থাকে—'কেন তুমি আমায় মারলে?—'

হঠাৎ ললিতের মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত হাস্যকর—পরিণত মনের এই শিশু সেজে তাকে ভোলাবার চেষ্টা, শিশুর এই মূঢ় স্বার্থপরতা, এর চেয়ে বিসদৃশ যেন আর কিছু হ'তে পারে না।

পরক্ষণেই সে নিজের এই মনে হওয়ার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় ছবির সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শুষ্কমুখ, নিদ্রাবঞ্চিত কাতর দুটি চোখ দেখতে পায়। মনের এই অসঙ্গত আচরণে নিজের ওপরই তার রাগ হয়।

তাদের দিকে পেছন ফিরে লক্ষ্যহীন ভাবে সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আবার ভাবতে সুরু করে,—বিশৃঙ্খল অসম্বদ্ধ ভাবনা।

না, বিয়ে ক'রে সে অন্যায় কিছু করেনি। করেছে কি? না কখ্‌খনো না! ভগ্নিপতির বাড়িতে আশ্রিত হ'য়ে থেকে সামান্য পড়াশুনা শেষ ক'রেই তাকে কাজে ঢুকতে হয়েছে, ভগ্নিপতির আশ্রয়দানের ঋণশোধ ক'রতে বিয়ে তো সে ক'রবে নাই ঠিক করেছিল। আর সেজন্যে কারুর কোনো চাড় ছিল ব'লেও বোধহয় না। বাংলা দেশের পুরুষ সাধারণতঃ যে বয়সে বিয়ে করে তা পেরিয়ে যাবার পরও তার সংকল্প অটুট ছিল কিন্তু টলেনি এমন কথা বলা যায় না। মনে মনে যেন একটা বিপুল অতৃপ্তি দিন রাত তাকে পীড়া দিয়েছে। বিয়ে,—পরিপূর্ণ জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। চিরকৌমার্যের গৌরবে মন তার কোনদিন উল্লসিত হ'য়ে আত্মপ্রসাদ

লাভ করেনি, কেবলি অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে এই একক জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু। দারিদ্র্যের কথা সে ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু মন তার বরাবর বিদ্রোহ ক'রে বলেছে মানুষের দেওয়া দারিদ্র্যের জন্যে জীবনকে নিষ্ফল ক'রে রাখবার কোনো অধিকার তার নেই।

চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পায় শিশু সেই গোঁ ধ'রে চীৎকার করছে 'কেন তুমি আমায় মারলে ?'

কিন্তু কোথায় চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া যায়! ললিত সম্ভব অসম্ভব অনেক জায়গার কথা ভাবে। টাকারও দরকার। ছবির গয়নার আর কিছু নেই, শুধু দু'গাছি বালা—হাতে থাকলে ক্ষয়ে যাবার ভয়ে তোলা আছে। তার দাম কতই বা হবে! বড় জোর এক'শ টাকা। তাই নিয়ে কোথায়ই বা চেঞ্জে যাওয়া যায় এবং কদিনই বা থাকা যায়। এসব ব্যাপার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কিন্তু শিশুর চীৎকার যে কিছুতেই থামতে চায় না। ললিত হঠাৎ উঠে বসে। ছবি একেবারে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে ওই চীৎকারের মাঝেই বসে বসে একটু ঢুলছিল। ললিতের ওঠার শব্দে সে চমকে সজাগ হ'য়ে ওঠে; তারপর কান্নার ওপরেই ছেলেটার পিঠে সজোরে চাপড় মেরে বলে, 'হোল তো! সকলের ঘুম ভাঙালে তো—কোথা থেকে এমন রাক্ষস এসেছিল আমার পেটে।'

ললিত এবার ব্যথিত হ'য়ে বলে, 'আঃ, আবার মার কেন ?'

'না মারবে না! রাতদুপুরে ডাকাত-পড়া চীৎকার ক'রে পাড়াশুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙালে গা!'

'অসুখে ভুগে ভুগেই না অমন খিটখিটে হয়েছে' ব'লে ললিত শিশুকে কোলে নেবার চেষ্টা করে। শিশু কিছুতেই কোলে আসতে চায় না। সজোরে ছবির আঁচল মুঠিতে চেপে ধ'রে আরো জোরে চীৎকার সুরু করে।

ঝটকা দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে ছবি উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'তা মরুক না! মরলেও যে বাঁচি!'

'ছিঃ, কি বলছ ছবি!'

এবার ছবি কেঁদে ফেলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'বলব আবার কি! ও যে বাঁচতে আসেনি সে কি আর আমি বুঝতে পারিনি। এমনি ক'রে ভুগে ভুগিয়ে, হাড়মাস খাক্ ক'রে ও যাবে।'

ছবি ললিতের দিকে পিছন ফিরে বোধহয় আঁচলে চোখ মোছে।

শিশু শীর্ণ রক্তহীন হাত বাড়িয়ে ললিতের কোল থেকে 'মার কাছে যাবো, ব'লে অশ্রান্তভাবে চীৎকার করে।

'ডাক্তার তো বলেছে' চেঞ্জে নিয়ে গেলেই সারবে,' ললিতের মুখ থেকে কথাগুলো ঠিক আশ্বাসের সুরে যেন বেরুতে চায় না। ও আশায় নিজেই যে বিশ্বাস হারিয়েছে।

ছবি উত্তর দেয় না। ছেলেটাকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে বিছানায় জোর ক'রে শুইয়ে ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ কর শিগগীর, ফের চীৎকার ক'রলে দরজা খুলে ওই রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসবো।' তারপর নিজে তার পাশে শুয়ে পড়ে স্বামীকে বলে, 'তুমি শোওনা গিয়ে। এমন ক'রে সারারাত জাগলে চল্‌বে ? সারাদিন অফিসে খাটবে আর সারারাত ছেলের জ্বালায় দু-চোখের পাতা এক ক'রতে পারবে না, এমন করলে শরীর টেঁকে!'

ললিত এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বলে, 'তুমি তো একটু ঘুমোতে পেলে না।'

'আমি তো এই শুয়েছি, এইবার ঘুমোব।'

কিন্তু ঘুমোন তার হয় না। শিশু এবার নতুন বায়না ধরে। একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে মাকে বলে, 'তুমি শুলে কেন? এখানে ব'স না।'

নির্দিষ্ট সেই স্থানটিতে ছবিকে বসতেই হবে। ছবি আদর করে, ধমক দেয়, মিনতি ক'রে বলে, 'লক্ষ্মী বাবা, বড্ড ঘুম পেয়েছে একটুখানি শুই, আচ্ছা এই খান্‌টাতে শুচ্ছি—এবার তো হ'ল!' কিন্তু তাতে হয় না। সেই খান্‌টাতে শুলে হবে না, বসতে হবে।

শিশুর সেই এক পণ, 'শুলে কেন, এই খান্‌টাতে ব'স না।'

শুয়ে শুয়ে ললিতের অসহ্য বোধ হয়। আবার উঠে বসে বলে, 'ওকে নিয়ে একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসব?'

ছবি বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, 'তুমি আবার উঠলে কেন বল তো?'

'ওর বায়না যে কিছুতেই থামছে না!'

'তাই জন্যে রাত দুপুরে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে। তুমি শোও দেখি।'

ললিত হতাশ হ'য়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিদ্রালস চোখ দুহাতে রগড়ে, নির্দিষ্ট যায়গায় ব'সে ছবি শিশুর বায়না নিবৃত্ত করে।

ললিত স্ত্রীর সে শ্রান্ত অবসন্ন মূর্তির দিকে চাইতে পারে না। পেছন ফিরে শুয়ে মনে মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।

তারপর কখন বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসে। কিন্তু খানিক বাদেই শিশুর চীৎকারে তন্দ্রা ভেঙে যায়। উঠে দেখে, বসে থাকতে থাকতেই কখন আর না-পেরে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে ছবির মাথাটা কাৎ হ'য়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। এবং শিশু পা দিয়ে ঠেলে, হাত ধরে টেনে, নানা প্রকারে তাকে জাগাবার চেষ্টা ক'রে চীৎকার ক'রে কাঁদছে,—'তুমি শুলে কেন! এইখানে ব'স না।'

অমনি চলে এসেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!

টিনের চালের একটি বড় ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি নীচু রান্না-ঘর আর এক ফালি সরু উঠোন—এই নিয়ে সংসার। কলতলার পাশে একটা নামহীন বুনো গাছ বেড়ে উঠেছে; অসময়ে শীতকালে তাতে অপরিচিত অজস্র ফুল ধরে; তার না আছে গন্ধ, না আছে রূপ। তবু সেইটুকুই শোভা।

ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।

এই ছোট সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্ত

ভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত হ'তে আবার নতুন দিনে।—মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অমানুষিক কৃচ্ছ্র-সাধনার অসামান্য আত্ম-বলিদানের কাহিনীর ধারা!

হয় তো বিধাতারও চমক্ লাগে!

ললিত কিন্তু নিজেকে অন্য রকম বোঝায়। তার কাছে অপরিস্ফুট ভাবে এ-সব শুধু আনন্দের ঋণ-শোধ, মনুষ্যত্বের গৌরবের মূল্যদান। তার বেশি কিছু নয়। জীবন শুধু মন্থর স্রোতে হাল্কা নৌকোর মতো অত্যন্ত সহজে ভেসে যাবে ভেবে তো সে বিয়ে করেনি। জীবনের অগ্নি-পরীক্ষা, বিবাহের দায়িত্ব অনেক কথাই সে যে আগে ভেবেছে।

তবু ঋণ যেন আর শোধ হ'তে চায় না! ছবির দিকে সে ভাল ক'রে আজকাল চাইতে পারে না। গলার কণ্ঠি দেখা যায়, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। পরিশ্রমে দুর্ভাবনায় উনিশ বছরের মেয়ের মুখে যেন উনপঞ্চাশ বছরের ক্লান্তি! খোকা তো দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার সেদিন হঠাৎ একবার নিজে থেকে এসেছিল। গাড়ি থামিয়ে দরজার কাছে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে ওয়েস্টকোটের দু'পকেটে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে একটু সামনে ঝুঁকে, পরম আত্মীয়ের মতো স্নিগ্ধ অনুযোগের কণ্ঠে ব'লে গেল, 'আপনারা এখনো চেঞ্জে নিয়ে যাননি! না আপনারা ছেলেটাকে বাঁচতে দিলেন না দেখছি!'

ডাক্তার যেতে ললিত বল্লে, 'কিন্তু ডাক্তার আমাদের একটু ভালবাসে দেখেছ ছবি? ঠিক ব্যবসাদারি আমাদের সঙ্গে করে না। না?'

ডাক্তারের সহৃদয়তার আলোচনায় খানিকটা সময় বেশ কাটলো। ললিত মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলে, দু'এক দিনের মধ্যে যা-হোক ক'রে টাকার জোগাড় সে ক'রবেই। ছবি অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু স্ফূর্তিভরে 'কলের জল বুঝি যাবার সময় হ'ল', ব'লে কাজে গেল। সমস্ত সংসারের ওপর যে বেদনার গুরুভার চেপেছিল, সেটা যেন অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল সামান্য একটি মাত্র ক্ষণিকের অভিনয়ে।

কিন্তু সে কতক্ষণ আর!

আবার রাত্রি আসে। ললিত শ্রান্ত হতাশ হ'য়ে ঘরে ফেরে। শিশু নিয়মিত বায়না ধরে। মার আঁচল চেপে শুয়ে থাকে, মাকে সে ছেড়ে দেবে না।

'রান্না-বান্না কিছু ক'রতে হবে না আমার! এমনি বসে থাকলে চলবে?'—

ছবি জোর ক'রে চলে যাবার চেষ্টা করে।

শিশুর কান্নায় কাতর হ'য়ে ললিত বলে, 'থাক্ না, আমি না হয় যা হোক বাজার থেকে কিছু কিনে আন্‌ছি। তুমি ব'স ওর কাছে।'

'হ্যাঁ, এই জল-কাদায় অফিস থেকে ত্র'কোশ পথ হেঁটে এলে, আবার এখনি যাবে বাজারে। ছেলের অত আদরে কাজ নেই! আর বাজারের খাবার তোমার সয় কোনো দিন ?'

'একদিন খেলে কিছু হবে না! আর তুমিও একদিন জিরোও না।' ললিত যেন অনুনয় করে।

'না না, আমি রাঁধিতে যাচ্ছি। এই বৃষ্টিতে বাজারে যেতে হবে না।' ছবি জোর ক'রে উঠে পড়ে। শিশু কেঁদে হাত-পা ছুঁড়ে একাকার ক'রে তোলে।

ললিত আর কথা না ক'য়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, পথ কাদায় কাদা। পায়ে পায়ে জুতো সে কাদায় বসে যায়; ললিতের শ্রান্ত পা যেন কাদা থেকে উঠ্‌তে চায় না।

ওই রুগ্ন পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র ক'রে এই ছোট সংসারটি ক্লান্ত পদে পরম দুঃখের ভার বহন করে নিঃশব্দে আবর্তন করে।

শিশুর অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতার কাছে অহরহ বলিদান চলে।

ললিত ভাবে,—শিশু, ভবিষ্যৎ মানব সে, সে যে সব কিছু দাবি ক'রতে পারে—কোন ত্যাগই তার জন্যে যে যথেষ্ট নয়।

ডাক্তার আর একদিন এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছে—এবার আর সহৃদয়তার সুরে নয়, মুরুব্বিয়ানার চালে; চেয়ারে আলগোছে ব'সে কোলের ওপর টুপি খুলে ডান হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে, কোমরে বাঁ-হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে অনেক কথা বলে গেছে,—শিশুকে সংসারে আনবার দায়িত্বের কথা, ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যের কথা, ইত্যাদি।

যাবার সময় মটরে উঠেও মুখ বার ক'রে বলেছে—'দেখুন, এমন ক'রে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিৎ—ঠিক বলুন জেল হওয়া উচিৎ নয় ?'

ললিত তেমনি অফিসে যায়-আসে, কিন্তু তার মুখ যেন কঠিন হ'য়ে গেছে পাথরের মুখের মতো। তার মনের গোপনে কি সংকল্প জন্ম নিয়েছে কে জানে !

খোকা সেরে উঠ্‌ছে। স্পষ্ট সেরে উঠ্‌ছে। খোলা বারান্দায় ডেক চেয়ারে ব'সে ব'সে ললিত খোকার খেলা দেখে। ছবি চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিন্তু কি সুন্দর জায়গা বাপু, যেন আর কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না আমার।' তারপর মুখ নামিয়ে ললিতের কাণের কাছে চুপি চুপি আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলে, 'দেখ, কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত ত্রটো টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌ল।'

রাঙামাটির দেশের রং যেন ছবিরও গালে লেগেছে : শালবনের সজীবতা যেন তার সারা দেহে ঝল্‌মল্‌ করে।

ললিত তার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চায়, তারপর নীরবে কি যেন ভাবে।

ছবি খানিক বাদে হেঁকে বলে, 'ছি খোকা, ছেড়ে দাও, ওর লাগবে।'

খোকা তখন খেলার সাথীটির ঘাড়ের ওপর চেপে তার মাথাটা মাটিতে ঠোকবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

অগত্যা ললিত উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

উৎপীড়িত ছেলেটি কিন্তু ধুলোমাখা মাথায় উঠে একটুও না কেঁদে ঈষৎ ম্লান হেসে মধুর কণ্ঠে বলে, 'দেখুন তো কাকাবাবু, আমি কি ওকে ঘাড়ে ক'রতে পারি!'

নিজের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীর এই সুশ্রী সুন্দর মধুরকণ্ঠ ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা ক'রে হঠাৎ ললিত মনে মনে অকারণে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে।

ছেলেটি রোগা, মাথায় রেশমের মতো কোমল একমাথা দীর্ঘ চুল, নীল চোখ দুটিতে, ছোট্ট মুখে, ম্লান হাসিটি যেন লেগেই আছে।

ললিত খোকার কান ধরে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন ওর মাথা মাটিতে ঠুকে দিচ্ছিলে? ঝগড়া না ক'রে থাকতে পার না?'

খোকা মুখচোখ রাঙা ক'রে নীরব হ'য়ে থাকে। অপর ছেলেটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, 'না ঝগড়া হয়নি তো! ও ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বল্‌লে কিনা, তাই আমি ওকে তুলতে পারিনি ব'লে—আমার মাথাটা একবার মাটিতে ঠুকে দিয়েছিল। আমার তো লাগেনি!

না, ওর গায়ে কখ্‌খনো হাত তুলো না' ব'লে খোকাকে ধম্‌কে ললিত আবার ফিরে এসে বারান্দায় বসে।

ছবি একবার বলে. 'খোকার সঙ্গে ওদের টুনু কিন্তু পারে না।' তারপর ললিতের গম্ভীর মুখ দেখে চুপ ক'রে যায়।

খোকা ও টুনুর খেলা কিন্তু জমে না। টুনুর সমস্ত সাধা-সাধনা, মিনতি, অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে খোকা ক্রুদ্ধ মুখে গুম হ'য়ে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ অকারণে প্রাণপণ শক্তিতে টুনুকে চিম্‌টি কেটে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

টুনু ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

ছবি গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে খোকাকে বক্‌তে সুরু করে।

শুধু ললিত চেয়ার থেকে ওঠে না, সমস্ত মুখ তার অকস্মাৎ বেদনায় কালো হ'য়ে যায়। টুনু শান্ত হ'য়ে খানিক বাদে যখন এসে বলে, 'কাকাবাবু, খোকা আমায় মেরেছে, আর আমি খেলতে আসব না'। তখন পর্যন্ত ললিত কথা কয় না, সামনের দিকে চেয়ে নীরবে কি ভাবে সেই জানে।

টুনু কিন্তু বিকালবেলা আবার এল।

খোকাকে নিয়ে তখন ললিত একটু লেখাপড়ার চেষ্টা করছে; এবং আধঘণ্টা পরিশ্রমেও শ্লেটের ওপর খোকাকে দিয়ে অকারের যৎসামান্য সাদৃশ্যেরও কোনো অক্ষর লেখাতে না পেরে হতাশ হ'য়ে উঠেছে।

টুনু এসে একপাশটিতে চুপ ক'রে বসলো। ললিত বল্‌লে, 'তুমি 'অ' লিখতে পার টুনু?'

এক গাল হেসে টুনু বল্‌লে, 'পারি কাকাবাবু, আমি বোধোদয় থেকে টানাও লিখতে পারি! লিখবো কাকাবাবু?'

অবাক হ'য়ে ললিত বল্‌লে, 'তুমি বোধোদয় পড়?'

'বোধোদয় আমার শেষ হ'য়ে গেছে। 'অ' লিখে দেখাবো কাকাবাবু', ব'লে আগ্রহ ভরে টুনু শ্লেটের দিকে হাত বাড়ালো।

খোকা কিন্তু শ্লেট দিলে না। দৃঢ় মুঠিতে শ্লেট আঁকড়ে ধ'রে রইল।

'ওকে শ্লেটটা দিতে বলুন না কাকাবাবু'—টুনু অনুনয় ক'রে বল্‌লে, 'আমি খুব ভাল ক'রে 'অ' লিখে দেখাবো।'

হঠাৎ কঠিন স্বরে ললিত বল্‌লে, 'থাক্, তোমায় লিখতে হবে না, ও এখন পড়ছে, এখন তুমি বাড়ি যাও।'

টুনু অপ্রত্যাশিত কঠিন স্বরে ভীত হ'য়ে মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

ললিত কিন্তু আর এক মুহূর্তও ব'সে থাকতে পারলে না; টুনু যেতে না যেতে সে গম্ভীর মুখে উঠে বেরিয়ে গেল।

দেখা হ'তে ছবি জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'আজ এরি মধ্যে পড়াশোনা হ'য়ে গেল? বাবা! ওকে নিয়ে তুমি যে রকম উঠে প'ড়ে লেগেছ, জজ মেজিষ্টের না ক'রে আর ছাড়বে না!'

গম্ভীর মুখে ললিত শুধু বল্‌লে, 'হুঁ।'

দু'দিন টুনু আর আসে না। ললিতের লজ্জা গ্লানি ও অনুশোচনার আর অন্ত নেই। খোকাকে নিয়ে একবার তাদের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েও সে মাঝপথ থেকে ফিরে এলো। নিজের কাছে নিজের মাথা তার চিরকালের জন্যে যেন হেঁট হ'য়ে গেছে।

পরদিন হঠাৎ সকালে বাইরের গেটের কাছে বেরিয়েই সে চমকে ডাকলে 'টুনু!'

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে টুনু উৎসুকদৃষ্টিতে ভেতরের দিকে চাইছিল। ললিতকে দেখতে পেয়ে সে ভীত কুণ্ঠিতভাবে চ'লে যাবার উপক্রম ক'রলে।

'তুমি আর খোকার সঙ্গে খেলতে আসনা কেন টুনু?'

সাদর সম্ভাষণে ভরসা পেয়ে টুনু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে, 'আপনি তা হ'লে বকবেন না তো কাকাবাবু?'

অকারণেই ললিতের চোখ অশ্রু-সজল হ'য়ে উঠ্‌ল। এই ক্ষীণকায় ফুলের মতো কমনীয় ছেলেটির সমস্ত কথাবার্তা, আচরণে এমন একটি সকরুণ ভাব আছে!

তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ললাটে চুমু খেয়ে ললিত বল্‌লে, 'না বাবা আমি কেনো তোমায় বোকবো!'

টুনুর মুখ তৎক্ষণাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল—বল্‌লে, 'আমি খেলতে যাই তাহ'লে!'

তাকে নামিয়ে দিয়ে ললিত বল্‌লে, 'যাও।'

টুনু উল্লসিত হ'য়ে ছুটে গেল।

দু'দিন বাদে আজ প্রথম প্রসন্ন মনে ললিত বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে সে প্রসন্নতা তার রইল না।

দরজার কাছ থেকেই খোকার উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল।

'না, ওকে দুটো দিতে পারবে না মা! কেন, ও নিজের বাড়িতে গিয়ে খে[illegible]রে না? হ্যাংলা কোথাকার!'

লজ্জায়, বেদনায়, রাগে ললিতের কান পর্যন্ত রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। হিংসার এ জঘন্য রূপ ওইটুকু শিশুর মাঝে প্রকাশ পেল কোথা থেকে ভাবতে ভাবতে নিঃশব্দে সে আপনা[illegible] ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সেখান থেকে শুনতে পেল ছবি বোঝাবার চেষ্টা করছে—'না বাবা, ওরকম হিংসু[illegible]পনা কি ক'রতে আছে, ও তোমার ভাই হয়; ও দুটো থাক্, তুমিও দুটো খাও।'

টুনুর মিষ্টি গলা শোনা গেল—'আমি তো দুটো সন্দেশ খাব না কাকিমা; আ[illegible]র অসুখ করেছে কি না, আমি একটুখানি খাব শুধু!'

'আচ্ছা বাবা, তুমি একটা নাও, আর খোকন্ এই তোমার দুটো, কেমন হ'ল তো[illegible]

কিন্তু এও খোকার মনঃপূত নয়।

'না, ওকে একটাও দিতে পারবে না. ওকে দা ও না দেখি, আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নেব।'

ছবি এবার রেগে বল্‌লে, 'কেড়ে নে না দেখি! তুই তো দুটো পেয়েছিস! ও একটা খেলে তোর অত হিংসে কেন?'

'কেন ও আমাদের বাড়ি খাবে! বাবা তো তাড়িয়ে দিয়েছিল, ও আবার এসেছে কেন?'

'বেশ ক'রবে আসবে, বেশ ক'রবে খাবে!'

ব্যাপারটা হয় তো সামান্য। কিন্তু ঘরে ব'সে ব'সে শুনতে শুনতে ললিতের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তার জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সান্ত্বনা কে যেন মাড়িয়ে থেঁৎলে চলে গেছে।

সে নীরবে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

ছবি তখন টুনুর হাতে একটি সন্দেশ দিয়েছে। টুনু বল্‌ছিল, 'আমি তো সবটা খাব না কাকিমা—আমার বড্ড অসুখ করেছে কিনা! আমার তো খেতে নেই।'

কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই খোকা সজোরে তার হাত মুচ্ড়ে সন্দেশটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে, 'ইস্, সন্দেশ ওকে খেতে দিচ্ছি কিনা।'

হাতের ব্যথায় টুনু কাতর হ'য়ে কেঁদে উঠল।

ছবি রেগে খোকার পিঠে চড় বসিয়ে দিলে।

ললিত যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

ছবি এসে বল্‌লে 'আহা ওদের টুনুর বড্ড অসুখ গো!'

ললিত সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় বসেছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'কার, টুনুর?'

'হ্যাঁগো, ওর মা তাই কাঁদছিল, ছেলেটা এমন ভালো জায়গায় এসেও সা[illegible] না। দিন দিন যেন কেমন শুকিয়ে গেল।'

ললিত আবার মুখ ফিরিয়ে নীরবে দূরে অন্ধকার গিরিশ্রেণীর দিকেই বো[illegible] হয় চেয়ে রইল।

ছবি ঘরে যাবার উদ্যোগ ক'রতে কিন্তু ললিত হঠাৎ আঁচল ধরে টেনে [illegible]লে, 'শোন!'

'কি?' ব'লে ছবি কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ!

'কি বল্‌বে তাড়াতাড়ি বল বাপু, আমার কাজ আছে!'

চেয়ারটা ছবির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব'সে ললিত বল্‌লে, 'খোকা [illegible] বেশ সেরে গেছে, না ছবি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহ'লে তুমি খুব খুশি হয়েছ তো?'

'কি যে কথা বল তার মাথা মুণ্ডু নেই, একি আবার জিজ্ঞেস করে নাকি মানুষ! আমি খুশি হয়েছি আর তুমি খুশি হওনি?'

ললিত শুধু বল্‌লে, 'হুঁ'।

ছবি আবার চ'লে যাচ্ছিল! ফের তার আঁচল ধরে টেনে রেখে ললিত বল্‌লে, 'এই খোকা হয় তো বড় হবে, মানুষ হবে; সংসার ক'রবে—কি বল ছবি?'

গলার স্বরটা ছবির কাছে যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল, বল্‌লে, 'কি তুমি যা-তা ব'লছ বল তো?'

'শোন না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ ক'রবে, ধন্য ক'রবে তাই জন্যে আমাদের এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ?'

'যাও, ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না' ব'লে জোর ক'রে আঁচল ছাড়িয়ে ছবি চ'লে গেল।

ললিত অন্ধকারে ব'সে বোধ হয় সেই ভবিষ্যতের একটু আভাস কল্পনায় দেখবার চেষ্টা ক'রতে লাগল।

কদিন বাদে হঠাৎ অধরাতে কান্নার স্বরে ঘুম ভেঙে উঠে ছবি ললিতকে জাগিয়ে বল্‌লে, 'শুনতে পাচ্ছো?'

ললিত বল্‌লে, 'হুঁ'।

ছবি ভীত পাংশুমুখে বল্‌লে, 'কান্নাটা টুনুদের বাড়ি থেকেই আসছে না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কাল বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, বোধ হয় মারা গেল।' ব'লে ছবি চোখ মুছলে।

ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকৃতস্বরে বল্‌লে, 'টুনু ম'রে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠ্‌ল, আশ্চর্য নয় ছবি!'

ছবি একবার শিউরে উঠ্‌ল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নীচু ক'রে পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে ব'লে যেতে লাগ্‌ল, 'আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি ক'রে পৃথিবীকে সরগরম ক'রে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি!'—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক!

ছবি বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!'

'বোধ হয়', ব'লে হঠাৎ ছবির হাতটা সজোরে চেপে ধ'রে ললিত উগ্রকণ্ঠে বল্‌লে 'চেঞ্জে আসবার টাকা কি ক'রে জোগাড় করেছি জানো ছবি? সন্তানকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্বে কি করেছি জান?'

ছবি সে মুখের চেহারায় এবার অত্যন্ত ভয় পেয়ে বল্‌লে, 'কি?'

'চুরি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রী করেছি। ভবিষ্যতের মানুষের দাবি মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয়!'

'তাহ'লে কি হবে!' ছবির স্বর ভয়ে কাঁপছিল!

ললিত তিক্তমুখে হেসে বল্‌লে, 'কিছু হবে না, ভয় নেই! সেইটুকুই মজা! এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না! চিরকাল শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।'

ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেম্‌নি বেগে শান্ত হ'য়ে এল।

দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় সে বেরিয়ে গেল। এবং শীতল স্নিগ্ধ অন্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হ'ল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই।

বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হ'য়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায় নি!

ভিতর ও বাহির

ও

পরিবর্তন

বনফুল

বনফুল--- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৩০৬ পূর্ণিয়া জেলার মনিহারি গ্রামে। আদি বাস ছিল হুগলী জেলার শেয়াখালায়। শিক্ষা, মনিহারি ও সাহেবগঞ্জ স্কুলে, পরে হাজারিবাগ থেকে আই,-এস-সি, পাস ক'রে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়েন। ফাইনাল পরীক্ষা দেবার ঠিক আগে [illegible] পাটনা মেডিকেল কলেজ খোলে এবং প্রবাসী বিহারী ছাত্রদের [illegible]খানে যোগদান ক'রতে বাধ্য করা হয়। ১৯২৭ সালে সেখান থেকে এম, বি, পাস ক'রে, কিছুকাল কলকাতায় ডাক্তার চারুব্রত রায়ের সহকারী রূপে ল্যাবরেটারির কাজ করেন। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। বর্তমানে ভাগলপুরে ল্যাবরেটারি প্র্যাকটিস্ করেন। শৈশবে পিতামাতার সাহিত্যপ্রীতি এঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যানুরাগী বনফুল,—"বনফুল" "এই ছদ্মনামে "পরিচারিকা" "মালঞ্চ" প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে সুরু করেন। প্রবাসীতে ১৯১৮ সালে "সাধারণত" নামে একটি চার লাইনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়—একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ। যত দূর মনে পড়ে প্রবাসীতে একপাতা আধপাতার ছোটগল্প বনফুলই প্রথম লেখেন।

বনফুলের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব একপাতা আধপাতার ছোটগল্পে, যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এত ছোট ছোট গল্পের, এত সুন্দর প্রকাশভঙ্গি—এত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হ'তে পারে—এর আগে আমরা তার দেখি নি! ঠিক এই ধরণের গল্পে শেখব, টুর্গেনিভ, পুস্কিন প্রমুখ বিদেশী লেখকেরা অদ্বিতীয়। আমাদের দেশের শুধু রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা" আছে, কিন্তু সেগুলি ঠিক গল্প নয়—গদ্য কবিতা। কবি নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন। এ-ছাড়া বাংলায় এর আগে এই ধারণের গল্প আর কেউ লেখে নি। তা হ'লে বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে বনফুলই প্রথম পথ প্রদর্শক, এ-কথা আমরা আজ অনায়াসে ও অকপট ভাবেই স্বীকার ক'রতে পারি। এ ছাড়াও অনেক ভাল ভাল উপন্যাস ও কবিতা ইনি লিখেছেন—বিশেষ ক'রে হাস্যরসাত্মক কবিতা। হাস্যরসের কবিতাগুলি এঁর অনবদ্য, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি ছন্দে। এঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—বৈতরণী তীরে, দ্বৈরথ, কিছুক্ষণ। গল্প—বনফুলের গল্প, বনফুলের আরো গল্প নাটক—মন্ত্রমুগ্ধ। কবিতা—বনফুলের কবিতা।

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সভ্য ও সামাজিক নয়—তাহার চাল-চলন চিন্তাপ্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং ক্বচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোরবাবু উকিল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরিব প্রজার সর্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শ দান ইত্যাদি সর্বপ্রকার কাযেই তিনি বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একজন বিধবার সম্পত্তিঘটিত একটা মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে; আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু যেন উদ্বিগ্ন আছেন—অন্যমনস্ক তো বটেই।

এমন সময় আর একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে তিনি কোন বিষয়ের পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসংকোচে বলিলেন, আইন 'সংক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হ'লে আমি 'ফী' নিয়ে থাকি জানেন তো?'

'আজ্ঞে হঁ্যা—কত দিতে হবে আপনাকে?'

'বত্রিশ টাকা।'

'আচ্ছা, বেশ—।'

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, 'আমার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।'

'ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাঁদেরও মত যে ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।'

'ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো?'

'হ্যাঁ, ছেলের কোন রোগ নেই।'

'আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান?' বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

'এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জানতে আসা যে যদি বংশ লোপই পায়, তাহ'লে শেষ-পর্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে?'

নস্যের টিপ্‌টা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন, 'ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান, তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে ক'রতে পারে। 'হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।'

'তা তো নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাকলেও সব সময় কি সব জিনিস করা সম্ভব?'

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সেণ্টিমেণ্ট অনুসারে চল্‌লে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই। ওই সব বাজে সেণ্টিমেণ্ট নিয়েই তো আমরা ডুব্‌তে বসেছি!

রামকিশোরবাবু সেণ্টিমেণ্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা জোগাইল। ভিতরের মন নির্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, 'ধরুন যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তাহলে সম্পত্তিটা কারা পাবে?

আইন অনুযায়ী যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোরবাবু তাহা গড়্‌গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না;—'ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাক্‌লে সংসার তো শ্মশান! আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বল্‌লাম—আপনার সেণ্টিমেণ্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ ক'রবেন!'

আগন্তুক বলিলেন, 'না না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি ব'লেই তো আপনার কাছে আসা।'

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ি আসিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়িতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা—'সরোজিনী দেবী।'

ব্যবহারে বোঝা গেল, ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া তরুণীটির ব্যবহারেও সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিল.

'বাবু কোথায়?'

'কাছারিতে।'

'কখন আসবেন?'

'জানি না।'

তাহার পর তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, 'এ কি, সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে?'

'ও বাড়িতে থাকা আর পোষাবে না!'

'কেন, ব্যাপার কি?'

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

'পোষাবে না, মানে?'

'ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে! তুমিও তো মত দিয়েছ!'

'আমি মত দিয়েছি,—মানে?—'

'ওরা একজন অচেনা লোক তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। অন্ততঃ তাই তো শুনলাম। তুমি নাকি ব'লেছ—ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভাল—'

রামকিশোরবাবুর নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে। হতবাক্ রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি তুমি ব'লেছ, বাবা?'

পরিবর্তন

খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খাইয়া সমস্ত মুখটা তিক্ত হইয়া গেল। অথচ সন্দেশগুলি ভালই ছিল।

গোড়া হইতেই শুনুন তাহা হইলে।

হরিমোহন বড়লোক ছিল। টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে না, ইহা জানিতাম। অর্থদ্বারা যতটা চিকিৎসা ক্রয় করা সম্ভব তাহা করা হইবে, হইতেও ছিল। দুইজন কৃতবিদ্য নামকরা ডাক্তার প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসিয়া হরিমোহনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দুইজন নার্স আসিয়া হয়তো তাহার শুশ্রূষার ভারও লইতেন, কিন্তু সরমা—হরিমোহনের স্ত্রী, তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি নিজেই সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেবা-নিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সেবার কোন ত্রুটি হইতেছে না। বেতনভোগী নার্স এতটা করিত কিনা সন্দেহ।

রোগটি কিন্তু সাংঘাতিক,—যক্ষ্মা। মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, প্রত্যহ জ্বর হইতেছে। কফ্ পরীক্ষা করানো হইয়াছিল—যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পয়সার জোরে সুচিকিৎসা হয়তো হইবে, কিন্তু সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বরং তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই কথাই বারংবার মনে হইতেছিল।

হরিমোহন আমার বাল্যবন্ধু। ক্লাসে উভয়ে পাশপাশি বসিতাম এবং সেইসূত্রে যে ঘনিষ্ঠতাটুকু বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, কেন জানি না, এখনও তাহা অটুট আছে। না থাকিবারই কথা। ধনী ও দরিদ্রের সখ্যতা বড় ভঙ্গুর। আমাদের কপালে কেন

যে তাহা টিকিয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। যাই হোক, রোজ তাহার খবরটা লইতে যাইতাম।

আরও বিশেষ করিয়া যাইতে হইত, এই জন্য যে অর্থ এবং স্ত্রী ব্যতীত হরিমোহনের আপন বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। গুড় থাকিলে অবশ্য পিপীলিকার অসদ্ভাব হয় না। উভয় লিঙ্গের বহু পিপীলিকা আনাগোনাও করিতেছিল, কিন্তু যেই ইহা নিঃসংশয়রূপে জানা গেল যে, হরিমোহনের ব্যাধিটি যক্ষ্মা, অমনই পিপীলিকার দল ক্রমশ অন্তর্ধান করিলেন। সম্ভবত অন্য গুড়ের গুদামের সন্ধানে গেলেন! যাক সে কথা। মোটের উপর আমি একা পড়িলাম। সরমার সহিত বন্ধুপত্নী হিসাবে যে লৌকিক আলাপটুকু ছিল, এই সূত্রে তাহা গাঢ়তর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে, না হইলেই ভাল ছিল।

হরিমোহন বসিয়া কাসিতেছিল।

যক্ষ্মার বুক-ফাটা কাসি!

কাসিটা থামিলে বলিল, থো্রটটা বড্ড খারাপ হয়েছে ওষুধ লাগিয়ে লাগিয়ে আর গার্গল ক'রে ক'রে তো হয়রান হ'য়ে উঠলাম। কাসিটা কিছুতেই কমছে না কেন বল্ দেখি!

বলিলাম, কমবে কমবে—এত ঘাবড়াস কেন?

—ঘাবড়াবার ছেলে আমি নই! তবে কি জানিস, ক্রমাগত কাসাটা বিরক্তিকর। —দুইটা কথা বলিতে না বলিতেই আবার কাসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

হরিমোহন বলিল, স্পিউটাম একজামিন ক'রে কিছুই পাওয়া যায় নি, শুনেছিস তো? যাবে না তা আগেই জানতাম। একটা ইনফ্লুয়েঞ্জার এ্যাটাক হয়েছে আর কি।

এক পেয়ালা দুধ হাতে করিয়া সরমা প্রবেশ করিল।

কাসি শেষ করিয়া হরিমোহন বলিল, ও কি আবার?

—দুধ।

—এখন আবার দুধ কেন?

—ডাক্তারেরা ব'লে গেছেন দুধ দিতে যে।

—কি মুস্কিল, একটু বিশ্রাম দাও আমাকে তোমরা! এই তো—। আবার কাসি সুরু হইল।

না না, খেয়ে নাও এটুকু। বলুন না আপনি একটু!

আমিও অনুরোধ করিলাম।

—আচ্ছা, আর এক চুমুক খাচ্ছি তোর অনুরোধে।

আধ পেয়ালার বেশি সে কিছুতেই খাইল না।

সরমা পেয়ালাটা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম। রাত হইয়াছিল। সরমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতে হইবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, টেম্পারেচারের কথাটা হরিমোহনকে যেন জানানো না হয়। হরিমোহনকে বলিলাম, ন'টা বেজে গেছে। আজ উঠি, ভাই। কাল আবার আসব।

—আচ্ছা।

হরিমোহন পাশ ফিরিয়া শুইল।

পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধটা পান করিতেছে। বলিলাম, এ কি করছেন আপনি?

ধরা পড়িয়া গিয়া সরমা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরক্ত মুখে বলিল, ও কিছু নয়।

তারপর সহসা আত্মসংবরণ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, দেখে যখন ফেলেছেন, উপায় নেই। কিন্তু বলবেন না কাউকে?

—তা না হয় বলব না। কিন্তু এঁটো দুধটা খাচ্ছেন কেন?

একটু হাসিয়া সরমা বলিল, স্বামীর এঁটো খেলে দোষ কি?

দোষ কি!

যক্ষ্মার সংক্রামকতা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল বিবরণ করিলাম। সরমা আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিল, তাহার পর সহসা প্রদীপ্ত এক জোড়া চোখ আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাকে? উনি যদি না

[illegible] কি হয়েছে ? খাটলে কি মানুষ রোগা হয় ?—বলিয়া হরিমোহন হা হা করিয়া [illegible] হাসি হরিমোহনের বিশেষত্ব। হাসির জোর কিছুমাত্র কম হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।

[illegible] আসিয়া প্রবেশ করিল, হাতে জলখাবারের প্লেট।

হরিমোহনের [illegible] হইয়া গেলাম। দশ বৎসরে মানুষের এত পরিবর্তন

তাহার নিকট আর [illegible]

ডাক্তার দেখিতেছিলেন, তাঁহারাও ব্যস্ত হইলেন এবং আরও [illegible]

ডাকিলেন। চারি জন মিলিয়া ঠিক হইল যে, কয়েকটি এক্স-রে প্লেট [illegible]

তাহাও যথাসময়ে হইল। এক্সরে করিয়া দেখা গেল একটি ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অপরটি একেবারে নির্দোষ আছে। স্যানাটোরিয়মে গিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করাইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

অর্থের অভাব ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে হরিমোহন ধরমপুর চলিয়া গেল। সুরমাও সঙ্গে গেল।

ইহার পর অনেক দিন হরিমোহনের খবর পাই নাই। কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহাও কালক্রমে থামিয়া গেল। হরিমোহন পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে, ইহাই শুনিয়াছিলাম। তাহার পর হরিমোহন সম্বন্ধে কৌতূহলও ক্রমশ কমিয়া গেল, হরিমোহনও বিশেষ খবর লইল না। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, হরিমোহন সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছে। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, টাকা আছে যাইবে না কেন!

নিয়মিতভাবে কেরানীগিরি করিতে লাগিলাম। আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের খবর লইবার অধিকার আমার নাই, সুযোগও ছিল না। হরিমোহন কোন ঠিকানা দিয়া যায় নাই।

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

হরিমোহনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার পত্র পাইলাম।

দুইছত্র চিঠি।—

ভাই নরেশ,

আগামী মঙ্গলবার কলিকাতায় পৌঁছিব। পার তো দেখা করিও।

হরিমোহন

দেখিলাম চিঠিখানা হরিমোহন লিখিয়াছে দেশের ঠিকানা হইতে। কবে দেশে আসিল সে! কিছুই তো জানি না।

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যার পর আপিস ফেরত তাহার বাসায় গেলাম। সে বাড়িতেই ছিল। খুব ঘটা করিয়া আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। হরিমোহনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুস্থ সবল লম্বা চওড়া চেহারা! কে বলিবে ইহার যক্ষ্মা হইয়াছিল!

বলিলাম, বেশ সেরে গেছিস তো?

—হ্যাঁ, কমপ্লিট্‌লি।

যে যে ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে নিরাময় হইয়াছে, তাহাদের গল্প করিতে করিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

—সুইট্‌জারল্যাণ্ড গেছলি নাকি?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগল?

—অতি চমৎকার! কেতাবে যা পড়া যায় তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর। চল চল, ওপরে চল।

উপরে গেলাম। উপরে গিয়াই হরিমোহন চীৎকার জুড়িয়া দিল, সরমা কই, নরেশ এসেছে—চা জলখাবার আন—ব'স ব'স। দামী সোফাটার উপর একটু সন্তর্পণেই বসিলাম।

হরিমোহন বলিতে লাগিল, তারপর তোর খবর কি বল!—তুই তো অনেক বদলে গেছিস দেখছি। কানের কাছের চুলগুলো বেবাক পেকে গেছে রে! এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেলি! ওদেশে পঞ্চাশ বছরে যৌবন সুরু হয়—বুঝলি?

'সুরু' কথাটার উপর সে জোর দিল।

আমার যে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে এবং ডাক্তারে আমারও টি. বি. সন্দেহ করিতেছে, সে কথা আর তাহাকে বলিলাম না, বলিয়া লাভ নাই। কেবল বলিলাম, ওদেশে এদেশে ঢের তফাৎ রে ভাই! তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলে যাস কেন? সেই বিশ বছর বয়স থেকে এক নাগাড়ে কেরানীগিরি ক'রে চলেছি—দম নেবার অবসর নেই।

—তাতে কি হয়েছে ? খাটলে কি মানুষ রোগা হয় ?—বলিয়া হরিমোহন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘর কাঁপানো হাসি হরিমোহনের বিশেষত্ব। হাসির জোর কিছুমাত্র কম হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।

সরমা আসিয়া প্রবেশ করিল, হাতে জলখাবারের প্লেট।

সরমাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। দশ বৎসরে মানুষের এত পরিবর্তন হইতে পারে!

আমার ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবত সরমা একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল।

—চা—টা নিয়ে আসি!

জলখাবারের প্লেটটা সামনের তেপায়াটার উপর নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কে এ!

হরিমোহনকে বলিলাম, সরমাকে তো একদম চেনা যায় না! এই দশ বছরে ভীষণ বদলে গেছে দেখছি।

হরিমোহন স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, হ্যাঁ, বদলে গেছে। তুই যাকে দেখেছিলি এ সে নয়—এ আর এক সরমা। সে সরমা বহুকাল আগেই মারা গেছে। তারও টি. বি. হয়েছিল। দুটো লাংসেই। কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল' শেষটা ইনটেস্‌টাইন ও খারাপ হ'য়ে গেল। অনেক খরচপত্তর করলাম কিছুতেই বাঁচল না।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। হরিমোহনই আবার কথা বলিল।

—থাকতে পারলাম না—দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রতে হ'ল। খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে বার করলাম শেষে। ও নামটা মুখস্থ হ'য়ে গেছে। যে লোক গেছে সে আর ফিরবে না জানি, তবু নামটার—

থামিয়া গেল। সরমা দ্বারপথে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে। হরিমোহনের দিকে নানারূপ খাদ্যপূর্ণ এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল, অত আমি খাব না। কত দিয়েছ আমাকে!

শুনিলাম সরমা বলিতেছে, ডাক্তারে তোমাকে খেতে বলেছে ভাল ক'রে। আজকাল তুমি খাচ্ছ না মোটে। একটু ব'লে যান তো আপনার বন্ধুকে।

হরিমোহন বলিল, নরেশের জন্যে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ আনিয়েছ তো? ভারি ভালবাসে ও খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খেতে!

হ্যাঁ, এই যে আনিয়েছি।

হাসিয়া এক প্লেট খেজুরে গুড়ের সন্দেশ সে আমার দিকে আগাইয়া দিল।

ডাকগাড়ি

ও

যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৩০৩, ২৪পরগণার কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী মুরাতিপুর গ্রামে। পৈতৃক বাস যশোহর। বনগ্রাম মহকুমায় বারাকপুর নামে ইছামতী নদী তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্রগ্রাম—এইখানে এঁর বাল্য ও কৈশোরের স্বপ্নমধুর দিনগুলি অতিবাহিত হয়। শান্ত বনশ্রী আর সরল সদাশয় গ্রাম্যনরনারী বেষ্টিত এই পল্লীপ্রকৃতির কোলে বালক বিভূতিভূষণের সাহিত্যালোকের প্রথম উন্মেষ। বনগ্রাম স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কলকাতায় এসে রিপণ কলেজে বি, এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েই অন্নসংস্থানের চেষ্টায় নানা স্থানে নানা কাজে ঘুরতে হয়, স্কুলের মাষ্টারী থেকে জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজারী পর্যন্ত। মধ্যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯২২-১৯৩০ সাল, এই আট বৎসর ভ্রাম্যমান জীবন আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে চট্টগ্রামের অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেই গিরিভ্রমণের সময় লেখা বিখ্যাত উপন্যাস "পথের পাঁচালী।"

বাংলার পল্লীপ্রকৃতির ও সমাজের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বঞ্চিত নরনারীর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অনুরাগে রঞ্জিত এঁর সাহিত্য। যে সব অদ্ভুত ধরণের চরিত্র ইনি সৃষ্টি করেছেন তার অধিকাংশই যেন এঁর অভিজ্ঞতালব্ধ। এঁর জীবনের পট-ভূমিকায় যেন তাদের অনেকেরই ছায়া পড়েছে। এঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—পথের পাঁচালী, অপরাজিতা দৃষ্টিপ্রদীপ। গল্প—মৌরীফুল, মেঘমল্লার, যাত্রা বদল।

ডাকগাড়ি

এক এক সময় রাধা ভাবে কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারিলে ভাল হইত। আজ ছ'বছরের মধ্যে সে একখানা দুর্গা প্রতিমার মুখ পর্যন্ত দেখে নাই। এ গাঁয়ে সবাই গরিব, দুর্গোৎসব তো দূরের কথা, তেমন একটা জাঁকের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত হয় না। অবশ্য এ গাঁয়েরই সে মেয়ে, এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ হইয়াছে, বাল্যে সে ভাবিত সর্বত্রই বুঝি এই রকম ব্যাপার। কিন্তু বিয়ের পরে বাসুদেবপুর গিয়া রাধা প্রথম বুঝিল তাদের গাঁ অতি হীন অবস্থার গাঁ। গরিব আর বড়লোক তফাৎ কি বুঝিল। বাসুদেবপুর এমন কিছু শহর বাজার জায়গা নয়, গঙ্গার ধারে একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই পর্যন্ত। সেখানে মুস্তফিরা বড়লোক, এমন পূজা নাই যে, তাদের বাড়ি হইত না—দুর্গোৎসব বল, শ্যামাপূজা বল, জগদ্ধাত্রী পূজা বল, এমন কি রথ পর্যন্ত

বছর তিনেক বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল—সব দিক দিয়াই।

তারপর তাহার স্বামী মারা গেল যকৃতের রোগে। শাশুড়ীর সঙ্গে রাধার বনিল না, দিনকতক উভয়ের মধ্যে যে সব বাক্যাবলীর আদান প্রদান চলিল, তাহাকে ঠিক সদয় ও ভদ্রবাক্য বলা চলে না। রাধা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইল, তাহার বাবা এত দরিদ্র আজও হন নাই যে, তাহাকে একবেলা এক মুষ্টি আতপ চালের ভাত দিয়া পুষিতে পারিবেন না। ফলে একদিন একটি মাত্র পুঁটুলি সম্বল করিয়া রাধা তাহার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি

আসিয়া পৌঁছিল। ভাইটিকে সে-ই পত্র লিখিয়া আনিয়াছিল। তাহার তোরঙ্গ ও ক্যাসবাক্স শাশুড়ী আটকাইয়া রাখিলেন।

ছ'বছর তারপর কাটিয়া গিয়াছে।

সেই যে বিধবা হইয়া আসিয়া বাপের বাড়ি ঢুকিয়াছে, আর সে এ গ্রাম হইতে বাহির হয় নাই।

এই ছ'বছরে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল তাহাদের সংসারে। বাবা লেখাপড়া ভাল জানেন না, বিশ্বাসদের পাটের আড়তে কাজ করিয়া সামান্য কয়েকটি টাকা পাইতেন। বাবার সে চাকুরিটা গেল। রাধার ছোট একটা ভাই গেল মারা। বাবার বাত হইয়া কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকিলেন। বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে নানা কথায় ঝগড়া বিবাদ হইতে লাগিল। জমিদার নালিশ করিয়া তাহাদের বড় জমা ক্রোক করিয়া লইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে দিনগুলি, সেই সংসারের কাজ, সেই গরুর সেবা, সেই রাঁধাবাড়া, বাবার হাতে পায়ে তেল মালিশ করা, মায়ের দোক্তার পাতা পুড়াইয়া তামাকপোড়া তৈরি করা, কলের মত একটানা একঘেয়ে ভাবে চলিতেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

আজ সকালে ডোবার ধারে বাসন মাজিতে বসিয়া তাই সে ভাবিতেছিল একবার কোথাও বেড়াইয়া আসিবে।

ছোট ডোবাটা। চারিপাড়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঝুপসি অন্ধকার হইয়া আছে। দুপুর বেলাতেও রোদ পড়ে না। এইটুকু তো ডোবা, এর আবার চারিদিকে চারিটা ঘাট। বাঁধানো নয়, কাঁচা ঘাট। দক্ষিণ দিকের জামতলায় জেলেপাড়ার ঘাট, পশ্চিম পাড়ের বেলতলায় নাপিতদের ঘাট, পুবদিকে বামুন পাড়ার ঘাট, উত্তর পাড়ে যাদের জমিতে ডোবাটা তাঁদের ঘাট। তাঁরাও ব্রাহ্মণ, নিজেদের জন্যে একটা ঘাট আলাদা রাখিয়াছেন, কাহাকেও সে ঘাটে যাইতে দেন না।

সেই বাড়িরই সুবি, ভাল নাম সুবিনিতা—তাদের ঘাটে চায়ের পাত্র ধুইতে নামিল। গ্রামের মধ্যে ওরা ওরই মধ্যে একটু সৌখিন, চা খাওয়ার অভ্যাস রাখে, সুবি কিছুদিন কলিকাতায় কাকার বাসায় থাকিয়া পড়িত। ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়া আজ বছর খানেক বাড়িতে বসিয়া আছে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই বেশি, কারণ গ্রামের মধ্যে সে-ই একমাত্র মেয়ে, যে স্কুলের মুখ দেখিয়াছে—তাও আবার কলিকাতায়।

সুবি দেখিতে মোটামুটি ভালই, রং উজ্জ্বল শ্যাম, বড় বড় চোখ, এক রাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সর্বদা ফিট্‌ফাট্ হইয়া থাকে, একটু চালবাজ। ষোল বছর বয়েস, বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। রাধা সুবি বলিতে অজ্ঞান, কিন্তু সুবি তাকে বড় একটা আমল দেয় না। গরিব

ঘরের মেয়ে, বাইশ তেইশ বছর বয়েস, তার ওপরে বিধবা এবং লেখা পড়াও তেমন কিছু জানে না—এ অবস্থায় রাধা কি করিয়া আশা করিতে পারে যে, সে কলিকাতার স্কুলের ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়া মেয়ে সুবির অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে স্থান পাইবে। তা সে পারে না—বা সে আশা করা তার উচিত ও নয়।

সুবিকে জলে নামিতে দেখিয়া রাধার মুখ ঠিক আগ্রহে ও আশায় উজ্জ্বল দেখাইল।

সে বলিল—ও সুবি ভাই, তোদের চা খাওয়া হ'য়ে গেল?

সুবি কচুর ঝাড়ের গোড়া হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া জল বুলাইতে বুলাইতে বলিল—হয় নি। মার তো আজ সোমবার, মা খাবে না—শুধু আমি আর দাদু। তাড়াতাড়ি নেই, এইবার গিয়ে জল চড়াবো।

সুবি নিজে থেকে কোনো কথা বড় একটা রাধার সঙ্গে বলে না—তবে রাধা যে কথা জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রভাবে তার উত্তর দেয়।

রাধা জানে সুবি সাংসারিক কথাবার্তা বলিতে ভালবাসে না। পড়াশুনা, গান, ফিল্ম, কবিতা প্রভৃতি তাহার কথাবার্তার বিষয়। কলিকাতায় থাকিয়া তাহার রুচি বদলাইয়া গিয়াছে।

রাধা তাহার মন যোগাইয়া চলিবার চেষ্টায় বলিল—কাল সন্ধ্যাবেলা তুই এলিনে ভাই, আমি কতক্ষণ ব'সে ব'সে একটা কবিতা মুখে মুখে বানালাম। তোকে শোনাবো আজ দুপুরে।

—কি কবিতা?

—আসিস্, এখন না? শোনাবো। মুখস্থ নেই, ভাই।

সুবি আর কোন আগ্রহ দেখাইল না। শুধু বলিল—দুপুরে মা কাঁথা সেলাই ক'রবে, আমাকে কাছে ব'সে ছুঁচে সুতো পরাতে হবে। আমার যাওয়া তো হবে না।

রাধা বলিল—সেই গানটা একটু গা না সুবি?

সুবি চায়ের পাত্রগুলি হাতে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত অবস্থায় বলিল—এখন সময় নেই। অনেক কাজ। চলি।

রাধা অতি করুণ মিনতির সুরে বলিল—গা না ভাই, দুটো লাইন, গা। বলচি এত ক'রে—

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি পাড়াগাঁয়ের মেয়ের তুলনায় সুবি গান গাইতে পারে মন্দ নয়। কলিকাতায় থাকিবার সময় নিধুদা'র কাছে অনেক গান শিখিয়াছিল। নিধুদা তার কাকিমার পিস্তুতো ভাইয়ের ছেলে। কলেজে পড়ে, বেশ গান গাইতে পারে, চেহারাও ভাল। সুবিকে দিনকতক সে গান শিখাইতে ঘন ঘন আসিত।

সুবি গুণ্ গুণ্ করিয়া মাত্র দু'কলি গাহিল।

যৌবন সরসী-নীরে
মিলন শতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল!

ঠিক এই সময় নাপিতদের ঘাটে নাপিত বৌ এক কাঁড়ি বাসন লইয়া মাজিতে আসিল। নাপিত বৌ শ্যামবর্ণ, বয়স উনিশ কুড়ি, খুব সুন্দর নিটোল গড়ন, স্বাস্থ্যবতী, মুখশ্রীর মধ্যে একটা সুলভ ও সহজ সৌন্দর্য আছে—অর্থাৎ যে শ্রীটা এই বয়সেই থাকে, পাঁচ বছর পরে তাহার আর বিশেষ কিছু অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু এখন যখন সেটা আছে, খুব জমকালো ভাবেই আসর মাতাইয়া রাখিয়াছে।

নাপিত বৌ সুবিকে প্রায় পূজা করিয়া থাকে মনে মনে। তাহার জীবনে এমন মেয়ে সে দেখে নাই। অমন রূপ, অমন কথাবার্তা, অমন লেখাপড়া, অমন গান—সকল দিকেই সুবি নাপিত বৌয়ের মন হরণ করিয়া লইয়াছে। যে পাড়াগাঁয়ে নাপিত বৌয়ের বাপের বাড়ি, সে গাঁয়ে এমন একটি মেয়ের কল্পনাও করা শক্ত। ইহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পাইয়া সে ধন্য হইয়া গিয়াছে। নাপিত বৌ আঁচলের চাবিটা শক্ত করিয়া গেরো দিতে দিতে সুবির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল।

বলিল—ভারি চমৎকার গলা দিদিমণি আপনার। কখনো এমন শুনি নি, কি গানটা দিদিমণি?

সুবি পদগুলি আবৃত্তি করিয়া গানটি বলিয়া গেল।

নাপিত বৌ গানের ভাষা বিন্দু বিসর্গও বুঝিল না। সুবির মন যোগাইবার জন্য একমনে শুনিবার ভাণ করিয়া মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

সুবি ভাবিতেছিল, এ বর্বরদের গান শুনাইয়া লাভ কি? আজকাল তাহার গলা সত্যিই ভাল হইয়াছে। নিধুদা যদি শুনিত!···

আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না···নিধুদার সঙ্গে দেখাও আর হইবে না। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ খোঁজা চলিতেছে, স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বাড়িতে রাখা হইয়াছে, বয়েস ষোল ছাড়াইতে চলিল কিনা। আর বাড়ির বাহির হইবার হুকুই নাই। কলিকাতা···চিত্রা··· রূপবাণী···কেতকী···শোভা, নিধুদা···সব স্বপ্ন···এ জন্মের মতন সব ফুরাইয়াছে···সোণার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য নয় যে, তেইশ বছরের বিধবা রাঁধার ঘনিষ্ঠতা তাহার ভাল লাগে না। নাপিত বৌ তাহার পায়ের তলায় পোষা কুকুরের মত পড়িয়া থাকে, কোনো রকমে সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। ঝি-চাকরকেও তো লোকে সহ্য করে।

রাধা বলিল—ভাই সুবি, তোর গলাখানা যদি একবার পেতাম! হিংসে হয় সত্যি।

সুবি নাপিত বৌয়ের খোসামোদ ও রাধার গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ঠেলিয়া ফেলিয়া চায়ের পাত্র লইয়া চলিয়া গেল। সে মরিতেছে নিজের জ্বালায়, এমন সময়ে এ-সব ন্যাকা ন্যাকা কথা তাহার ভাল লাগে না।

জেলেপাড়ার ঘাটে ছিপছিপে, ফর্সা, থান-পরা জেলে বৌ কাপড় কাচিতে নামিল।

রাধা বলিল—ও রামুর মা, রামুর কোনো খবর পেলে?

জেলে বৌ বলিল—কোথায় দিদি ঠাক্‌রুণ,—আজ পাঁচ মাস ছেলে গিয়েছে, একখানা পত্তর নয়—টাকা পাঠানো চুলোয় যাক্—তার টাকা পাঠাতে হবে না। আমি ধান ভেনে, ক্ষার কেচে, গতর খাটিয়ে যেমন চালাচ্ছি, এমনি চালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। ছেলের রোজগার খেতে চাইনে. সে ভাল থাকুক, নিজের খরচ নিজে করুক, তাতেই আমি খুসি। কিন্তু বলো তো দিদিঠাক্‌রুণ একখানা চিঠি নেই আজ পাঁচ মাস, আমি কি ক'রে ঘরে থাকি ?

রামু লালমণিহাটে রেলে কি একটা চাকুরি পাইয়া গিয়াছে। মাকে একবার পাঁচটি টাকা পাঠাইয়াছিল—তারপর এমন লেখে যে, সামান্ত মাইনেতে তাহার কুলায় না, মাকে এখন আর টাকা পাঠাইতে পারিবে না। মা যেন কষ্ট করিয়া পূজা পর্যন্ত কোনো রকমে চালাইয়া লয়। ছেলের কষ্ট হইবার ভয়ে মাও আর টাকা চায় না। কষ্টে-স্বষ্টেই চালায়।

রাধার জেলে বৌকেও ভাল লাগে বড়।

এমন ধরণের মেয়ে এ গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরেও নাই। এত সুন্দর মন ওর, পরের উপকারে প্রাণ ঢালিয়া দিতে এমন লোক সত্যিই গাঁয়ে আর নাই। শুধু রাধাদের বলিয়া নয়, লোকের চিঁড়ে কুটিতে জেলে বৌ, ধান ভানিতে জেলে বৌ, যাহাদের বাড়িতে পুরুষ মানুষেরা বিদেশে থাকে, শুধু বাড়িতে মেয়েরা আছে—এক ক্রোশ দূরবর্তী বাজার হইতে তাদের হাট-বাজার করিয়া দিতে.জেলে বৌ, কুটুম্ব বাড়িতে তত্ত্বতাবাস পাঠাইতে কিংবা নব বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাইতে জেলে বৌ—না হইলে এ গাঁয়ের লোকের চলে ? অথচ এ সবের জন্যে জেলে বৌ কারো কাছে একটি পয়সা প্রত্যাশা করে না—পাড়ার পাঁচজনের বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়া বেড়ানোই তার অভ্যাস।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধার মনে আছে আমবাগানের পথ দিয়া সে ঘাটে যাইতেছে—জেলে বৌ আম কুড়াইতেছে বাগানে।

রাধা বলিল—রামুর মা, আম কুড়ুচ্চ ? দেখি কোন্ কোন্ গাছের, ও গুয়োথলীর আম পেয়েছ যে দেখছি !···ও বাবা, ও তো বড় একটা পাওয়া যায় না। আমি কত খুঁজি, একটাও পাওয়া যায় না। আমি কত খুঁজি, একটাও পাইনে একদিনও। তোমার ভাগ্যি ভালো। ভারি বোঁটা শক্ত আম, তলায় পড়েই না।

অত মিষ্টি গাছের আম, আর পাওয়া অত শক্ত, মাত্র তিনটি আম পাইয়াছিল জেলে বৌ, অমনি হাসিমুখে বলিল—তা নিয়ে যান দিদি-ঠাক্‌রুণ, আম ক'টা আপনি সেবা করবেন। দয়া ক'রে নিয়ে যান আপনি—জেলে বৌয়ের গুণ আছে, অত সহজে ত্যাগ স্বীকার করিতে ওর জুড়ি নাই এ গাঁয়ে।

রাধা আম লইয়াছিল এজন্যে যে, না লইলে জেলে বৌ ভাবিবে, ছোট জাতের দান বলিয়া

ব্রাহ্মণের মেয়ে সকালবেলা গ্রহণ করিল না। লইয়া সে ভাবিল জেলে বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান থাকতো, যদি এ গাঁয়ে হাঙ্গামা পোয়াতে হ'ত তা হ'লে।

রাধা বলিল—জেলে বৌ, আমার সঙ্গে একবার শ্বশুরবাড়ি চল না? অনেক দিন কোথাও বেরুই নি, ভাবচি দিন কতক ঘুরে আসি।

জেলে বৌ বলিল—যান না দিদিঠাকুরুন। আপনাদের যাবার জায়গা আছে কেন যাবেন না। শ্বশুরবাড়ি যানও নি তো অনেক দিন। তাঁরা দেখলে খুশি হবেন।

সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শাশুড়ী তাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, তা রাধার জানিতে বাকি নাই। তবুও যাইতে হইবে, তোরঙ্গ আর ক্যাশ বাক্সটা সেখানে ফেলিয়া আসায় লাভ কি? সেগুলো আনা দরকার। অমন ভাল তোরঙ্গটা।

পরদিন বাবা-মাকে কথাটা বলিতেই বাড়িতে একপালা ঝগড়া সুরু হইল। রাধার বাবার আদৌ মত নাই সেখানে মেয়ে পাঠাইতে, রাধার মা কিন্তু রাধার দিকে। দু'জনে এই লইয়া বাধিল ঘোরতর দ্বন্দ্ব।

রাধা বাবাকে বলিল, আমি ঘরে আসবো তো বলচি সাত দিনের মধ্যে। নবুকে সঙ্গে নিয়ে যাই—না থাকতে দেয়, আসা তো আমার হাতের মুঠোয়। একঘেয়ে ভাল লাগে না এখানে।

রাধার বাবা বলিলেন—এ অপমান সাধ ক'রে কুড়ুবার কি দরকার তোর? তারা কি এই ছ'বছরের মধ্যে একখানা পত্তর দিয়ে খোঁজ নিয়েচে যে তুমি কেমন আছ?

অনেক কষ্টে অবশেষে বাবাকে নিমরাজি গোছের করাইয়া ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া রাধা আসিয়া গাংনাপুর স্টেশনে গাড়ি চাপিল।

রেলগাড়িতে চাপিয়া রাধার মনে হইল সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে বহুদিন পরে। কেবল বাবা মায়ের একঘেয়ে ঝগড়া অশান্তি, কেবল নাই নাই শুনিতে শুনিতে তাহার তরুণ মন অকালে প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলিয়াছে! সংসারে আলো নাই, বাতাস নাই,—শুধুই শোনো চাল নেই, কাঠ নাই, একাদশীর আটা কোথা হইতে আসিবে, নবুর কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নতুন একটা ইজের ছ'আনা হইলে পাওয়া যায়, তা যেন ছ'টি মোহর। নবুর পাঁচ মাসের স্কুলের মাইনে বাকি, দুবেলা মাস্টারে শাসায়, মুখুয্যেদের বাড়ির ঠাকুমার দেনার টাকার সুদের তাগাদা আর বাবার যত মিথ্যে কথা বানাইয়া বলা পাওনাদার বিদায় করিতে। আজ সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া মুর্শিদাবাদ লাইনের গাড়িতে চাপিতে হইল। মুড়াগাছায় নামিয়া ক্রোশখানেক হাঁটিয়া বৈকাল তিনটার সময় সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া পৌঁছিল।

শাশুড়ী বৌকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে নবাবের মেয়ে, তা এতদিন পরে কি মনে ক'রে?

সঙ্গে কে ? ছোট ভাই—ও সেই নবু না ? এসো এসো বাবা, সুখে থাকো, চিরজীবি হও। তা বেশ ছেলেটি।

কিন্তু শাশুড়ীর অমায়িকতা তিনদিনের মধ্যেই ঘুচিয়া গেল। রাধার বিধবা বড় ননদ ভ্রাতৃবধূকে পুনরায় এ বাড়িতে আসিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। রাধার গলার ছ'ভরির হার সেবার শাশুড়ী কাড়িয়া রাখিয়া ছিলেন, সেই হারছড়া ভাঙিয়া ননদের মেয়ের বিয়ের সময় হাতের রুলি আর বালা গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় ননদ ভাবিয়াছিলেন, আজ ছ'বছর যে বৌ এ বাড়ি আসে নাই, সে আর আসিবে না। কিন্তু আপদ আবার আসিয়া যখন জুটিল, তখন তো হারের দাবি করিয়া বসিবে। হইলও তাই। রাধা শাশুড়ীর কাছে হার চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন—তোমার বাবা যে টাকা বিয়েতে দেবেন বলেছিলেম, তা দেন নি—ছ'শো টাকা বাকি ছিল। তার দরুণ হার রেখে দিই। সে টাকা নিয়ে এসো আগে, হার এখুনি বার ক'রে দিচ্ছি।

বড় ননদও এই কথায় সায় দিলেন।

রাধা বলিল—বারে, আমার বাবার গড়িয়ে দেওয়া হার, তোমরা তো আর দাওনি ? বাবা টাকা দিয়েছেন কিনা সে তোমরা বোঝ গিয়ে তাঁর সঙ্গে। আমার হার কেন তোমরা দেবে না ?

কিন্তু টাকাকড়ির কথা কি আর অত সহজে মেটে !

রাধা বলিল, আমার বাবার দেওয়া তোরঙ্গ, তাই বা তোমরা কেন আটকে রাখবে ? আর তোরঙ্গের চাবি ভেঙে তোমরা জিনিসপত্র বার ক'রে নিয়েছ কেন ?

শাশুড়ী ও ননদ দুজনে মিলিয়া বলিলেন, চাবি ভাঙে নাই, ভাঙাই ছিল।

রাধা বলিল, আমার নতুন তোরঙ্গ, চাবি ভাঙা থাকলেই হ'ল ? তোমরা ভেঙেচো। যত ঝাড়ের ঝাড়, দাও আমায় হারছড়া—

শাশুড়ী বলিলেন, মুখ সামলে কথা বলো বৌমা, বলচি—

উভয়পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। ননদ মারিতে আসিলেন ভ্রাতৃবধূকে। নবুকে সেদিন আর কেহ খাইতে ডাকিল না। রাধার তো কথাই নাই, তাহাকে কে আদর করিয়া খাওয়াইবে, সে যখন তার বিবাহের হার ও তোরঙ্গ চাহিতে আসিয়াছে ?

দুপুরের পরে ঝগড়াঝাটি করিয়া নবুকে সঙ্গে লইয়া রাধা ধর্মদহ গ্রাম হইতে মুড়াগাছা স্টেশনে হাঁটিয়া আসিল। দুজনেরই অনাহার। মনে পড়িল এই শ্রাবণ মাস, এই শ্রাবণ মাসেই সে ওই পথেই একদিন পাল্কি করিয়া নববধূরূপে আসিয়াছিল। কথাটা মনে আসিতেই রাধার চোখে জল বাধা মানিল না। স্টেশনে আসিবার সারা পথটাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল।

ট্রেনটি আসিলে তাহাতে কলের পুতুলের মত বসিয়া রাধা কত কথা ভাবিতে লাগিল। মিছামিছি প্রায় তিনটা টাকা খরচ হইয়া গেল। এ টাকা অবিশ্যি তাহার বাপের বাড়ির নয়—তাহার নিজেরই জমানো টাকা। টাকাটা হাতে থাকিলে টানাটানির সংসারে কত কাজ দিত।

খাবার অমতে আসা হইয়াছে, শুধু হাতে ফিরিলে বাবার বকুনি খাইতে হইবে। মা মুখ ভার করিয়া থাকিবে। হারছড়াটা—লইয়া যাইতে পারিবার আশা করিয়াই সে আসিয়াছিল। বাবা মায়েরও সে আশা যে একেবারে না ছিল তাহা নয়। এবার সকলে রাগ করিবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে শ্বশুরবাড়ি আসিবার পথও গেল। শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া না করিলেই হইত। না হয় গিয়াছেই হারছড়াটা! বাপ মায়ের অবর্তমানে শ্বশুরবাড়িতে একটু দাঁড়াইবার স্থানও তো হইত। তাহার জীবনে কোনো সুখ নাই। বাড়ি গিয়া তো সেই একঘেয়ে ব্যাপার। সেই ডোবার ধারে সকালে বাসন মাজা, সেই গোয়াল পরিষ্কার, সেই রাঁধাবাড়া। সুবি—তা সেও মন খুলিয়া কথা কয় না। সে অনেক কিছু ভুলিতে পারিত, যদি সুবি তাহার সঙ্গে হাসিয়া আলাপ করিত, প্রাণ খুলিয়া মিশিত। তা করে না—কত করিয়া সাধিয়া কত ভাবে মন যোগাইয়া রাধা দেখিয়াছে।

সত্যি, জীবন সব দিক দিয়াই অন্ধকার। বাঁচিয়া কি সুখ?

কাল সকালে কি হইবে সে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। রাত্রে আজ সে বাড়ি ফিরলেই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া বাধিবে। অর্থাৎ সে হার আদায় করিতে না পারিয়া ফিরিলেই বাবার আশাভঙ্গের রাগটা গিয়া পড়িবে মা'র উপর, দুজনে ধুন্ধুমার বাধিয়া যাইবে। কাল সকালে ডোবাতে বাসন মাজিবার সময় মুখুয্যে পাড়ার ঘাট, জেলে পাড়ার ঘাটের সবাই জানিতে চাহিবে সে এত শীঘ্র শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিল কেন। শাশুড়ী কি করিল, কি বলিল—এই কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আর মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে বলিতে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। কারণ, সত্যকথা তো সে বলিতে পারিবে না? রায়-বাড়ির কুচুটে মেজ বৌ মুখ টিপিয়া হাসিবে। সুবি নামিবে ওদের নিজেদের ঘাটের কচুতলায় চায়ের বাসন ধুইতে। নিজ হইতে একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিবে না যে রাধা কবে আসিল বা কিছু। রাধাকে প্রথমে কথা বলিতে হইবে। সুবি দু'একটা 'হাঁ' 'না' গোছের দায়সারা উত্তর দিয়া চায়ের পেয়ালা পিরিচ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবে যেন বেশিক্ষণ ডোবার ঘাটে দাঁড়াইয়া ওর সঙ্গে কথা বলিলে তার আভিজাত্য খর্ব হইয়া যাইবে। বাসন-মাজার পরে ঘাটে যাওয়া, রান্না খাওয়ানো-দাওয়ানো, দুপুরে পান মুখে দিয়াই ছুটিতে হইবে ঘাটে, গরুকে জল খাওয়াইতে সেই নদীর ধারের মাঠে, যেখানে গরুকে গোঁজ পুতিয়া রাখিয়া আসা হইয়াছে। সেই সময়টা যা একটু ভাল লাগে—নীল আকাশ, নদীর ধারে কাশ ফুল দোলে, মস্ত জিওল গাছের গা বাহিয়া সাদা-সাদা মোম-বাতি-ঝরা মোমের মত আটা ঝরিয়া পড়ে, হু হু খোলা হাওয়া বয় ওপারের দেয়াড়ের চর হইতে, পাট-বোঝাই গরুর গাড়ির দল কাঁচকোঁচ করিতে করিতে ঘাটের পথের রাস্তা দিয়া কোথায় যেন যায়। গরুকে জল দেখাইয়া আসিয়া তাহার বড় ইচ্ছা করে সুবিদের বাড়িতে সুবির সঙ্গে বসিয়া একটু আধটু গল্প-গুজব করে, দু'একখানা বর্ণসূচি পড়িয়া শোনায়—(কারণ সে বই পড়িতে জানে না) গান শোনায়—কিন্তু হায় রে দুরাশা! গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইতে

গেলে স্থবি গভীর ঔদাস্যের সুরে বলিবে—হ্যাঁ, যাই রাধাদি। কত কাজ পড়ে রয়েচে, বিশুর সেই মোজা জোড়াটা বুনতে বুনতে ফেলে রেখেছি, সেটা সম্পূর্ণ শেষ ক'রে ফেলি গিয়ে। বসো তুমি—মা'র সঙ্গে কথা বলো।

তারপর বেলা পড়িয়া যাইবে। রোয়াকে কাঠে বঁট পাতিয়া একরাশ বিচুলি কাটিতে হইবে, গরুকে জাব খাওয়াইতে। মাঠ হইতে গরু অবিশ্যি মা-ই আনে, কারণ এ সময়টা সে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, নদীর ধারের মাঠ হইতে গরু আনিবার, সময় তার বড় একটা হয় না। তারপর বাইরের বেড়ার গা হইতে শুকনো কাপড় তুলিতে হইবে, ঘর ঝাঁট দিতে হইবে, লণ্ঠনে তেল পুরিয়া কাঁচ মুছিয়া রাখিতে হইবে, গা ধুইয়া আসিতে হইবে, পাতকুয় তলায় সাঁজ জ্বালিয়াই বাবার মিছরি মরিচ গরম করিয়া দিয়াই রাত্রের ভাত চড়াইতে হইবে। সকলের খাওয়া দাওয়া সারা হইলে সে নিজে এক মুঠা চালভাজা তেল-নুন মাখিয়া এক ঘটি জল খাইয়া বাবার পায়ে বাতের তেল মালিশ করিতে বসিবে। এই সব সারিতে রাত সাড়ে দশটার গাড়ি গড় গড় করিয়া মাংলার বিলের পুলের উপর দিয়া যাইবার শব্দ পাওয়া যাইবে।

তবে দিনের মত ছুটি। এই চলিবে দিনের পর দিন, তিন শো ত্রিশ দিন।

হঠাৎ নবু জানালার বাহিরে হাত বাড়াইয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—উই রাণাঘাটের ইস্টিশান দেখা যাচ্ছে দিদি—

রাধার চমক ভাঙিল।

সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, প্রকাণ্ড ট্রেনটা অজগর সাপের মত বাঁকিয়া রেল স্টেশনের নিকটবর্তী হইতেছে। যেখানে তার ইঞ্জিন, সেখানে দূরে একটা বড় বাড়ি ও টিনের ছাদ দেওয়া দালান মত দেখা যাইতেছে। রাণাঘাট পৌঁছিয়া গেল এর মধ্যে!

প্লাটফর্মে নামিয়াই নবু বলিল—একখানা পাঁউরুটি কিনে দ্যাওনা দিদি! কি খিদেই পেয়েছে—ডাক্‌বো?

আঁচলের গেরো খুলিয়া তিনটি পয়সা বাহির করিয়া রাধা ভাইকে একখানা পাঁউরুটি কিনিয়া দিল। তাহার নিজেরও খুব ক্ষুধা পাইয়াছে—সেও তো সারাদিন কিছু খায় নাই। ভাইকে বলিল—আর কিছু খাবি? এক কাজ কর বরং, চল বাইরের দোকান থেকে আলুর দম কিনে দিই এক পয়সার। পাউরুটি দিয়ে খা, পেট ভরবে 'খন।

নবু বলিল—তুমি কিছু খাবে না, দিদি?

—আমি রেলের কাপড়ে কি খাবো? চা খেতে পারি, ওতে দোষ নেই—যা দিকি ঐ চা বিক্রি করচে, জেনে আয় কত ক'রে নেবে এক পেয়ালার দাম। নবু জানিয়া আসিয়া বলিল—এক পেয়ালা চা চার পয়সা, দিদি।

—উঃ বাবা, চার পয়সা। তবে থাক্ গে। মোটে আর ন'টি পয়সা আছে। বাবার জন্যে

একখানা পাঁউরুটি কিনে নিতে হবে। দুধ দিয়ে পাঁউরুটি খেতে ভালবাসেন বাবা। মা'র জন্যে কি নেব বল্‌তো?

রানাঘাট স্টেশনে দাঁড়াইয়া রাধার মনের দুঃখ অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। কত লোক-জন। গাড়ি-ঘোড়া, দোকান পসার—দেখিলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।

এমন সময়ে প্লাটফর্মে একটা শব্দ উত্থিত হইল—লোক-জন, পানওয়ালা, পাঁউরুটিওয়ালা, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। লোক যে যেখানে ছিল দাঁড়াইয়া উঠিল। রাধা একটি কুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ডাক-গাড়ি আসিতেছে। দার্জিলিং মেল।

অল্পক্ষণ পরেই সশব্দে বিশাল ট্রেণখানা প্লাটফর্মের ও প্রান্তে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়, হাঁকাহাঁকি, লোক-জনের দৌড়াদৌড়ি, পুরি তরকারি, পান-বিড়ি-সিগারেট, কুলি কুলি, ইধার আও, হৈ হৈ ব্যাপার। স্টেশন সরগরম হইয়া উঠিল; রাধা আর নবু যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তারই সামনে ডাক গাড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি থামিল।

রাধা অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে কামরাগুলি। কি রকম পুরু চামড়ার গদি-আঁটা বেঞ্চি। সাহেব, মেম, মোমের পুতুলের মত তাদের ছেলে-মেয়েরা···দামী শাড়ি-পরা সুন্দরী বাঙালী বড়লোকের মেয়েরা···সুবি কোথায় লাগে এদের কাছে? বেহারারা ট্রের উপর চায়ের জিনিস বসাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে···একটি অতি সুন্দর ছ'সাত বছরের ফ্রক্-পরা সাহেবদের মেয়ে প্লাটফর্মে নামিয়া লাফাইতে ছিল—তার মা আসিয়া তার হাত ধরিয়া গাড়ির মধ্যে উঠাইয়া লইতে লইতে কি বলিল—হিট্ হিট্ প্রিং প্রিং—কেমন মজার কথা ওদের?···হাসি পায় শুনিলে। সত্যি কি চমৎকার দেখিতে খুকিটা?

নবু বলিল—এই দিকে এসে ভাখো দিদি, খাবার গাড়ি।

একখানা খুব বড় লম্বা গাড়ির মধ্যে সারি সারি টেবিল পাতা, টেবিলের উপর ধপ্‌ধপে চাদর, কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজানো, চক্‌চকে সব কাঁচের বাসন। মেলা সাহেব মেম খাইতে বসিয়াছে। বাঙালীর মেয়েও আছে তাদের মধ্যে। তবে বেশি নয় দু'একজন। আঠারো উনিশ বছরের একটি বাঙালীর মেয়ে বেশি দামের টিকিটের কামরা হইতে নামিয়া প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া ফল কিনিতেছে।

রাধা কি দেখিল, কি পাইল জানিনা কিন্তু ডাক গাড়িখানা, তার সুশ্রী সুবেশ আরোহীদল ও সুসজ্জিত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি লইয়া তাহার মনে একটি অপূর্ব আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল! সমস্ত দার্জিলিং মেলখানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা—কিংবা কোনো প্রতিভাবান গায়কের মুখে শোনা সংগীত। রাধার মনে হইল, এই ভাল কাপড়-চোপড়-পরা সুন্দর চেহারার মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকাদের সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ'আনা পয়সা খরচ করিয়া রাণাঘাট স্টেশনে আসে। যে পৃথিবীতে এরা আছে,

সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, স্থবির হৃদয়হীনতা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা-মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার ছ'ভরির হার ছড়ার লোকশানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়। কি চমৎকার! দেখিলে জীবন সার্থক হয় বটে, মন ভরিয়া ওঠে বটে। সংসারে এত সুখ, এত রূপ, এত আনন্দও আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না—কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়িখানা ছাড়িয়া গেলে রাধা দেখিল যে, সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ে নতুন বল, চোখে নতুন ধরণের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়—যে সংসারে অসহায়, অনাহূত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন এবং যার শেষ সম্বল ছ'ভরির হারছড়াটা পর্যন্ত শাশুড়ী ঘুচাইয়া দিয়াছে। একটুখানি সহানুভূতির কথা ও মিষ্টি হাসির লোভে তাকে কালই ডোবার ঘাটে স্থবির অজস্র খোসামোদ করিতে হইবে।

নবুকে বলিল—ওদের কাছ থেকে এক পেয়ালা চা নিয়েই আয় নবু, তুই আর আমি ভাগ ক'রে খাই। যাক্ গে চার পয়সা। আমাদের ট্রেনের এখন অনেক দেরি। ততক্ষণ এক পেয়ালা চা খেয়ে নেওয়া যাক্। বাড়ি গিয়ে যেন মার কাছে বলিস্ নে।

যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ

আপনারা একালে যদু হাজরার নাম বোধ হয় অনেকেই শোনেন নি।

আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজরাকে কে না জানত? চব্বিশপরগণা থেকে মুর্শিদাবাদ এবং ওদিকে বর্দমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড় বারোয়ারির আসরে যাত্রা হ'ত সে সব স্থানে দশ বার ক্রোশ পর্যন্ত যদু হাজরার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়াতো। কাঠের পুতুল চোক মেলে চাইত—যদু হাজরার নাম শুনলে। আপনারা কেউ যদু হাজরাকে 'নল দময়ন্তী' পালাতে নলে-র পার্ট ক'রতে দেখেন নি? তা হ'লে জীবনের বহু ভাল জিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভাল জিনিস হারিয়েছেন।

আমি দেখেছি।

সে একটা অদ্ভুত দিন আমার বাল্য জীবনে। তখন আমার বয়স হবে বার কি তের। আমাদের গ্রামের একটি নববিবাহিতা বধূর বাপের বাড়িতে কি একটা কাজ উপলক্ষে নব বধূটিকে নৌকা ক'রে তার বাড়িতে আমাকেই রেখে আসতে হবে ঠিক হ'ল।

পৌষ মাস। খুব শীত পড়েছে। বধূটি গ্রাম সম্পর্কে আমার গুরুজন, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ও বটে। দুজনে গল্পগুজবে সারা পথ কাটালুম। তাঁর বাপের বাড়ি পৌঁছে আমি কিন্তু পড়লুম একটু মুস্কিলে। মস্ত বড় বাড়ি; উৎসব উপলক্ষে অনেক জায়গা থেকে আত্মীয়-কুটুম্বের দল এসেছে তার মধ্যে দু'টি শহর অঞ্চলের চালাক চতুর জ্যাঠা ছেলে আমার বড় অস্বস্তির কারণ হ'য়ে উঠ্ল। আরও এত ছেলে থাক্তে তারা আমাকেই অপ্রতিভ ক'রে কেন যে এত আমোদ পেতে লাগল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটি ছেলের বয়স বছর পনের হবে। রং ফর্সা, ছিপছিপে, সিল্কের রাঙা পাঞ্জাবি গায়ে. —নাম ছিল যতীন, নামটা এখনও মনে আছে। সে আমাকে বল্লে—কি পড়?

আমি বললাম—মাইনর সেকেন ক্লাসে পড়ি।

সে বল্লে—বলত হাঁচি মাইনাস কাসি কত?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক্।

বাংলা স্কুলে পড়ি, 'মাইনাস্' কথার মানে তখন জানিনে। তা ছাড়া একি অদ্ভুত প্রশ্ন! আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে সে অমনি আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে—'হবগবলিন' মানে কি?

আমি ইংরাজী পড়ি বটে কিন্তু সে সুশীল ও সুবোধ আবদুলের গল্প, দারোয়ান ও জেলের গল্প, বড় জোর গুটিপোকা ও রেশমের কথা। সে সবের মধ্যে ঐ অদ্ভুত কথাটা নেই। লজ্জায় লাল হ'য়ে বললুম—পারব না।

কিন্তু তাতেও আমার রেহাই নেই। ভগবান সেদিন লোক সমাজে আমাকে নিতান্ত হেয় প্রমাণিত ক'রতেই বোধহয় যতীনকে ওদের বাড়িতে হাজির করেছিলেন। সে দু'হাতের আঙুল-গুলো প্রসারিত ক'রে আমার সামনে দেখিয়ে বল্‌লে—এতগুলো কলা যদি একপয়সা হয় তবে পাঁচটা কলার দাম কত?

আমি বিষণ্ণ মুখে ভাবছি, ওর দু'হাতের মধ্যে কতগুলো কলা ধরতে পারে—সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে আমার মাইনর স্কুলে সেকেন ক্লাসে অর্জ্জিত বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপন্ন ক'রলে।

তারপর থেকে আমি তাকে ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চল্‌তে লাগলুম। বয়স তার আমার চেয়ে বেশিও বটে, শহর অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলে পড়েও বটে, দরকার কি ওর সঙ্গে মিশে? তা ছাড়া চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি আর কত অপমানই বা সহ্য করি!

কিন্তু সে আমায় যতই জ্বালাতন করুক, জীবনে সে আমার একটা বড় উপকার করেছিল—সে জন্যে আমি তার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ। সে যদু হাজরার অভিনয় আমাকে দেখিয়ে ছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে আমায় বল্‌লে—এই, কি তোমার নাম, রাজগঞ্জের বাজারে বারোয়ারি হবে, শুন্‌তে যাবে?

রাজগঞ্জ ওখান থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ। হেঁটেই যেতে হবে, কিন্তু যাত্রা শোনবার নামে আমি এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লাম যে, এই দীর্ঘপথ এর সাহচর্যে অতিক্রম করবার যন্ত্রনার দিকটা একেবারেই মনে পড়ল না।

তথাপি সারা পথ যতীন ও তার দলের তারই বয়সী জন কয়েক ছোকরা অশ্লীল কথাবার্তা ও গানে আমাকে নিতান্ত উত্যক্ত ক'রে তুল্‌লে। আমি যে বাড়ির আবহাওয়ায় মানুষ,—আমার বাপ, মা, জ্যাঠামশায় সকলেই নিতান্ত বৈষ্ণব প্রকৃতির। প্রায় আমারই বয়সী ছেলের মুখে ও রকম টপ্পা ও খেউড় শুনে আমার অনভিজ্ঞ বালক মনের নীতিবোধ ক্রমাগত বাধা পেতে লাগল।

ওরা কিন্তু আমায় রাজগঞ্জের বাজারে পৌঁছে একেবারে রেহাই দিলে। সেই অপরিচিত জনসমুদ্রে আমায় একা ফেলে ওরা যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল—আমি কোন সন্ধানই ক'রতে পারলুম না।

যাত্রা বোধ হয় রাত্রে, এখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, বারোয়ারির খুব বড় আসর, অনেক ঝাড়-লণ্ঠন টাঙিয়েছে—বাঁশের জাফরির গায়ে লাল-নীল কাগজের মালা ও ফুল, আসরের চারিধারে

রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিঙের মধ্যে বোধহয় ভদ্রলোকদের বসবার জায়গা—বাইরে বাজে লোকদের।

রাজগঞ্জের বাজারে আমি জীবনে আরও দু'একবার বাবার সঙ্গে এর আগে যে না এসেছি এমন নয় কিন্তু এখানে না আমি কাউকে চিনি, না আমাকে কেউ চেনে। রেলিঙের ভেতরে জায়গা আমার মত ছোট ছেলেকে দিলে না—আমিও সাহস ক'রে তার মধ্যে ঢুকতে পারলুম না, বাইরে বাজে লোকদের ভিতরের মধ্যে ঠেসাঠেসি ক'রে ইট্ পেতে ব'সতে গেলুম—তাতেও নিস্তার নেই—বারোয়ারির মুরুব্বি পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের সে জায়গায় থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বিশিষ্ট লোকদের জন্যে বেঞ্চি আনিয়ে পাতিয়ে দেয়;—আবার সেখানে গিয়ে বসি, সেখানেও কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থা। অতি কষ্টে আসরের কোণের দিকে দাঁড়াবার জায়গা কোনো মতে খুঁজে নিলুম। অন্যান্য বাজে লোকদের কি কষ্ট! তারা প্রায়ই চাযাভূষো লোক, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে থেকে পর্যন্ত অনেকে মহা আগ্রহে যাত্রা শুনতে এসেছে—এই শীতে তারা কোথায়ও বসবার জায়গা পায় না, কেউ তাদের বসবার বন্দোবস্ত করে না—স্টেশন মাস্টারবাবু, মালবাবু, কেরানীবাবু ও পোস্ট মাস্টারবাবুদের যত্ন ক'রে বসাতে সবাই মহা ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হ'ল। 'নল-দময়ন্তীর' পালা। একটু পরেই যদু হাজরা 'নল' সেজে আসরে ঢুকতেই (তখন হাত তালির রেওয়াজ ছিল না) চারিদিকে হরিধ্বনি উঠ্ল। অত বড় আসর মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ও নীরব হ'য়ে গেল।

আমি যদু হাজরার নাম কখনো এর আগে শুনিনি, এই প্রথম শুন্লুম। মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলুম, শ্যামবর্ণ, সুপুরুষ—বয়স তখন বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, ত্রিশও হ'তে পারে পঞ্চাশও হ'তে পারে। কিন্তু কি কথা বলবার ভঙ্গি, কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত পা নাড়ার ঢং।

আমার এগারো বৎসরের জীবনে আর কখনো অমনটি দেখি নি। ভিড়ের কষ্ট ভুলে গেলুম, কিছু খেয়ে বেরুই নি, খিদেতে পেটের মধ্যে যেন বোল্তায় হুল ফোটাচ্ছে—সে কথা ভুললুম—যাত্রা থেমে গেলে এত রাত্রে একা অজানা স্থানে শীতে কোথায় যাব—সে সব কথাও ভুলে গেলুম—পঞ্চ দেবতা পঞ্চ নলরূপে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় এসে বসেছেন, আসল 'নল'-রূপী যদু হাজরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে বল্ছেন—

> একি হেরি চৌদিকে আমার—
> মম সম রূপ নল চতুষ্টয়
> মম সম সাজে সাজি বসিয়াছে
> সভা মাঝে।
> বুঝিতে না পারি কিবা মায়াজাল
> ইষ্টদেব,
> পুরাও বাসনা মোর, মায়াজাল কেল ছিন্ন করি।

এমন সময় বরমালা হস্তে দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করিতেই নল ব'লে উঠলেন—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
'আনন্দ-বারতা ? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।—

অপর চার জনও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে ব'লে উঠল—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
আনন্দ-বারতা ? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।

প্রকৃত নলের তখন কি বিমূঢ় দৃষ্টি !

তারপরে বনে বনে ভ্রাম্যমাণ রাজ্যহীন সহায় সম্পত্তিহীন উন্মত্ত নলের সে কি করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র ! কতকাল তো হ'য়ে গেল, যদু হাজরার সে অপূর্ব অভিনয় আজও ভুলিনি। চোখের জল কতবার গোপনে মুছলুম সারা রাত্রির মধ্যে, পাছে আশ পাশের লোক কান্না দেখ্‌তে পায় কতবার হাঁচি আনবার ভঙ্গিতে কাপড় দিয়ে মুখ চেপে রাখলুম। যাত্রা শেষ রাত্রে ভাঙল। কিন্তু পরদিনও আবার যাত্রা হবে শুনে আমি বাড়ি গেলুম না। একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে আবার যাত্রা হ'ল—শিখিধ্বজের পালা। যদু হাজরা সাজলে শিখিধ্বজ। এটা নাকি তার বিখ্যাত ভূমিকা, শিখিধ্বজের ভূমিকায় যদু হাজরা আসর মাতিয়ে পাগল ক'রে দিলে। সেই এক রাত্রের অভিনয়ের জন্যে চার পাঁচখানা সোনা ও রূপোর মেডেল পেলে যদু হাজরা। যাত্রা ভাঙল যখন তখন রাত বেশি নেই আসরে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে সকালে একা নিজের গ্রামে ফিরে এলুম।

তারপর কয়েক বছর কেটেছে। তখন আমি আরও একটু বড় হয়েছি—স্কুলে ভর্তি হয়েছি। যদু হাজরার কথা প্রায় এর ওর মুখে শুনি। যেখানে যাত্রাদলের কথা ওঠে, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যাত্রাদলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা যদু হাজরা।

আমি কিন্তু বহুদিন যদু হাজরাকে আর দেখলুম না।

এর অনেক কারণ ছিল।

আমি দূরের শহরের স্কুল-বোর্ডিংএ গেলুম।

মন গেল লেখা পড়ার দিকে, বাঁধা রুটিনের মধ্যে জীবনের মুক্ত গতি বদ্ধ হ'য়ে পড়ল। এ্যালজেব্রার আঁক, জ্যামিতির একষ্ট্রা ইংরাজী ভাষার নেশা, ফুটবল, ডিবেটিং ক্লাব, খবরের কাগজ জীবনের মধ্যে নানা পরিবর্তন এনে দিলে। ছেলেবেলার মত যে, যেখানে যাত্রার নাম শুনব—সেখানেই দৌড়ে যাবো—তা কে জানে চারক্রোশ, কে জানে ছ'ক্রোশ—এমন মন ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। ইচ্ছে হ'লেও হয়ত স্কুলের ছুটি থাকে না, স্কুলের ছুটি থাক্‌লেও বোর্ডিংএর সুপারিনটেনডেণ্ট ছাড়তে চান না—নানা উৎপাত।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলুম, থিয়েটার কাকে বলে জানতুম না। যে শহরে পড়তুম, সেখানে উকিল মোক্তারদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল, তাঁরা একবার থিয়েটার ক'রলেন, পালাটা ঠিক্ মনে নেই—বোধহয় 'প্রতাপাদিত্য'। ভাষা ও ঘটনার বিন্যাসে থিয়েটারের পালা আমাকে মুগ্ধ ক'রলে। ভাবলুম যাত্রা এর চেয়ে ঢের খারাপ জিনিস। প্লটের এমন বাঁধুনি তো যাত্রার পালাতে নেই? তারপর অনেকবার উকিলদের ক্লাবে থিয়েটার দেখলুম—ছেলেবেলার মন ধীরে ধীরে বদলাতে সুরু করেছে, বাজারে যাত্রা হ'ল বারোয়ারির সময়ে, কলকাতার দল, কিন্তু তাতে আগেকার মত আনন্দ পেলুম না।

তারপর কলকাতায় এলুম। তখন নূতন মতের অভিনয় সবে কলকাতায় সুরু হয়েছে। বড় বড় বহু বিখ্যাত নটদের অভিনয় দেখবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম ঘটল, তাদের নানা পালাতে নানা অভিনয় দেখলুম,—বিলিতী ফিল্মে বিশ্ব-বিখ্যাত নটদের অভিনয় অনেক দিন ধ'রে দেখলুম—মানুষ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়, উকিল-মোক্তারদের প্রধান অভিনেতা গুরুদাস ঘোষ—যাকে এতকাল মনে মনে কত বড় ব'লে ভেবে এসেছি—এখন তার কথা ভাবলে আমার হাসি পায়।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরি করি। কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতারাও তখন আমার কাছে পুরানো ও একঘেয়ে হ'য়ে গিয়াছে,—থিয়েটার দেখাই দিয়েছি ছেড়ে। ফিল্ম সম্বন্ধেও তাই। খুব নামজাদা অভিনেতা না থাকলে সে ছবি দেখতে যাইনে—যাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি একদিন এখন তাদের অনেকের সম্বন্ধেই মত বদলেছি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি একটা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে শুনি দেশে বারোয়ারি। শুনলুম কলকাতা থেকে বড় যাত্রার দল আসছে—দেড়শো টাকা এক রাত্রির জন্যে নিয়েছে, এমন দল নাকি এদেশে আর কখনও আসে নি। ভাল বিলিতী ফিল্ম ছাড়া দেখিইনে, থিয়েটার দেখা ছেড়ে দিয়েছি ভাল লাগেনা ব'লে—এ অবস্থায় রাত জেগে যাত্রা দেখবার যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মনে জাগবে না—একথা বলাই বাহুল্য। যাত্রা আবার কি দেখবো! নিতান্ত বাজে জিনিস—কে কষ্ট ক'রে এই গরমের মধ্যে লোকের ভিড়ে ব'সে যাত্রা দেখতে যাবে?

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ছাড়লেন না। বারোয়ারির কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ অনুরোধ ক'রে গেলেন—আমার যাওয়া চাই-ই। কি করি, ভদ্রতা ব'লেও তো একটা ব্যাপার আছে। খানিকটা দেখে না হয় উঠে এলেই হবে। নিতান্ত না যাওয়াটা ভাল দেখাবে না হয়তো—বিশেষ দেশে যখন তত বেশি যাতায়াত নেই।

সন্ধ্যার সময় যাত্রা ব'সল। যাত্রা জিনিসটা দেখিনি অনেক কাল—দেখে বুঝলুম সেকালের যাত্রা আর নেই। জুড়ির গান, মেডেলধারী বেহালাদারদের দীর্ঘ কসরৎ—এ সব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সলমা-চুমকির কাজ করা সাজ পোষাকও আর নেই-কলকাতার

থিয়েটারের হুবহু অনুকরণ যেমন সাজ-পোষাকে, তেমনি তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়ের ঢঙে। এমন কি কয়েকজন অভিনেতার বলবার ধরণ, মুখভঙ্গি ও হাত পা নাড়ার কায়দা, কলকাতার স্টেজের কোনো কোনো নামজাদা বিশিষ্ট অভিনেতার মত। দেখলুম, আসরের শ্রোতার দলের মধ্যে যারা তরুণ বয়স্ক তাদের কাছে এরা পেলে ঘন ঘন হাততালি। কেউ কেউ বল্‌লে—ওঃ! কি চমৎকার নকলই করেছে, কলকাতার স্টেজের অমুককে—বাস্তবিক দেখবার জিনিস বটে!

এমন সময় আসরে ঢুকলো একজন মোটা কালো ও বেঁটে লোক। কিসের পার্টে তা আমার মনে নেই। লোকটির বয়স ষাটের ওপর হবে, তবে স্বাস্থ্যটা ভাল। কেউ তার বেলা একটা হাততালিও দিলে না, যদিও সে দর্শকের খুশি করবার জন্যে অনেক রকম মুখভঙ্গি ক'রলে, অনেক হাত পা নাড়লে। আমার সঙ্গে একদল স্কুলের ছেলে বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল—এ বুড়োটাকে আবার কোথা থেকে জুটিয়েছে? দেখ্‌তে যেন একটা পিপে। এ্যাক্‌টিং করছে দেখনা—ঠিক যেন সং!

পাশের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—ও এককালে খুব নামজাদা এ্যাক্টর ছিল হে তখন তোমরা জন্মাওনি। ওর নাম যদু হাজরা।

আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইলুম, তারপর একবার বৃদ্ধ অভিনেতাটির দিকে চাইলুম,। বাল্য দিনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সেই কনকনে শীতের রাত্রি, সেই শহরে ডেঁপো-ছেলেদের সঙ্গ, সেই তারা আমাকে ফেলে কোথায় পালালো—তারপর বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক অপরিচিত গঞ্জের বারোয়ারির আসরে ময়রার দোকানে খাবার খেয়ে আমার সেই একা তু'দিন বিদেশে কাটানো। সে রাত্রে যার অভিনয় দেখে আমার বালক মন মুগ্ধ, বিস্মিত, উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল—সে যদু হাজরা, এই?

এক সময়ে তার যে ধরণের মুখ ভঙ্গি দেখে ও কথাবার্তার উচ্চারণ শুনে দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌ত, আজও যদু হাজরা সেই সব হুবহু ক'রে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে—অথচ দর্শকেরা খুশি নয় কেন? খুশি তো দূরের কথা তাদের মধ্যে অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে কেন, ব'সে ব'সে এই কথাটাই ভাবলুম।

মন যেন কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। অপর লোকের কথা কি, আমারই তো যদু হাজরার হাব-ভাব হাস্যকর ঠেক্‌ছে! কেন এমন হয়?

বাল্য দিনের সেই যাত্রার আসরে একে আমি দেখেছিলুম, এর সেই অভিনয় এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির সঙ্গে রাজার কনিষ্ঠা পত্নী ভ্রষ্টা, রাজা একদিন তু'জনকে নির্জনে প্রেমালাপে নিমগ্ন দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। কি ভেবে বললেন—মধুচ্ছন্দা, আমি প্রৌঢ়, তুমি তরুণী, এই বয়সে তোমায় বিবাহ ক'রে ভুল করেছি। তোমায়

আমি এখনও ভালবাসি, প্রাণে মারবো না—তোমরা দু'জনে আমার চোখের সামনে প্রেমিক প্রেমিকার মত হাত ধরাধরি ক'রে চলে যাও। কিন্তু আমার রাজ্যের বাইরে। আর কখনও তোমাদের মুখ না দেখি। ওরা ধসাপ'ড়ে দু'জনে ভয়ে ও লজ্জায় সংকুচিত হ'য়ে পড়েছে। রাজার সামনে একাজ কেমন ক'রে ক'রবে? হাত ধরাধরি ক'রে কেমন ক'রে যাবে? রাজা তলোয়ার খুলে বললেন—যাও, নইলে দু'জনকেই কেটে ফেলব—ঠিক ওই ভাবেই যাও।

শেষে তারা তাই ক'রতে বাধ্য হ'ল। রাজা স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ছিলেন—তারা যখন কিছুদূর চ'লে গিয়েছে, তখন তিনি হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত মুক্ত তলোয়ার হাতে 'হা—হা—হা' রবে একটা চীৎকার ক'রে তাদের দিকে ছুটে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে তারাও আসরের বাইরে চ'লে গেল। মনে আছে রাজার সেই চমৎকার ভঙ্গিতে, তার হতাশ 'হা—হা'—রবের মধ্যে এমন একটা ট্রাজিক সুর ছিল, আসর শুদ্ধ দর্শককে তা বিচলিত করেছিল। আমি তখন যদিও নিতান্ত বালক, কিন্তু আমার মনে সেই দৃশ্যটি এমন গভীর দাগ দিয়েছিল যে, এই এত-বয়সেও তা ভুলিনি।

পরের দিন যদু হাজরার সঙ্গে দেখা হ'ল। ওদের যেখানে বাসা দিয়েছে, তার সামনে একটা টুলের ওপর ব'সে তামাক টানছে। আমি বললুম—কাল আপনার পার্ট বড় চমৎকার হ'য়েছে। বৃদ্ধ আগ্রহের সুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—আপনার ভাল লেগেছে?

বললুম—চমৎকার। এমন অনেকদিন দেখিনি।

কথাটার মধ্যে সত্যের অপলাপ ছিল। বৃদ্ধ খুব খুশি হ'ল। প্রশংসা জিনিসটা বেচারীর ভাগ্যে অনেকদিন জোটেনি। আসরে কাল যখন তরুণ অভিনেতাদের বেলায় ঘন ঘন হাততালি পড়েছে, যদু হাজরার ভাগ্যে সে জায়গায় বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি।

বৃদ্ধ বল্‌লে—আপনি বোঝেন তাই আপনার ভাল লেগেছে। আর কি মশাই সেদিন আছে? এখনকার সব হয়েছে আর্ট—আর্ট, সে যে কি মাথামুণ্ডু তা বুঝিনে। বৌ মাস্টারের দলে ভৃগু সরকার ছিল। রাবণের পার্টে অমন এ্যাক্টো আর কেউ কখনও ক'রবে না। আমি সেই ভৃগু সরকারের সাকরেদ—বুঝলেন? আমায় হাতে ধ'রে শিখিয়েছেন তিনি। মরবার সময় আমার হাত ধ'রে ব'লে গেলেন—যদু তোমায় যা দিয়ে গেলাম, তোমার জীবনে আর ভাবনা থাকবে না।

আমি বললুম—এ বয়েসে আপনি আর চাকরি করেন কেন?

—না ক'রে কি করি বলুন? বড় ছেলেটি উপযুক্ত হ'য়েছিল, আজ বছর দুই হ'ল কলেরা হ'য়ে মারা গেল। তার সংসার আমারই ওপর, নাতনীটির বিয়ে দিতে হবে আর কিছুদিন পরেই। পয়সা আগে যা রোজগার করেছি, হাতে রাখতে পারিনি। এখন আর তেমন মাইনেও পাইনে। দেড়শো টাকা পর্যন্ত মাইনে পেয়েছি এক সময়—আমার জন্যে

অধিকারী আলাদা দুধ বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিল, যখন ভূষণ দাসের দলে থাকতাম। এখন পাই পঁইত্রিশ টাকা মাইনে। আর সতীশ ব'লে ওই-যে ছোকরা কাল রামের পার্ট ক'রলে—সে পায় আশি টাকা। ওরা নাকি আর্ট জানে। আপনিই বলুনতো, কাল ওর পার্ট ভাল লাগল আপনার, না আমার পার্ট ভাল লাগল? এখনকার আমলে ওদেরই খাতির বেশি অধিকারীর কাছে। আমাদের চাকরি বজায় রাখাই কঠিন হয়েছে।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, যদু হাজরার এতদিন বেঁচে থাকাটাই উচিত হয়নি। চল্লিশ বছর আগে তরুণ যদু হাজরাকে বৌ মাস্টারের দলের ভূগু সরকার যে ভাবে হাত পা নাড়বার ভঙ্গি ও উচ্চারণের পদ্ধতি শিখিয়েছিল, বৃদ্ধ যদু হাজরা আজও যদি তা আসরে দেখাতে যায়, তবে বিদ্রূপ ছাড়া তার যে আর কিছু প্রাপ্য হবে না—একথা তাকে বলি কেমন ক'রে? কালের পরিবর্তন তো হয়েছেই তা ছাড়া তরুণ বয়সে যা মানিয়েছে এ বয়সে তা কি আর সাজে?

এই ঘটনার বছর পাঁচ ছয় পরে নেবুতলার গলি দিয়ে যাচ্ছি; একটা বেনেতি মশলার দোকানে দেখি যদু হাজরা ব'সে আছে। দেখেই বুঝলুম দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে সে ঠেকেছে। পরণে অর্ধমলিন থান, পিঠের দিকটা ছেঁড়া এক ময়লা জামা গায়ে। আমায় দেখে সে চিনতে পারলে না। আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—আপনি চিনতে পারুন আর নাই পারুন, আপনাকে না চেনে কে! আগুন কি ছাই চেপে ঢেকে রাখা যায়? তা এখন বুঝি কলকাতায় আছেন?

বৃদ্ধের চোখে জল এলো প্রশংসা শুনে। বললে, আর বাবুমশায়, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। এই দেখুন আজ তিনটি বছর চাকরি নেই। কোনো দলে নিতে চায় না। বলে, আপনার বয়স হয়েছে হাজরা মশাই, এ বয়সে আর আপনার চাকরি করা পোষাবে না, আসল কথা আমাদের আর চায় না। ভাল জিনিসের দিন আর নেই, বাবুমশায়। এখনকার কালে সব হয়েছে মেকি। মেকির আদর এখন খাঁটি জিনিসের চেয়ে বেশি। আমার গুরু ছিলেন বৌ-মাস্টারের দলের ভূগু সরকার, আজকালকার কোন্ ব্যাটা অ্যাক্টার ভূগু সরকারের পায়ের ধুলোর যুগ্যি আছে? 'রাই উন্মাদিনী' পালায় আয়ান ঘোষের পার্টে যে একবার ভূগু সরকারকে দেখেচে—

আরও বার কয়েক প্রশংসা ক'রে এই ভগ্ন হৃদয় বৃদ্ধ নটকে শান্ত করলুম। জিজ্ঞাসা ক'রে ক্রমশ জানলুম এই মশলার দোকানেই বৃদ্ধের বর্তমান আশ্রয়স্থল। কাছেই গলির মধ্যে কোনো ঠাকুর বাড়িতে এক বেলা খেতে দেয়, রাত্রে এই দোকানটাতে শুয়ে থাকে। দোকানের মালিক বোধ হয় ওর জানাশোনা।

কার্যোপলক্ষে গলিটা দিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করি, আর ফিরবার সময়ে যদু হাজরার

সঙ্গে একটু গল্প গুজব করি। একদিন বৃদ্ধ বল্‌লে—বাবুমশাই, একটা কথা ব'লব? একদিন একটু মাংস খাওয়াবেন? কতকাল খাইনি।

একটা ভাল রেস্টুরেন্টে তাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালুম। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হ'ল, বৃদ্ধ কতদিন ভাল জিনিস খেতে পায়নি। তারপর দু'জনে একটা পার্কে গিয়ে ব'সলুম। রাত তখন ন'টা বেজে গিয়েছে। শীতকাল, অনেকে পার্ক থেকে চ'লে গিয়েছে। একটা বেঞ্চে ব'সে বৃদ্ধ নিজের সম্বন্ধে কত কথাই বল্‌লে। কোন্ জমিদার কবে তাকে আদর ক'রে ডেকে নিজের হাতে সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার অভিনয় দেখে কবে কোন মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল, হাতীবাঁধার রাজা নিজের গায়ের শাল খুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলতে বলতে মাঝে মাঝে যেন ও অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েচে। পঁচিশ বৎসর আগের কোন্ তরুণী প্রেমিকার হাসিমাখা চাহনি ওর আবেশ মধুর যৌবনদিনগুলির উপর স্পর্শ রেখে গিয়েছে—কে জানে সেই সব দিন, সেই সব বিস্মৃতপ্রায় মুখ ও মনে আনবার চেষ্টা করছিল কিনা। আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললুম—শিখিধ্বজ আর মধুছন্দার সেই অভিনয় আমার বড় ভাল লাগে, সেই যখন রাজা বল্‌লেন, 'তোমরা প্রেমিক প্রেমিকার মত হাত-ধরাধরি ক'রে চ'লে যাও'—সেই জায়গাটা এখনও ভুলিনি।

বৃদ্ধ নট সোজা হ'য়ে ব'সল। তার চোখে যৌবন-কালের সেই হারানো দীপ্তি যেন ফিরে এলো। বল্‌লে—ওঃ সে কত কালের কথা যে। ও পালা গেয়েছি প্রসন্ন নিয়োগীর দলে থাকতে। দেখবেন—ক'রে দেখাব?

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম—মনে আছে আপনার? দেখান না?

ভাগো পার্কে তখন বিশেষ কেউ ছিল না। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো—আমি হলুম মধুচ্ছন্দা। ও নিজের পার্ট ব'লে যেতে লাগল—দেখলুম কিছুই ভোলেনি। শেষে আমার দিকে ফিরে জলদগম্ভীর স্বরে বল্‌লে—যাও মধুচ্ছন্দা, তোমরা দু'জনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত-ধরাধরি ক'রে চ'লে যাও। তারপর আমি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ তার সেই পুরানো ট্রাজিক সুরে 'হা-হা-হা-হা' ক'রে আমার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এলো। সত্যই কি অপূর্ব সে সুর! কি অপূর্ব ভঙ্গি! ভগ্ন হৃদয় বৃদ্ধ নট তার জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি ওর মধ্যে ঢেলে দিলে। যেন সত্যই ও ভগ্নহৃদয় প্রৌঢ় রাজা শিখিধ্বজ, অবিশ্বাসিনী মধুচ্ছন্দা ওকে উপেক্ষা ক'রে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে হাত-ধরাধরি ক'রে চ'লে গেল! অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধ যদু হাজরা ত্রিশ বছর আগেকার তরুণ নট যদু হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেল।

এই যদু হাজরার শেষ অভিনয়। এর মাসখানেক পরে একদিন নেবুতলায় সেই মশলার দোকানটাতে খোঁজ ক'রতে গিয়ে শুনলুম সে মারা গিয়েছে। শুনে মনে হ'ল যদি সে আরো বছর পনেরো আগে মারা যেতো!

রাণুর প্রথম ভাগ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৯৬ দ্বারভাঙ্গা। দ্বারভাঙ্গায় এঁদের বহুকালের বাস, আদি বাস হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় চাতরা গ্রামে। শিক্ষা, দ্বারভাঙ্গায়, কলকাতায় ও পাটনায়। পাটনা বি-এন, কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখন দ্বারভাঙ্গা রাজপ্রেসে অফিসার-ইন্-চার্জ-এর পদে আছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দান অতি অল্প। কিন্তু এতো অল্পের মধ্যেই যে তিনি তাঁর মৌলিকত্ব ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, খুব কম লেখকের মধ্যেই সে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। হাস্যরসই এঁর সাহিত্যের মূল উপাদান। নেই নেই ক'রেও বাংলা সাহিত্যে রস রচনা বড় কম হয়নি। এই প্রসঙ্গ উঠলে বিশেষ ক'রে অমৃতলাল বসু, পরশুরাম, বীরবল, কেদারনাথ, বনফুল ও রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের কথা মনে পড়ে। হাস্যরসের নানা স্তর ও ভঙ্গি আছে; হাল্কা কথার সুড়সুড়ি দেয়া লঘু হাসি, আজগুবি কথায় পেটে খিল-ধরা বিকট হাসি, বিদ্রূপচ্ছলে ব্যঙ্গ কশাঘাতের মর্মান্তিক হাসি, অনাবিল আনন্দের মধুর হাসি, আর হাসির পেছনে অশ্রুকে লুকিয়ে রাখা—বেদনাময় সহানুভূতির হাসি। শেষের পর্যায়ভুক্তিতে পড়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্য। এ পর্যন্ত এঁর মাত্র দু'টি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে; "রাণুর প্রথম ভাগ" এবং সদ্য প্রকাশিত "রাণুর দ্বিতীয় ভাগ"।

রাণুর প্রথম ভাগ

মার ভাইঝি রাণুর প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।

হার সহস্রবিধ অন্তরায়ের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—এক তাহার প্রকৃতিগত অকালপক্ক গিন্নীপনা, আর অন্যটি তাহার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাহার দৈনিক জীবন-প্রণালী লক্ষ্য করিলে মনে হয় বিধাতা যদি তাহাকে একেবারে তাহার ঠাকুরমার মত প্রবীণা গৃহিণী এবং কাকার মত এম-এ, বি-এল, করিয়া পাঠাইতেন তাহা হইলে তাহাকে মানাইতও ভাল এবং সেও সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরবর্তী ভাবী নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া যেন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীর-মনটিতে আর আঁটিয়া উঠিতেছে না—রাণুর কার্যকলাপ দেখিলে এই রকমই একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমত, শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া ওঠে—খেলাঘর সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ফ্রক জামাও না, এমন কি নোলক পরাও নয়। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে, আমার কি আর ও সবের বয়েস আচে মেজকা?

বলিতে হয়, না মা, আর কি—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল।

রাণু চতুর্থ কালের কাল্পনিক দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মুখটা অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে।

আর দ্বিতীয়ত—কতকটা বোধ হয় শৈশবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াই—তাহার ঘোরতর

বিতৃষ্ণা প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাকার আইন পুস্তক পর্যন্ত আর সবগুলির সহিতই তাহার বেশ সৌহার্দ আছে এবং তাহাদের সহিতই তাহার দৈনিক জীবনের অর্ধেকটা সময় কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রথম ভাগের নামেই উৎসাহ একেবারে শিথিল হইয়া আসে। বেচারীর মলিন মুখখানি ভাবিয়া আমি মাঝে মাঝে এলাকাড়ি দিই—মনে করি, যাক্‌গে বাপু, মেয়ে—নাইবা এখন থেকে বই শ্লেট নিয়ে মুখ গুঁজড়ে রইল, ছেলে হওয়ার পাপটা তো করে নি; নেহাৎই দরকার বোধ করা যায়, আর একটু বড় হ'ক, তখন দেখা যাবে 'খন।

এই রকমে দিনগুলা রাণুর বেশ যায়; তাহার গিন্নীপনা সতেজে চলিতে থাকে এবং পড়াশুনারও বিষম ধুম পড়িয়া যায়। বাড়ির নানাস্থানের অনেক-সব বই হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হয় তাহার খোঁজ দুরূহ হইয়া উঠে এবং উপরের ঘর নীচের ঘর হইতে সময়-অসময়ে রাণুর উঁচু গলায় পড়ার আওয়াজ আসিতে থাকে —ঐ ক-য়ে য-ফলা ঐক্য, ম-য়ে আকার ণ-য়ে হ্রস্বই ক-য়ে য-ফলা মাণিক্য, বা—পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল—অথবা তাহার রাঙা কাকার আইন মুখস্ত করার ঢঙে—হোয়ার অ্যাস ইট ইজ···ইত্যাদি।

আমার লাগে ভাল, কিন্তু রাণুর স্বাভাবিক স্ফূর্তির এই রকম দিনগুলা বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভাল লাগে বলিয়াই আমার মতির হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া যায় এবং কর্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত লঘুতাকে ভ্রূভঙ্গি করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মনে জাঁকিয়া আসিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক দিই—রাণু!

রাণু এ স্বরটি বিলক্ষণ চেনে; উত্তর দেয় না। মুখটি কাঁদ কাঁদ করিয়া নিতান্ত অসহায় ভালমানুষের মত ধীরে ধীরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়, আমার আওয়াজটা তাহার গলায় যেন একটা ফাঁস পরাইয়া টানিয়া আনিয়াছে। আমি কর্তব্যবোধে আরও কড়া হইয়া উঠি, সংক্ষেপে বলি, প্রথম ভাগ। যাও—

ইহার পরে প্রতিবারই যদি নির্বিবাদে প্রথম ভাগটি আসিয়া পড়িত এবং যেন-তেন-প্রকারেণ দুইটা শব্দও গিলাইয়া দেওয়া যাইত তো হাতেখড়ি হওয়া ইস্তক এই যে আড়াইটা বৎসর গেল ইহার মধ্যে মেয়েটা যে প্রথম ভাগের ও কয়টা পাতা শেষ করিতে পারিত না, এমন নয়। কিন্তু আমার হুকুমটা ঠিকমত তামিল না হইয়া কতকগুলা জটিল ব্যাপারের সৃষ্টি করে মাত্র—যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বার দুই তিন দিন পর্যন্ত রাণুর টিকিটি আর দেখা যায় না। সে যে কোথায় গেল, কখন আহার করিল, কোথায় শয়ন করিল তাহার একটা সঠিক খবর পাওয়া যায় না। দুই দিন পরে হঠাৎ যখন নজরে পড়িল তখন হয়তো সে তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে চায়ের আয়োজনে মাতিয়া গিয়াছে, কিংবা তাঁহার সামনে প্রথম ভাগটাই খুলিয়া রাখিয়া তাহার কাকাদের পড়ার খরচ পাঠানো কিম্বা আহার্য দ্রব্যের বর্তমান

দুর্মূল্যতা প্রভৃতি সংসারের কোন একটা দুরূহ বিষয় লইয়া প্রবলবেগে জ্যাঠামি করিয়া যাইতেছে, অথবা তাঁহার বাগানের জোগাড়যন্ত্রে দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া সব বিষয়ে নিজের মন্তব্য দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার দিকে হয়তো একটু আড়চোখে চাহিল, বিশেষ কোন ভয় বা উদ্বেগ নাই—জানে এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে যেখানে সে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন।

আমি হয়তো বলিলাম, কই রাণু, তোমায় না তিন দিন হ'ল বই আনতে বলা হয়েছিল?

সে আমার দিকে না চাহিয়া বাবার দিকে চায়, এবং তিনিই উত্তর দেন, ওহে, সে এক মহা মুস্কিল ব্যাপার হয়েছে, ও বইটা যে কোথায় ফেলেছে—

রাণু চাপা স্বরে শুধরাইয়া দেয়, ফেলি নি—বল, কে যে চুরি ক'রে নিয়েছে।

হ্যাঁ, কে যে চুরি ক'রে নিয়েছে, বেচারী অনেকক্ষণ খুঁজেও—

রাণু জোগাইয়া দেয়, তিন দিন খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'য়েও—

হ্যাঁ, তোমায় গিয়ে, তিন দিন হয়রান হ'য়েও—শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে—

রাণু ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া দেয়, হাল ছাড়ি নি এখনও।

হ্যাঁ, ওর নাম কি, হাল না ছেড়ে ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা হ'ক একখানা বই আজ এনে দিও, কতই বা দাম!

রাগ ধরে, বলি তুই বুঝি এই কাটারি হাতে ক'রে বাগানে বাগানে বই খুঁজে বেড়াচ্ছিস? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে।

কাতরভাবে বাবা বলেন, আহা, ওকে আর এ সামান্য ব্যাপারের জন্যে গালমন্দ করা কেন? এবার থেকে ঠিক ক'রে রাখবে তো, গিন্নী?

রাণু খুব ঝুঁকাইয়া ঘাড় নাড়ে। আমি ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাই, তোমায় অত ক'রে শেখাই, তবু একটুও মনে থাকে না, দাদা! কি যেন হচ্ছ দিন দিন!

কখনো কখনো হুকুম করিবার খানিক পরেই বইটার আধখানা আনিয়া হাজির করিয়া সে খোকার উপর প্রবল তম্বি আরম্ভ করিয়া দেয়। তম্বিটা আসলে আরম্ভ হয় আমাকেই ঠেস্ দিয়া, তোমার আদুরে ভাইপোর কাজ দেখ, মেজকা! লোকে আর পড়াশুনা ক'রবে কোথা থেকে?

আমি বুঝি কার কাজ। কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া থাকি।

দুষ্টু ছুটিয়া গিয়া বামালসুদ্ধ খোকাকে হাজির করে—সে বোধহয় তখন একখানা পাতা মুখে পুরিয়াছে এবং বাকিগুলার কি করিলে সবচেয়ে সদ্গতি হয় সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। তাহাকে আমার সামনে ধপ্ করিয়া বসাইয়া রাণু রাগ দেখাইয়া বলে, পেত্যয় না যাও; দেখ। আচ্ছা, এ ছেলের কখন বিদ্যে হবে, মেজকা?

আমি তখন হয়তো বলি, ওর কাজ, না তুমি নিজে ছিঁড়েছ, রাণু? ঠিক আগেকার

পাঁচখানি পাতা ছেঁড়া—যত বলি তোমায় কিছু বলব না—খান তিরিশেক বই তো শেষ হ'ল !

ধরা পড়িয়া লজ্জা, ভয়, অপমানে নিশ্চল নির্বাক হইয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, নেহাৎ নৃশংস না হইলে ইহার উপর আর কিছু তাহাকে বলা যায় না। তখনকার মত শাস্তির কথা ভুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিতে হয়, হ্যাঁরে ছুষ্টু, দিদির বই ছিঁড়ে দিয়েছিস ? আর তুমিও তো ওকে একটু-আধটু শাসন ক'রবে না, রাণু ... আর কতটুকু বুদ্ধিবল !

চাঁদমুখখানি হইতে মেঘটা সরিয়া গিয়া হাসি ফোটে। তখন আমাদের দুই... মধ্য হইতে প্রথম ভাগের ব্যবধানটা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং রাণু দিব্য সহজভাবে তাহার গিন্নীপনার ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময়টা সে হঠাৎ এত বড় হইয়া যায় যে, ছোট ভাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাপ, খুড়া, ঠাকুরমা, এমন কি ঠাকুরদাদা পর্যন্ত সবাই তাহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং স্নেহ ও করুণার পাত্র হইয়া পড়ে। এই রকম একটি প্রথম ভাগ ছেঁড়ার দিনে কথাটা এইভাবে আরম্ভ হইল—কি ক'রে শাসন ক'রব বল, মেজকা ; আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে, খালি কাজ—কাজ—আর কাজ।

হাসি পাইলেও গম্ভীর হইয়া বলিলাম, তা বটে, কত দিক আর দেখবে ?

যেদিকটা না দেখেছি সেইদিকেই গোল—এই তো খোকার কাণ্ড চোখেই দেখ... কেন রে বাপু, রাণু ছাড়া আর বাড়িতে কেউ নেই ? খাবার বেলা তো অনেকগুলি ... থ ; বল মেজকা ? আচ্ছা কাল তোমার ঝালতরকারিতে নুন ছিল ?

বলিলাম, না, একেবারে মুখে দিতে পারি নি।

তার হেতু হচ্ছে, রাণু কাল রান্নাঘরে যেতে পারে নি।—ফুরসৎ ছিল না। এই তো সবার রান্নার ছিরি ! আজ আর সে রকম কম হবে না, আমি নিজের হাতে দিয়ে এসেছি নুন।

আমার সখের ঝালতরকারি খাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলাম, তুমি যদি রোজ একবার ক'রে দেখ, মা।

গাল-দুইটি অভিমানে ভারি হইয়া উঠিল, হবার যো নেই, মেজকা ;—রাণু হয়েছে বাড়ির আতঙ্ক। 'ওরে ঐ বুঝি রাণু ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে টেনে দুধ খাওয়াতে ব'সেছে, দেখ দেখ—তোকে কে এত গিন্নীত্ব ক'রতে বললে বাপু ?' হ্যাঁ মেজকা, এতবড়টা হলুম দেখেছ কখনও আমায় গিন্নীত্ব ক'রতে—ককখনও—একরত্তিও— ?

বলিলাম, ব'লে দিলেই হ'ল একটা কথা, ওদের আর কি ?

মুখটি বুজে শুনে যাই। একজন হয়তো বললেন, 'ঐ বুঝি রাণু রান্নাঘরে সেঁধোল !' রাঙী বেড়ালটা বলে আমি পদে আছি। কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে রাণু বুঝি ওর বাপের—।' আচ্ছা মেজকা, বাবার ফুলদানিটা আমি ভেঙেছি ব'লে তোমার একটুও বিশ্বাস হয় ?

এ ঘটনাটি সবচেয়ে নূতন ; গিন্নীপনা করিয়া জল বদলাইতে গিয়া রাণুই ফুলদানিটা চুরমার করিয়া দিয়াছে, ঘরে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমি বলিলাম কই, আমি তো ম'রে গেলেও একথা বিশ্বাস ক'রতে পারি না।

ঠোঁট ফুলাইয়া রাণু বলিল, যার ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে, সে ক'রবে না। আমার কি দরকার মেজকা, ফুলদানিতে হাত দেবার ? কেন, আমার নিজের পেরথোম ভাগ কি ছিল না যে বাবার ফুলদানি ঘাঁটতে যাব ?

প্রথম ভাগের উপর দরদ দেখিয়া ভয়ানক হাসি পাইল, চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, মিছিমিছি দোষ দেওয়া ওদের কেমন একটা রোগ হ'য়ে পড়েছে।

দুষ্টু একটু মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল ; তাহার পর, সুবিধা পাইয়া, তাহার সদ্য দোষটুকু সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া লইবার জন্য আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া আরও অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলিল, তোমারও এ রোগটা একটু একটু আছে, মেজকা ; এক্ষুণি বলছিলে আমি পেরথোম ভাগটা ছিঁড়ে এনেছি !

মেয়ের কাছে হারিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলাম !

বই হারানো কি ছেঁড়া, পেট-কামড়ানো, মাথা-ব্যথা, খোকাকে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারগুলা যখন অনেক দিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে তখন দুই এক দিনের জন্য নেহাৎ বাধ্য হইয়াই রাণু বই শ্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোনকিছুর জন্য মনটা খিঁচড়াইয়া থাকায়, কিম্বা অন্য কোন কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশি রকম সজাগ থাকে তো ধমক খাইয়া বই খোলে। তাহার পর পড়া আরম্ভ হয়। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস কি আমার ধৈর্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সসদ্গুণের পরীক্ষা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ' 'আম-'র পাতা শেষ করিয়া 'অচল' 'অধম-'র পাতায় আসিয়া অচলা হইয়া বসিয়া আছে। বই খুলিয়া আমার দিকে চায়—অর্থাৎ বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি, আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তো বিয়ে হ'লেই যখন শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাবে, মেজকাকা কি রকম আছে, তাকে কেউ সকালবেলা চা দিয়ে যায় কি না, নাইবার সময় তেল কাপড় গামছা দিয়ে যায় কি না, অসুখ হ'লে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কি না এসব কি ক'রে খোঁজ নেবে ?

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবী দুর্দশার কথা কল্পনা করিয়া একটু মৌন থাকে, কিন্তু বোধহয় প্রথমভাগ-পারাবার পার হইবার কোন সম্ভাবনাই না দেখিয়া বলে, আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না? আমায় একটুও ব'লে দিতে হবে না। এই শোন না—ঐ ক-এ য-ফলা—

রাগিয়া বলি, ঐ ডেঁপোমি ছাড় দিকিন, ঐ জন্যেই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড়। সেদিন কত দূর হয়েছিল? 'অচল' 'অধম' শেষ করেছিলে?

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ।

বলি, পড় তা হ'লে একবার।

'অচল' কথাটার উপর কচি আঙুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে এবং স্নেহ-করুণা প্রভৃতি স্নিগ্ধ চিত্তবৃত্তিগুলা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। মেজাজেরই বা আর দোষ দিই কি করিয়া? আজ একবৎসর ধরিয়া এই 'অচল' 'অধম' লইয়া কসরৎ চলিতেছে; এখনও রোজই এই অবস্থা!

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি, ছাই হয়েছে! আচ্ছা, বল—অ—চ—আর ল—অচল।

রাণু অ-এর উপর হইতে আঙুলটা না সরাইয়াই তিনটা অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম'-ও ঐভাবেই শেষ হয়; অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়াছিল!

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কোন্‌টা অ?

রাণু ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আঙুলটি সরাইয়া ল-এর উপর রাখে।

ধৈর্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া থাকি, বলি, হুঁ—কোন্‌টা ল হ'ল তা হ'লে?

আঙুলটা সট্ করিয়া চ-এর উপর সরিয়া যায়। ধৈর্যসাধনা তখনও চলিতে থাকে; শান্তকণ্ঠে বলি, চমৎকার! আর চ?

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার পর বলে, চ? চ নেই মেজকা।

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে, পিঠে একটা চাপড় কষাইয়া বলি, তা থাকবে কেন? তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েছেন, আর এদিকে আড়াই বৎসরে প্রথম ভাগের আড়াইটা কথা শেষ ক'রতে পারলে না! কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাস করিয়ে দিলাম আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হ'ল! কাজ নেই তোর অক্ষর চিনে। সন্ধ্যে পর্যন্ত ব'সে ব'সে খালি অ—চ—আর ল—অচল; অ—ধ—আর ম—অধম—এই আওড়াবি। তোর সমস্ত দিন খাওয়া বন্ধ।

বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিম্বা বই লইয়া বসিয়া যাই। রাণু ক্রন্দনের সহিত সুর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়িতে হইবে; কিন্তু চড়টা বসাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, সেদিনকার পড়া ঐ পর্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সহিত কাজে লাগায়। কিছুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না; বলি, কি হ'ল ?

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে, নেই।

কি নেই ?—বলিয়া ফিরিয়া দেখি, চক্ষের জল 'অচল' 'অধম'-র উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথা দুইটা বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নীচের দুই তিনখানা পাতার খানিকটা পর্যন্ত !

কিম্বা আঙুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুইটিকে চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে, এইরূপ অবস্থাতে বলে, আর দেখতে পাচ্ছি না, মেজকা।—এই রকম আরও সব কাণ্ড।

চড়টা মারা পর্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার থিওরিটা ফিরিয়া আসে; বলি, না, তোর আর পড়াশুনা হ'ল না, রাণু; শ্লেট-টা নিয়ে আয় দিকিন—দেগে দিই, বুলো। পিঠটায় লেগেছে বেশি ? দেখি আয় !

রাণু বুঝিতে পারে তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে, মেজকা !

উত্তর দিই, কি ?

আমি মেজকা বড় হই নি ?

তা তো খুব হয়েছে, কিন্তু বড়র মতন—

বাধা দিয়া বলে, তা হ'লে শ্লেট ছেড়ে ছোটকাকার মত কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আসব ? চারটে উড্‌পেন্সিল আছে আমার। শ্লেটে খোকা বড় হ'য়ে লিখবে 'খন। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলে, ও মেজকা, তোমার দুটো পাকা চুল গো, সর্বনাশ ! বেছে দিই ?

বলি, দাও। আচ্ছা রাণু, এই তো বুড়ো হ'তে চললাম, তুইও দু'দিন পরে শ্বশুরবাড়ি চল্‌লি। লেখাপড়া শিখলি নি, মরলাম কি বাঁচলাম কি ক'রে খোঁজ নিবি ? আমায় কেউ দেখে শোনে কিনা, রেঁধে-টেধে দেয় কিনা—

রাণু বলে, পড়তে তো জানি মেজকা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না, বড় হয়েছি কি না ! বাড়ির আর কোন্ লোকটা পেরথোম ভাগ পড়ে, মেজকা ? দেখাও তো !

দাদা ওদিকে ধর্ম সম্বন্ধে খুব লিবারেল মতের লোক ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে

অজ্ঞতাটা যেমন গভীর করিয়া বাখিয়াছিলেন খ্রীষ্ট এবং ককেকার জরাজীর্ণ জুকয়াছি ্য়ান্‌বাদ সম্বন্ধে জ্ঞানটা সেইরূপ উচ্চ ছিল। দরকার হইলে বাইবেল হইতে সুদীর্ঘ কোটেশন তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেন এবং দরকার না হইলেও যখন একধার হইতে সমস্ত ধর্মমত সম্বন্ধে সুতীব্র সমালোচনা করিয়া ধর্মমত মাত্রেরই অসারতা সম্বন্ধে অধার্মিক ভাষায় ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া যাইতেন, তখন ভক্তদের বলিতে হইত, হাঁ, এখানে খাতির চলবে না বাবা, এ যার নাম শশাঙ্ক মুখুজ্যে!

দাদা বলিতেন, না, গোঁড়ামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নই।

ধর্মবাদ মাত্রকেই তিনি 'গোঁড়ামি' নামে অভিহিত করিতেন এবং গালাগাল না দেওয়াটাকে কহিতেন 'প্রশ্রয় দেওয়া'।

সেই দাদা এখন একেবারে অন্য মানুষ! ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল খান না এবং জলের অতিরিক্ত যে বেশি কিছু খান বলিয়াও বোধ হয় না। পূজা পাঠ হোম লইয়াই আছেন এবং বাক ও কর্মে শুচিতা সম্বন্ধে এমন একটা 'গেল গেল' ভাব যে আমাদের তো প্রাণ 'যায় যায়' হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তেরা বলে, ওরকম হবে, এ তো জানা কথাই, এই হচ্ছে স্বাভাবিক বিবর্তন; এ একেবারে খাঁটি জিনিস দাঁড়িয়েছে।

সকলের চেয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছে এই যে, এই অসহায় লাঞ্ছিত হিন্দু-ধর্মের জন্য একটা বড় রকম ত্যাগ স্বীকার করিবার নিমিত্ত দাদা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন এবং হাতের কাছে আর তেমন কিছু আপাতত না পাওয়ায় ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে ছোট কন্যাটির উপর।

একদিন বলিলেন, ওহে শৈলেন, একটা কথা ভাবছি,—ভাবছি বলি কেন, একরকম স্থিরই ক'রে ফেলেছি।

মুখে গম্ভীর তেজস্বিতার ভাব দেখিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, কি দাদা?

গৌরীদান ক'রবো স্থির করেছি, তোমার রাণুর কত বয়স হ'ল?

বয়স না বলিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম, সে কি দাদা! এ যুগে—

দাদা সংযত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, যুগের 'এ' আর 'সে' নেই, শৈলেন: ঐখানেই তোমরা ভুল কর। কাল এক অনন্তব্যাপী অখণ্ড সত্তা এবং শুদ্ধ সনাতন ধর্ম সেই কালকে—

একটু অস্থির হইয়া বলিলাম, কিন্তু দাদা, ও যে এখন দুগ্ধপোষ্য শিশু!

দাদা বলিলেন, এবং শিশুই থাকবে ও, যতদিন তোমরা বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা ওর আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশের অবসর ক'রে না দিচ্ছ। এটা তোমায় বোঝাতে হ'লে আগে আমাদের শাস্ত্রকাররা—

অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওর তো এই সবে আট বছর পেরুল, দাদা, ওর শরীরই বা কতটুকু আর তার মধ্যে ওর আত্মাই বা কোথায় তা তো বুঝতে পারি না! আমার কথা হচ্ছে—

দাদা সেদিকে মন না দিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, আট বৎসর পেরিয়ে গেছে! তা হ'লে আর কই হ'ল শৈলেন? মনু বলেছেল, 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষে তু রোহিনী—' জানি, অতবড় পুণ্যকর্ম কি আমার হাত দিয়ে সমাধান হবে? ছোটটার বয়েস কত হ'ল?

রাণুর ছোট রেখা পাঁচ বৎসরের। দাদা বয়স শুনিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মৌন রহিলেন। পাঁচ বৎসরের কন্যাদানের জন্য কোন একটা পুণ্যফলের ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়ার জন্য মনুর উপরই চটিলেন কিম্বা অত পিছাইয়া জন্ম লওয়ার জন্য রেখার উপরই বিরক্ত হইলেন বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলেন। আমিও আমার রুদ্ধশ্বাসটা মোচন করিলাম। মনে মনে কহিলাম, যাক, মেয়েটার একটা ফাঁড়া গেল।

দুই দিন পরে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপস্থিত হইলে বলিলেন, আমি ও সমস্যাটুকুর এক রকম সমাধান ক'রে ফেলেছি, শৈলেন। অর্থাৎ তোমার রাণুর বিবাহের কথাটা আর কি! ভেবে দেখলাম যুগধর্মটা একটু বজায় রেখে চলাই ভাল বৈকি—

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, হর্ষের সহিত বলিলাম, নিশ্চয়, শিক্ষিত সমাজে কোথায় ষোল সতেরো বছরে বিবাহ চলেছে, দাদা, এ সময় একটা কচি মেয়েকে—যার ন'বছরও পুরো হয়নি—তা ভিন্ন থাটো গড়ন ব'লে—

ঝাঁটা মারো তোমার শিক্ষিত সমাজকে। আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে যদি এই সময়ই রাণুর বিয়ে দিয়ে দিই—তা মন্দ কি! এ তো, যুগধর্মটাও বজায় রইল অথচ ওদিকে গৌরীদানেরও খুব কাছাকাছি রইল। ক্ষতি কি? এটা হবে যাকে বলতে পারা যায় মডিফায়েড গৌরীদান আর কি!

আমি একেবারে থ হইয়া গেলাম। কি করিয়া যে দাদাকে বুঝাইব কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দাদা বলিলেন, পণ্ডিতমশায়েরও মত আছে। তিনি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে দেখে বললেন, কলিতে এইটিই গৌরীদানের সমফলপ্রসূ হবে।

আমি দুঃখ ও রাগ মিটাইবার একটা আধার পাইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিলাম, পণ্ডিত-মশায় তা হ'লে একটা নীচ মিথ্যাকথা আপনাকে বলেছেন, দাদা, আপনি সন্তুষ্ট হ'লে উনি এ কথাও বোধ হয় শাস্ত্র ঘেঁটে ব'লে দেবেন যে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেও

আজকাল গৌরীদানের ফল হবার কথা। কলিযুগটা তো ওঁদের কল্পবৃক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যখন যেটি চাইবেন পাকা ফলের মত টুপ ক'রে হাতে এসে পড়বে।

দুই জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমিই কথা ক লাম, যাক, ওঁরা বিধান দেন, দিন বিয়ে। আমি এখন আসি, একটু কাজ আছে।

আসিবার সময় ঘুরিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ ব'লে ভাব্‌ছি মাস-চারেক একটু পশ্চিমে গিয়ে কাটাব ; হপ্তাখানেকের মধ্যে বোধ হয় বেরিয়ে পড়তে পারব।—
বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

অভিমানের সাহায্যে ব্যাপারটা মাস তিন চার কোন রকমে ঠেকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু তাহার পর দাদা নিজেই এমন অভিমান স্বরু করিয়া দিলেন যে, আমারই হার মানিতে হইল। 'ধর্মে'র পথে অন্তরায় হইবার বয়স এবং শক্তি বাবার তো ছিলই না, তবুও নাতনীর মায়ায় তিনি দোমনা হইয়া কিছুদিন আমারই পক্ষে রহিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে ওই দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। আমি বেখাপ্‌পা রকম একলা পড়িয়া গিয়া একটা মস্তবড় ধর্মদ্রোহীর মত বিরাজ করিতে লাগিলাম।

রাণুকে ঢালোয়া ছুটি দিয়া দিয়াছি। মায়াবিনী অচিরেই আমাদের পর হইবে বলিয়া যেন ক্ষুদ্র বুকখানির সমস্তটুকু দিয়া আমাদের সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। পারুক না-পারুক সে সমস্ত কাজেই আছে এবং যেটা ঠিকমত পারে না সেটার জন্য এমন একটা সংকোচ এবং বেদনা আজকাল তাহার দেখিতে পাই, যাহাতে সত্যই মনে হয় নকলের মধ্য দিয়া মেয়েটার এবার আসল গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অসহায় মেজকাকাটি তো চিরদিনই তাহার একটা পোষ্য ছিলই ; আজকাল আবার প্রথমভাগ-বিবর্জিত সুপ্রচুর অবসরের দরুণ একেবারে তাহার কোলের শিশুটিই হইয়া পড়িয়াছে বলিলে চলে।

সময় সময় গল্পও হয় : আজকাল বিয়ের গল্পটা হয় বেশি। অন্যের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে রাণু ইদানীং লজ্জা পায় বটে কিন্তু আমার কাছে কোন দ্বিধা কুণ্ঠাই আসিবার অবসর পায় না ; তাহার কারণ আমাদের দুইজনের মধ্যে সমস্ত লঘুত্ব বাদ দিয়া গুরুগম্ভীর সমস্যাবলীর আলোচনা চলিতে থাকে। বলি, তা নয় হ'ল, রাণু, তুমি মাসে দু'বার ক'রে শ্বশুর-বাড়ি থেকে এসে আমাদের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে গেলে, আর সবই ক'রলে, কিন্তু তোমার মেজকাকাটির কি বন্দোবস্ত করছ ?

রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে ; বলে, আমরা সব ব'লে ব'লে তো হয়রান হ'য়ে গেলাম, মেজকা, যে বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা ? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখতে শুনতে পারবে, মেজকা ? এর পরে তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ ক'রতে হবে তো ? মেয়ে আর কার কতদিন নিজের বল ?

তোতাপাখির মত, কচি মুখে বুড়োদের কাছে শেখা বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব ঠিক করিতে পারি না ; বলি, আচ্ছা একটা গিন্নীবান্নি ক'নে দেখে এখনও বিয়ে ক'রলে চলে না ? কি বল তুমি ?

এই বাঁধা কথাটি তাহার ভাবী শ্বশুড়বাড়ি লইয়া একটি ঠাট্টার উপক্রমণিকা। রাণু কৃত্রিম অভিমানের সহিত হাসি মিশাইয়া বলে, যাও মেজকা, আর গল্প ক'রব না ; তুমি ঠাট্টা করছ।

আমি চোখ পাকাইয়া বিপুল গাম্ভীর্যের সহিত বলি, মোটেই ঠাট্টা নয়, রাণু ; তোমার শাশুড়ীটি বড্ড গিন্নী শুনেছি, তাই বলছিলাম যদি বিয়েই ক'রতে হয়—

রাণু আমার মুখের দিকে রাগ করিয়া চায়, গম্ভীর হইয়া চায় এবং শেষে হাসিয়া চায়। কিছুতেই যখন আমার মুখের অটল গাম্ভীর্য বদলায় না, তখন প্রতারিত হইয়া গুরুত্বের সহিত বলে, আচ্ছা আমি তা হ'লে—না মেজকা, নিশ্চয় ঠাট্টা করছ, যাও—

আমি চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলি, একটুও ঠাট্টা নেই এর মধ্যে, রাণু ; সব কথা নিয়ে কি আর ঠাট্টা চলে, মা ?

রাণু তখন ভারিক্কে হইয়া বলে, আচ্ছা, তা হ'লে আমার শাশুড়ীকে একবার ব'লে দেখব'খন, আগে যাই সেখানে। তিনি যদি তোমায় বিয়ে ক'রতে রাজি হন তো তোমায় জানাব'খন, তার জন্যে ভাবতে হবে না। তাহার পর কৌতুকদীপ্তচোখে চাহিয়া বলে, আচ্ছা মেজকা, পেরথোম ভাগ তো শিখিনি এখনও—কি ক'রে তোমায় জানাব বল দিকিন, তবে বুঝব, হ্যাঁ—

আমি নানান রকম আন্দাজ করি ; বিজয়িনী ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া বলে, না, হ'ল না—কক্‌খনও বল্‌তে পারবে না, সে বড্ড শক্ত কথা।

এই সব হাসি তামাসা গল্পগুজব হঠাৎ মাঝখানেই শেষ হইয়া যায়। রাণু চঞ্চলতার মাঝে মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে, যাক, সে পরের কথা পরে হবে ; যাই, তোমার চা হ'ল কি না দেখিগে। কিম্বা—যাই, গল্প ক'রলেই চলবে না, তোমার লেখার টেবিলটা আজ গুছোতে হবে, একডাঁই হ'য়ে রয়েছে—ইত্যাদি।

এই রকম ভাবে রাণুকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর ভাবে আমার বুকের মধ্যে আনিয়া দিতে দিতে বিচ্ছেদের দিনটা আগাইয়া আসিতেছে।

বুঝিবা রাণুর বুকটিতেও এই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাহার অগোচরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। কচি সে, বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনই আজকাল ছুটি পাইলে নিজের মনেই শ্লেট ও প্রথমভাগটা লইয়া হাজির হয়, তখনই বুঝিতে পারি এ আগ্রহটা তাহার কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ারই একটা নূতন রূপ; কেন না, প্রথমভাগ শেখার আর কোন উদ্দেশ্য থাক আর নাই থাক, ইহার উপরই যে ভবিষ্যতে তাহার কাকার সমস্ত সুখ সুবিধা নির্ভর করিতেছে রাণুর মনে এ ধারণাটুকু বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন আর একেবারেই উপায় নাই বলিয়া তাহার শিশু মনটি ব্যাথায় ভরিয়া উঠে; প্রবীণার মত আমায় তবুও আশ্বাস দেয়, তুমি ভেবনা, মেজকা, তোমার পেরথোম ভাগ না শেষ ক'রে আমি ককখনও শ্বশুরবাড়ি যাব না। নাও, বলে দাও।

পড়া অবশ্য এগোয় না। বলিয়া দিব কি, প্রথম ভাগটা দেখিলেই বুকে যেন কান্না ঠেলিয়া উঠে ওদিকে আবার প্রতিদিনই গৌরীদানের বর্দ্ধমান আয়োজন। বাড়ির বাতাসে আমার যেন হাঁফ ধরিয়া উঠে। এক একদিন মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরি, বলি, আমাদের কোন্ দোষে তুই এত শিগ্‌গীর পর হ'তে চললি, রাণু?

বোঝে না, শুধু আমার ব্যথিত মুখের দিকে চায়। এক একদিন অবুঝভাবেই কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠে; এক একদিন জোরগলায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে—তোমার কষ্ট হয় তো বিয়ে এখন ক'রবই না, মেজকা; বাবাকে বুঝিয়ে বলব'খন।

একদিন এই রকম প্রতিজ্ঞার মাঝখানেই সানাইয়ের করুণ সুর বাতাসে ক্রন্দনের লহর তুলিয়া বাজিয়া উঠিল। রাণু কুণ্ঠিত আনন্দে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কি রকম হইয়া গিয়া মুখটা নীচু করিল; বোধ করি, তাহার মেজকাকার মুখে বিষাদের ছায়াটা নিতান্তই নিবিড় হইয়া তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

গৌরীদান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমাদের গৌরীর আজ বিদায়ের দিন। আমি শুভকর্মে যোগদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি নাই, এ-বাড়ি সে-বাড়ি করিয়া বেড়াইয়াছি। বিদায়ের সময় বরবধূকে আশীর্বাদ করিতে আসিলাম।

দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার পরা মালাচন্দনে চর্চিত রাণুকে দেখিয়া

আমার তপ্ত চক্ষু দুইটা যেন জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ও যে বড্ড কচি, এত সকালে কি করিয়া বিদায়ের কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায়? ওকি জানে আজ কতই পর করিয়া ওকে বিদায় দিতেছি আমরা?

চক্ষে কোঁচার খুঁট দিয়া এই পুণ্যদর্শন শিশুদম্পতিকে আশীর্বাদ করিলাম। রাণুর চিবুকটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, রাণু, তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে—? আর বলিতে পারিলাম না।

রাণু শুনিয়াছি এতক্ষণ কাঁদে নাই। তাহার কারণ নিশ্চয় এই যে, সংসারের প্রবেশ-পথে দাঁড়াইতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপণাটা সরিয়া গিয়া ওর মধ্যকার শিশুটি বিস্ময়ে, কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কথার আভাসে সেই শিশুটিই নিজের অসহায়তায় আকুল হইয়া পড়িল। আমার বাহুতে মুখ লুকাইয়া রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কখনও কচি মেয়ের মত ওকে ভুলাইতে হয় নাই। আমার খেলাঘরের-মা হইয়া ও-ই এতদিন আমায় আদর করিয়াছে—আশ্বাস দিয়াছে, সেইটাই আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাল মানাইত। আজ প্রথম ওকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিলাম—যেমন ছুলের ছেলেমেয়েকে শান্ত করে—বুঝাইয়া, মিথ্যা কহিয়া, কত প্রলোভন দিয়া।

তবুও কি থামিতে চায়? ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন যে গোপনে শুধু অশ্রুই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছেল।

অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে থামিল। অভ্যাসমত আমার করতল দিয়াই নিজের মুখটা মুছাইয়া লইল; তাহার পর হাতটাতে একটু টান দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এদিকে এস, শোন মেজকা!

দুইজন একটু সরিয়া গেলাম। সকলে এই অসম মাতাপুত্রের অভিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণু বুকের কাছ হইতে তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্য হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের একটা বাণ্ডিল বাহির করিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া বলিল, পেরথোম ভাগগুলো হারাই নি, মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।

গলা ভাঙিয়া পড়ায় একটু থামিল, আবার বলিল, সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি, মেজকা, খু—ব লক্ষ্মী হ'য়ে প'ড়ে প'ড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেব না, মেজকা।

রাধারাণীর নিজের বাড়ি

ও

তুলসী গন্ধ

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু—জন্ম ১৯০৮ কুমিল্লা। ছেলেবেলায় নোয়াখালীতে ছিলেন, প[illegible] করেছেন ঢাকায়। শৈশব থেকেই বুদ্ধদেব অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, ঢাকা বি[illegible]লয়ে এম-এ, পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ থেকে [illegible]লের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—কবিতা "শাপভ্রষ্ট" ও "বন্দীর বন্দনা" কল্লোলেই [illegible] বেরোর। ১৯৩১ সাল থেকে কলকাতায় আছেন, বর্তমানে রিপন কলেজে অ[illegible]না করেন। প্রথম প্রকাশিত বই—"সাড়া" উপন্যাস, উনিশ-কুড়ি বছরের লেখা। [illegible] কবিতার বই—"বন্দীর বন্দনা" কবিতাগুলি লেখা সতেরো থেকে উনিশ বছরে[illegible]।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী লেখকমণ্ডলীর মধ্যে বুদ্ধদেব ব[illegible]ন একটু স্বতন্ত্র। ইনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী। নিপুণ পর্যবেক্ষণে [illegible] মনোবিশ্লেষণে এঁর অত্যন্ত ছোটোখাটো রচনাতেও যে শক্তির [illegible]য়—যে প্রতিভার দীপ্তি ফুটে ওঠে—এর আগে সেখানে বাংলা সাহিত্যে আর [illegible] পৌঁছতে পারেন নি। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যের এমন কোনো বিভাগই পায় নেই যাকে ইনি সমৃদ্ধ না করেছেন। ছেলেদের গল্প ও কবিতাতেও এঁর দখল অসাধারণ। ১৯২৭ সালে কবি অজিত দত্তের সহযোগিতায় ইনি ঢাকা থেকে "প্রগতি" মাসিকপত্র বার করেন; "প্রগতি" দু'বছর পরে বন্ধ হ'য়ে যায়। বর্তমানে সমর সেনের সঙ্গে কবিতার ত্রৈমাসিক পত্রিকা "কবিতা" সম্পাদনা করছেন। এঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—সাড়া, অসূর্যম্পশ্যা, যেদিন ফুটলো কমল, বাসরঘর, লালমেঘ, পরিক্রমা। গল্প—রেখাচিত্র, অসামান্য মেয়ে, মিসেস গুপ্ত ইত্যাদি। প্রবন্ধ—হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আমি চঞ্চল হে। ভ্রমণ-কাহিনী সমুদ্রতীর। কবিতা—বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, পৃথিবীর পথে। ১৯৩৩এর প্রথম দিকে এঁর "এরা আর ওরা" ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বিবাহের চেয়ে বড়ো" "প্রাচীর ও প্রান্তর" এই তিনখানা উপন্যাস "অশ্লীলতার" অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়।

রাধারাণীর নিজের বা ড়

রাধারাণীর যখন বিয়ে হ'লো তার বয়েস তেরো। তার স্বামী রিজাপ্রসন্ন কলকাতায় এক সওদাগরি হৌসে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরি ক'রতো। পড়া তার বেশিদূর করা হয়নি—কি সে বেশিদূর করেনি; আঠারো বছর বয়েসেই এক নতি কোম্পানিতে ঢুকে গিয়েছিলো পঁয়তাল্লিশ টাকায়; এখন তেইশ বছরে তার মাইনে পঁচাত্তর হ'লো, সে ক'রলে বিয়ে। তার মা-বাবা বললেন এইবার বিয়ে কর্, কবে মরে যাই ক কী—ইত্যাদি যে-সব কথা হিন্দু বাপ-মা বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে ব'লে থাকেন। গিরিজা তাদে প্রস্তাবে আপত্তি করবার কিছু পেলে না; কেন সে বিয়ে ক'রবে না, তার কোনো কারণ দেখতে পেলে না। আর সে কথাই যদি ওঠে, কেন সে বিয়ে ক'রবে, তার কোনো কারণ অবিশ্যি সে পায় নি। খোঁজেও নি। কারণ নিয়ে সে বড় একটা মাথা ঘামাতো না। তার নিজের, ব'লতে গেলে, কোনো মতামতই ছিলনা। কোনো মতামত গ'ড়ে তোলবার সময়ই ছিলো না তার জীবনে। অত্যন্ত অস্পষ্ট গোছের মানুষ, নিজের মনে সে কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারতো না; তার ছিলো না কোনো ভাবনার বালাই। সে চুপচাপ থাকতো, যেমন দিন কাটে কাটুক, যতক্ষণ না কেউ তাকে ব'লে দিতো কী ক'রতে হবে। তখন অবিশ্যি সেই কাজের যথাসাধ্য দ্রুত সম্পাদনের জন্য সে সচেষ্ট হ'তো। সে বেশি কথা বলতো না, কোনো ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাতো না; কিন্তু তার আলস্য ছিল না কাজে। তার মৃদু, নীরব ধরণে সে নিখুঁত কাজ ক'রে যেতে পারতো; সেই ধরণের লোক, ভাষায় যাকে বলে করিৎকর্মা। কেরানি জীবনের চাইতে ভালো তার পক্ষে কিছু হ'তে পারতো না, সে তা ভালোবাসতো। কখনো কিছু ভাববার দরকার হয় না, বেশি কথা বলতে হয় না, ঘাড় গুঁজে কলম চালিয়ে গেলেই হ'লো। হ্যাঁ, সে তা ভালোবাসতো—আপিসে তার

দীর্ঘ আট-দশ ঘণ্টা ; সব সময়, সে-ই উপস্থিত সবার আগে, সায়েবরা আসবার প্রায় আধ ঘণ্টা আগে, এসে ডাক খুলছে, সায়েবের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছে কাগজপত্র। আর, সব সময় তার দাড়ি কামানো, তার সাফ জামা-কাপড়। তার চেহারা আর পোষাক সম্বন্ধে সে একটু যত্ন নিতো, নিজের তৃপ্তির জন্য নয়, আপিসের কেতা ব'লে। বড় সায়েব তাকে পছন্দ ক'রতেন। ছোট সায়েব তাকে পছন্দ ক'রতেন। আপিসের অন্যান্য কেরানিরা মুখে তার সঙ্গে খুব ভাব ক'রে আড়ালে শাপান্ত ক'রতো ; 'দেখবে', তারা বলাবলি ক'রতো 'এ ছোকরা ধাঁ-ধাঁ ক'রে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।' আর তা-ই হ'লো ; এই ক'বছরের মধ্যেই সে লাফিয়ে চ'ড়ে ব'সলো পঁচাত্তর টাকার উচ্চডালে, যেখানে তার চাইতে পনেরো বছরের বড় কোনো-কোনো কেরানি এখনো পৌঁছিতে পারে নি। এবং এই শেষ নয়, আরো আছে। লোকে ব'লতো, তার কপালটা ভালো, কিন্তু সে নিজে যেন তা জানতো না। কিছুই যেন জানতো না, কোনো বিষয়েই সে সচেতন নয়। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য, আত্ম-বিস্মৃত, সব সময়েই সে যেন ঘুমোচ্ছে, কখনো সম্পুর্ণরূপে জেগে নেই। কিন্তু তার বাপ-মা জানতেন যে তার কপাল ভালো, সেই জন্য মুখে তাঁরা বলতেন, 'ছেলেটা কিছু ক'রতে পারছে না, কিছুই হচ্ছে না তোর'। কারণ অদৃষ্টের দেবতাকে কখনো জানতে দিতে নেই যে আমরা জেনেছি তার প্রসাদ আছে আমাদের উপর : সব চেয়ে ভালো সব সময় নালিশ করা, প্যান প্যান করা—সব চেয়ে নিরাপদ।

সুতরাং তাঁরা বললেন, 'ছেলের বিয়ে দিয়ে দেখি বৌয়ের ভাগ্যে যদি কপাল ফেরে।'

এখন, রাধারাণী, যদিও তার বয়েস মোটে তেরো, সে মোটামুটি জানতো বিয়ে ব্যাপারটা কী। সে এতদিন কাটিয়েছে তার বাবা-মার সঙ্গে সুদূর মফঃস্বলের কোনো অতি ছোট শহরে, যার নাম মাঝে-মাঝে দেখা যায় স্ত্রীহরণ কি বালিকাবধূর আত্মহত্যার সম্পর্কে বাংলা খবরের কাগজে। স্থানীয় মেয়ে-ইস্কুলে সে কিছুদিন যাতায়াত করেছিলো, কিন্তু লেখাপড়ায় তার মন ছিলো না। বইয়ের চেহারা তার পছন্দ হ'তো না। আর, ছেলে বেলা থেকেই সে জানতো সে একটু বড় হ'য়ে উঠতে-না-উঠতে তার বাপ-মা তার বিয়ে দিয়ে দিবেন—সুযোগ পাওয়া মাত্র। আর তার সব চিন্তা গিয়ে প'ড়েছিলো বিয়ের উপর। বিয়ে! বিয়ের কথা ভাবতে তার কোনো রকম আনন্দ হ'তো না, একটু দুঃখ হ'তো না ; সে শুধু তা মেনে নিয়ে ছিলো মনে-মনে—মেনে নিয়ে চুপ ক'রে ছিলো। আর তবু, তার মধ্যে ছিলো অনেকখানি শক্তি, উৎসাহ, যা চালনা ক'রতে পারলে সে খুশি হ'তো। কিন্তু তা সে জানতো না, তখন পর্যন্ত নয়। তার মধ্যে বিশেষ রকমের একটা একগুঁয়েমি ছিলো, যা তার মা-র মনে হ'তো 'অলক্ষুণে', আর যা নির্মূল ক'রতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু তার ফলে রাধারাণীর মন আরো যেন বিকৃত হ'য়ে উঠ্‌তো, টক জিনিস মিশলে দুধ যেমন ছানা হ'য়ে যায়। তার মধ্যে ছিল কঠিন, কঠিন ইচ্ছা ; ইচ্ছার শক্তি। সে যদি চায় পাখি পুষতে, সে বরং মরবে, তবু তার পাখিকে ছেড়ে দেবে না ; সে যদি চায় নিজের হাতে

মুড়িঘণ্ট রাঁধতে, সে বরং আগুনে আত্মসাৎ ক'রবে, তবু উনুনের ধার থেকে উঠে আসবে না। আর যদি সে-মুড়িঘণ্ট পুড়ে গিয়ে থাকে, খাবার অযোগ্য হ'য়ে থাকে, যার-যার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে খেয়ে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। কর্তৃত্ব করবার ঝোঁকটা ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে প্রবল। সংসারে, সংসারের জীবনে নিজের ইচ্ছাকে খাটানোই তার সার্থকতা।

কিন্তু বাপের বাড়ি, সে জানতো, তার বাড়ি নয়: অস্পষ্ট-ভাবে সে অনুভব ক'রতো, এখানে তার ইচ্ছা চলবে না—এটা ঠিক তার জীবন নয়, জীবনের ভূমিকা মাত্র। এখন পর্যন্ত নবিশি। মেয়ে মানুষের যদ্দিন বিয়ে না হয়, সেটা একটা শূন্যতা, ততদিন তার জীবন ভালো ক'রে আরম্ভই হয় না। এটা আমলে আনবার নয়, বিয়ে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একে যেতে হয় ভুলে। বিয়ে হবার আগে পর্যন্ত সে কী করেছে আর না-করেছে, সেটাতে যেন কিছু এসে যায় না। বিয়ে যেদিন হবে, সেদিন থেকেই যেন সে ঠিক হ'তে আরম্ভ ক'রবে।

হ'লো বিয়ে। প্রথম তিন বছর কাটলো শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে দেশে, বরিশালের এক গ্রামে। গিরিজা মাঝে-মাঝে আসতো ছুটি-ছাটায়। কিন্তু রাধারাণীর পক্ষে সে তখন পর্যন্ত বাস্তব হ'য়ে ওঠেনি। তার বেশির ভাগ জড়িয়ে ছিলো দেশের বিস্তৃত বাড়িতে, বৃহৎ যৌথ পরিবারের নানা দায়িত্ব, নানা কর্ম-সমাপনে, প্রীতি-সাধনে। সে-সব তার খুব ভালো লাগতো; ও-সব ব্যাপার খুব ভালোবাসতো সে। শ্বশুর-শাশুড়ি বৌ পেয়ে মহা খুসি হয়েছিলেন; এতটুকু মেয়ে গৃহস্থালিতে এমন নিপুণ হবে, তা তাঁরা আশা ক'রতে পারেন নি। রাধারাণীকে কিছু ব'লতে হয় নি, কিছু শেখাতে হয়নি; যেন এরই জন্যে তৈরি হ'য়ে ছিলো, পেয়ে বেঁচে গেলো। সংসারের আওতায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সহজে, স্বচ্ছন্দে—মাছ যেমন জলে।

তবু তার মনে গুমরে মরছিলো সেই অতৃপ্তি—নিজের ইচ্ছাকে সে খাটাতে পারছে না। যেমন সে তার বাপের বাড়ির ছিলো না, তেমনি, এ-বাড়িরও সে নয়: এ-সব তার নয়, সে এ সংসারের অংশ নয়। যতই সে উৎসাহ নিয়ে কাজ করুক, শেষ পর্যন্ত সে বাইরে। সে চাইতো সব তার নিজের হোক, তার নিজের। তারই হাতে সব—সে তৈরি ক'রবে, গ'ড়ে তুলবে, সাজাবে নিজের হাতে। সব-কিছুর মধ্যে সে। বাড়িটা তাকে দিয়ে ভরা। কিন্তু এখানে—এত মিশে গিয়েও সে যেন ঠিক মিশে যেতে পারেনি, একটু আলগোছ ভাব, মনের অনেক নিচে একটু গোপন উদাসীনতা। তা হ'লেও এত কাজের, এত দায়িত্বের মধ্যে তার চাপা শক্তি খেলে বেড়াতে পারছিলো। সেটা কম নয়।

তিন বছর পর স্ত্রীর ভাগ্য ফললো; গিরিজার মাইনে বাড়লো আরো দশ টাকা। পুজোর ছুটিতে সে যখন এলো, তার মা বললেন, 'কত কাল আর মেসের ভাত খাবি, এইবার ছোটখাটো একটা বাড়ি নে, বৌকে নিয়ে যা।'

গিরিজা কলকাতায় ফিরে এসে তা-ই ক'রলে। যদি তার মা না বলতেন, তাহ'লে আরো

কিছুকাল বোধ হয় এ-কথা তার মনে হ'তো না। কিন্তু তার মা বলেছেন ব'লে মনে মনে সে খুশি হ'লো।

এলো রাধারাণী কলকাতায়। ভবানীপুরের এক গলির মধ্যে পুরোনো এক দোতালা বাড়ি, অনেক তার সরিক। তাদের ভাগে পড়েছে একটা বড় ঘর, একটা ছোট, আর একটা বারান্দা—রান্না খাওয়ার কাজ সেখানেই চালাতে হবে। নিচে জলের কল, তার উপর সবার সমান দখল। তাই নিয়ে সকালবেলাটায় একটা মারামারি বাধে। রান্নার জন্যে উপরে জল টেনে আনতে হয় বালতি ক'রে। বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে একটা ইট-বেরিয়ে-পড়া উঁচু দেয়াল—ঈশ্বর শুধু জানেন কেন ওটা সেখানে আছে। জানলা দিয়ে একটু তাকাবার উপায় নেই, দেয়ালে হোঁচট খেয়ে ফিরে আসে চোখ। ঘরে যে জানলা দুটো আছে, তা দিয়ে দুপুর বেলায় এক ফালি রোদ কি ক'রে যেন এসে ঢোকে, মিলিয়ে যায় দেখ্‌তে-না-দেখতে। তবু ভালো ছাতে যাবার সিঁড়ি আছে, সন্ধ্যে বেলাটায় নিঃশ্বাস ফেলা যায়। ভাড়া আঠারো টাকা।

খুশি হবার মতো বাড়ি নয়, রাধারাণীও মুখে অনেক আপত্তি জানালে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে উল্লসিত। তার বাড়ি। তার নিজের। নিজের! ভাবতেই রাধারাণীর শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। ওঃ, কী ক'রে সে সাজাবে এই বাড়ি, ক'রে তুলবে সুন্দর, গ'ড়ে তুলবে দিন থেকে দিন তার সংসার, তার নিজের সংসার। এ-বাড়ি তাকে দিয়ে ভরা; তার ইচ্ছা এখানে চরম। সেই জীর্ণ রুদ্ধশ্বাস বাড়ির সঙ্গে রাধারাণী কান-মাথা ডুবিয়ে প্রেমে প'ড়ে গেলো। এ যে তারই প্রতিকৃতি; তারই মনের ছায়া এর খোপে-খোপে, আনাচে-কানাচে। অন্তত, তা-ই হবে।

গিরিজা নিজের বুদ্ধি খরচ ক'রে সামান্য ও সাধারণ কিছু আসবাব কিনেছিলো; রাধারাণীর সেগুলো পছন্দ হ'লো না। বললে, 'ঐ চেয়ারটা কেন কিনেছো—হাঁটু-ভাঙা দ-য়ের মতো দেখতে?'

গিরিজা একটু কেশে বললে, 'সস্তায় পেলুম—'

'সস্তা!' রাধারাণীর কণ্ঠস্বরে ঐ শব্দটার প্রতি অবজ্ঞা ফুটে উঠলো। 'কে বলেছিলো তোমাকে এখন ওটা কিনতে? পাশ ফেরবার জায়গা নেই—তার মধ্যে একটা বিদ্‌কুটে চেয়ার এনে হাজির। দেবো একদিন ওটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে।'

গিরিজা চুপ ক'রে রইলো।

'আর—ঐ তক্তপোষ দিয়ে কী হবে? ব'য়ে গেছে বাজে কেরোসিন-কাঠে শুয়ে হাড়ে ব্যথা ক'রতে। খট্‌খটে মেঝে—মেঝেতে শুলে কেউ নিউমোনিয়ায় মরবে না। জায়গা নেই এক ফোঁটা, তার মধ্যে এই পাঁচসিকে দামের তক্তপোষ সব জায়গা জুড়ে থাক্, কেউ যেন আর চলাফেরা ক'রতে না পারে। মাথা খারাপ নাকি?'

গিরিজা ক্ষীণস্বরে আরম্ভ ক'রলে, 'আমি ভেবেছিলাম—'

'থাক্, তুমি যা ভেবেছিলে, তা আর বোলো না। একদিন যখন কাঠ-কয়লা থাকবে না, এটাকে ভেঙে এটা দিয়ে উনুন ধরাবো। তবে আমার শান্তি হবে।'

তক্তপোষটা বদ্‌লি হ'লো পাশের ছোট ঘরটায়, যেখানে থাকতো রাধারাণীর দুই ছোট-ছোট দেওর—নবীন আর যতীন। তারা এসেছিলো তাদের বৌদির সঙ্গে কলকাতায়, ইস্কুলে পড়বে ব'লে। তারা আপত্তি ক'রলে, 'ধরে না, বৌদি, তক্তপোষটা ভালো ক'রে।'

রাধারাণী বললে, 'ফাজলেমি রাখ্। গায়ে লাগলো না তক্তপোষটা—না? কেন, মন্দ কী এমন? বেশ তো শুবি দু'জনে জানলার দিকে মাথা দিয়ে—হাওয়া আসবে।'

তারা বললে, 'আর যে জায়গাই রইলো না।'

'ঘরের মধ্যে কি যুদ্ধ ক'রবি নাকি? দস্যিপনা ক'রতে হয় তো বাইরে রাস্তা রয়েছে, সরকারি পার্ক রয়েছে। ঘুমোবার সময় ঘরে এসে শুবি চুপচাপ।'

চেয়ারটা কিন্তু রাধারাণীর ঘরেই র'য়ে গেলো; জিনিসটা যা-ই হোক, একটা চেয়ার; আর চেয়ার ফেলে দেবার জিনিস নয়। ওটা রইলো এক কোণে, একটু মুখ-চোরা, লাজুক ভাবে—তবু নিজেকে যথাসম্ভব ভালো দেখাবার জন্য সচেষ্ট। গোপন গর্ব নিয়ে রাধারাণী মাঝে-মাঝে ওটার দিকে তাকাতো। জিনিসটা আসবাব নির্মাতার আর্টের একটা খুব ভালো নিদর্শন ঠিক নয়; একটু হাঁটু-ভাঙা দ-য়ের মতো চেহারাই বটে—সাদা-সিধে, বার্নিশছাড়া এক টুকরো কাঠ, হাতল নেই, পিঠটা ঠিক সম-কোণে, ব'সলেই উঠতে ইচ্ছে করে। তবু—ক্রমে-ক্রমে যে-সব জিনিস রাধারাণীর ঘরে জমে উঠতে থাকবে—এটা তারই সূচনা; সে-সব জিনিস, ব'লতে গেলে, এই চেয়ারটাই আনছে ডেকে। সুতরাং ওটা থাকতে পারে।

আর—কিছুদিন পর্যন্ত রাধারাণীর নেই মুহূর্তের বিশ্রাম, তার ফরমায়েস খাটতে খাটতে নবীন আর যতীন হাঁপিয়ে পড়লো—আর গিরিজাও, আপিস ক'রে যেটুকু সময় তার হাতে থাকতো। আনো পা-পোষ, মাদুর, দেয়ালে ঝুলোবার জাপানি পরদা, টুকটাক এটা আর ওটা, অত্যন্ত পরিমিত আয়ের মধ্যে যেটুকু সম্ভব—দাও ঝাঁট, ঢালো জল, ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ঘ'সে ঘ'সে পালিশ ক'রে তোলো মেঝে। তাদের চাকর-বাকর কেউ ছিলো না, নিজেদেরই জল ব'য়ে আনতে হ'তো নিচে থেকে বাল্‌তি ক'রে, লম্বা ঝাড়ন দিয়ে সাফ ক'রতে হ'তো সীলিঙের ময়লা; আর রাধারাণী মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে এমন উৎসাহ আর আনন্দ নিয়ে মেঝে ঘ'ষতো যা দেখে মন ভালো হ'য়ে যাবার কথা।

মোটের উপর, ফল হ'লো আশ্চর্য: এটুকু বাড়ির মধ্যে জ'মে উঠলো যতটা আরাম সম্ভব আর সৌন্দর্য। ছাতে যাবার সিঁড়ির গোড়ায় একটু ফাঁকা জায়গা; সেখানে রাধারাণী বসালো ফুলের টব, রান্নার বারান্দাটা ভাগ ক'রে নিলে নীল রঙে ছোপানো একটা পুরোনো কাপড়ের পরদা দিয়ে—গোটাকয়েক আত্মীয়দের ফোটোগ্রাফ ছিলো, সেগুলো তার দেয়ালে সাজাতে

নিয়ে নিলে একটা সম্পূর্ণ দুপুর। মোটামুটি সবই ভালো হ'লো, তবু তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। তবু তার মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত কেউ বলছে: 'না, হ'লো না, ঠিক হ'লো না।' সে নিজেকে ঢেলে দিলে তার সংসারে—দিলে তার শরীর আর আত্মা,—তার সব; এক মুহূর্ত ব'সে থাকা তার পক্ষে যন্ত্রণার মতো। সে যখন ফুলের টবে জল দিচ্ছে না তখন বিছানা-বালিশ ঘাড়ে ক'রে যাচ্ছে ছাতে রোদে দেবার জন্য; যখন আয়নাটার উপর চুন ঘ'সে চকচকে করছে না তখন কাঁসার বাসনগুলো অকারণে মাজছে ছাই দিয়ে, যতক্ষণ না তার মুখের ছায়া তাতে ভেসে ওঠে। একটা-না-একটা তার করা চাই-ই—সব সময়ে। একটা মুহূর্ত সে নষ্ট হ'তে দেবে না; ক্রীতদাসীর মতো সে খাটবে—আর ওঃ, দাসীবৃত্তির আনন্দ, গৌরব!

সগৌরবে, সানন্দে, সে তাকাতো তার বাড়ির দিকে; বাড়িটার যেন কিছু বলবার আছে তাকে; দু'য়ের মধ্যে নীরব, নিবিড় ঐক্য। রক্ত চঞ্চল হ'য়ে, উষ্ণ হ'য়ে বইছে রাধারাণীর শিরায়, তবু তার মনের মধ্যে সেই কথা: 'হ'লো না, তবু হ'লো না। আরো অনেক বাকি র'য়ে গেছে।' মনে মনে সে ভাবতো দক্ষিণ খোলা, আলাদা একটা বাড়ি, কালো বার্নিশের প্রকাণ্ড খাট, প্রমাণ সাইজের আয়না-লাগানো কাপড় রাখবার আলমারি। সুবিধে পেলেই সে টুকটাক আসবাব কিনতো—একটা বেতের চেয়ার কি একটা টিপয়, রাস্তায়-রাস্তায় যে-সব নিয়ে যায় ফিরি ক'রে; কিন্তু কালো বার্নিশের সেই প্রকাণ্ড খাট সব সময় তার মনে, আর আয়না-লাগানো আলমারি, আর আরো কত কী।

স্বামীকে সে মাঝে-মাঝে বলতো তার ইচ্ছা, ঠাট্টার স্বরে, গোপন স্বরে। গিরিজা নিষ্ফলভাবে হাসতো; যেন বলতে চায়, 'কী লাভ ও-সব ব'লে?' সে বলতো, 'কেন, হ'তে পারে না বুঝি? কী আর অমন বেশি।' গিরিজা নিজে বিশ্বাস না-ক'রে বলতো, 'তা হ'লে হবে।'

এক বছর পরে রাধারাণী জন্ম দিলে এক মৃত শিশুর। মুখ লুকিয়ে ছেলেটার জন্য সে খানিকক্ষণ কাঁদলে। কিন্তু তার নিজের শরীরই খুব খারাপ হ'য়ে পড়লো; দরকার হ'লো বড় ডাক্তার ডাকবার। রাধারাণী ব্যাকুল, তীব্র স্বরে বললে, 'কী যে করছো! এতগুলো টাকা—'

জীবনে প্রথমবার গিরিজা জোর দিয়ে একটা কথা বললে, 'তাই ব'লে তুমি মরবে নাকি?'

'পাগল! মরা কি এতই সহজ?'

কিন্তু গিরিজাকে থামানো গেলো না; সে নিয়ে এলো বড় ডাক্তার। এর মধ্যে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলো—যে-লোক সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতন নয়, সে যেমন ক'রে ভালোবাসে—অন্ধভাবে, মূঢ়ভাবে। স্ত্রীর চিকিৎসায় সে তার সঞ্চয় অনেকখানি হালকা ক'রে ফেললে।

দুর্বল, রুগ্ন, শয্যাগত, রাধারাণী অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট ক'রতে লাগলো। প্রতিটি

টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে যেন তার শরীরের এক ফোঁটা রক্ত। এ-টাকা দিয়ে কত কী হ'তে পারতো, বাড়ির শ্রী একেবারে ফিরিয়ে দেয়া যেতো। কেনই বা লোকে টাকা জমায়! ঐ রকম হবে জানলে সে আগে থেকেই সব খরচ ক'রে দিতো, একটি পয়সা রাখতো না হাতে। কেন সে মরতেও পারে না—তা হ'লেই তো এ-অপব্যয় আর হয় না। না—মরতে সে চায় না, তাকে সেরে উঠতেই হবে। কিন্তু এমনিও তো তা হ'তে পারতো।

একদিন সে তার স্বামীর হাত ধ'রে বললে, 'কী পাগ্‌লামি করছো। ভিখিরি হবে নাকি শেষটায়?'

গিরিজা বললে, 'টাকা চ'লে গেলে আবার আসে, কিন্তু—' বাকিটা সে বলতে পারলে না।

'কিন্তু এতই কি দরকার ছিলো?'

'তোমার ও-সব ভাবতে হবে না। তুমি এখন ভালো হ'য়ে ওঠো।'

ভালো রাধারাণী হ'য়ে উঠলো; আবার পড়লো তার বাড়ি নিয়ে। এতদিনের অবহেলার শোধ তো তুলতে হবে। সে যে এতদিন এ-বাড়িতে শুধু বাস করেছে, আর কিছুই করেনি, এ-কথা ভাবতে তার অসহ্য লাগছিলো।

'বাড়িটা বদল ক'রলে কেমন হয়?' একদিন সে কথায়-কথায় বললে। সে বলতে গেলে এ-বাড়িকে যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এ-বাড়িতে তাকে আর ধরছে না। এখন দরকার নতুন—নতুন আর বড়।

'আমিও সে-কথাই ভাবছিলুম', গিরিজা বললে, 'তোমার শরীরটা—'

'ওঃ, আমার শরীর!' এমন স্বরে রাধারাণী বললে কথাটা যে গিরিজা সেখান থেকে উঠে গিয়ে দাড়ি কামাবার আয়োজন ক'রতে লাগলো।

বাড়ি খোঁজা হ'তে লাগলো, কিন্তু কলকাতার বাড়ি বদল করবার মতো শক্ত আর কিছুই নয়। খালি বাড়ির অভাব নেই; কিন্তু একটাও এমন নয়, যা তারা নিতে পারে। তারা থাকতে পারে ঠিক এমন বাড়ি নেই কোনোখানে; অথ সব রকমই অজস্র। রোদে ঘুরে-ঘুরে ল্যাম্পপোস্টের বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে নবীন আর যতীন ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো।

নিজেদের একটা বাড়ি হ'লেই সব চেয়ে ভাল হয়', রাধারাণী বললে।

'আমি বাংলাদেশের লাট হ'লেই বা মন্দ কী?' গিরিজা একটা রসিকতার চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু সেটা ঠিক সার্থক হ'লো না। রাধারাণী ভুরু বাঁকিয়ে বললে, 'কী যে বল এক-একটা কথা, শুনলে গা জ্বালা করে। আজকালকার দিনে সে-সে বাড়ি করছে? সে যেন মনে-মনে জানতো একদিন তারও তা হবে।

ততক্ষণ চললো ভাড়া-বাড়ির খোঁজ; পাওয়া গেল না। কয়েক মাস কেটে গেলো। তারপর রাধারাণী আবার সন্তান প্রসব ক'রলে।

এবার মেয়ে। দিব্যি মোটাসোটা দেখতে, মাথা-ভরা কালো চুল, চ্যাঁচায় গলা ছেড়ে।

মীরার রাধারাণী ভয়ানক খুশি হ'লো। অনেক ভেবেচিন্তে মেয়ের নাম রাখলে মীরা। মীরার জন্য ব'সে-ব'সে সেলাই ক'রলে জামার স্তূপ, নানা রঙের। শিশুর গায়ে দু'ঘণ্টা এক জামা থাকে না। গিরিজা কিনে আনতে লাগলো বিলিতি দুধের রাশি-রাশি বোতল। দু'মাস গেলো। তারপর একদিন দেখা গেলো, মীরার মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। রাধারাণীর মনে হ'লো, সে যেন আর অত বেশি চ্যাচায় না, হাসে না। সে আরো বেশি ক'রে ম্যাস্কো খাওয়াতে গেলো, মীরা বেশি খেতে পারে না, যেটুকু খায় বমি ক'রে ফেলে। দেখতে দেখতে সে যেন অনেকটা শুকিয়ে গেলো। গিরিজা বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কিনে আনলো নতুনতম ও আশ্চর্যতম বিলিতি শিশুপথ্য। কিন্তু মীরা যেন কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে যেতে লাগলো। ডাকা হ'লো ডাক্তার, তিনি গম্ভীর হ'য়ে ওষুধ দিয়ে গেলেন। দিন পনেরো স্বস্ত্যয়নস্তি; তারপর মীরা মারা গেলো।

এর পরে আর ও-বাড়িতে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু বেশি ভাড়া দিয়েই গিরিজা চট্ ক'রে ঠিক ক'রে ফেললে এক বাড়ি। রাস্তাটা বড়, বাড়িটাও অনেক ভালো। দোতালায় তিনটে ঘর, রান্নাঘর, সুন্দর বাথরুম, ইলেকট্রিক লাইট। রাধারাণী অনুভব ক'রলে যে মীরার মৃত্যু সত্ত্বেও তার জীবন আরম্ভ হ'লো নতুন ক'রে।

পূজোর সময় গিরিজা মোটা বোনাস্ পেলো। অন্যান্য বছর এ-টাকা থেকে খানিকটা জমা হয়; এবার রাধারাণী বললে, 'একটা খাট কেনো, আর একটা আয়না-বসানো আলমারি কাপড় রাখবার জন্য।'

'সে যে অনেক টাকা', গিরিজা বললে।

'অনেক টাকাই তো পেয়েছো।' আর একটু পরে : 'কী হবে টাকা রেখে। একটা কিছু হবে, আর বেরিয়ে যাবে জলের মতো।'

গিরিজা বলতে যাচ্ছিলো, 'সেই জন্যেই তো।' কিন্তু সে আরম্ভ ক'রতে পারবার আগেই রাধারাণী বললে, 'না, এবার কিনতেই হবে। কিনতেই হবে।'

কেনা হ'লো। মস্ত খাট আর জাজিম ; আল্‌মারির আয়নাটা রাধারাণীর প্রায় দেড়গুণ লম্বা। সে সেটার দিকে তাকালে, মুগ্ধ। কাছাকাছি যখন কেউ থাকতো না, সে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থাকতো আয়নার দিকে, আয়নায় তার মূর্তির দিকে। আর প্রাণ আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগলো তার রক্তে, শোক লঙ্ঘন ক'রে, মৃত্যু পার হ'য়ে।

সেই সঙ্গে ফিরে এলো সেই ক্ষীণ তীক্ষ্ণ স্বর : 'তবু হ'লো না, তবু হ'লো না। এখনো হয়নি, এখনো হয়নি—আরো চাই, চাই-ই।' ধারালো তলোয়ারের মুখের মতো ছোট ছোট সেই কথাগুলো লাগলো গিয়ে তার মনে। তার নিজের একটা বাড়ি চাই, তার নিজের, যাকে সত্যি সত্যি নিজের বলা যায়। বালিগঞ্জের কোনোখানে ছোট একটা দোতলা বাড়ি, চওড়া লাল সিঁড়ি, সামনে ছোট একটু বাগান, সেখানে হেনা ফুটবে শ্রাবণ মাসে।

ছোটর উপর সুন্দর একটা বাড়ি—পৃথিবীর অন্য যে-কোনো বাড়ির চেয়ে সুন্দর, কেননা সেটা তার নিজের। এমন-কিছু বেশি আশা নয়।—কিন্তু এ যে আশার চেয়েও বেশি, এ একটা ক্ষুধা; তার রক্তের মধ্যে, জাগ্রত ও মগ্নচৈতন্য আচ্ছন্ন ক'রে একটা তীব্র ক্ষয়কারী বাসনা।

কিন্তু বছরের পর বছর সে কাটাতে লাগলো সেই ভাড়াটে বাড়িতেই। বাড়ি হিসাবে সেটাতে কোনো আপত্তি ছিলো না, তা ছাড়া সাজ-সরঞ্জাম একটু একটু ক'রে বেড়েই যাচ্ছিলো। সে-বছরই গিরিজার স্ত্রী-ভাগ্য আর একবার চাড় দিয়ে উঠলো; আপিসের এক পৌঢ় কেরানি হঠাৎ মারা গেলেন, গিরিজাকে নেয়া হ'লো সে-জায়গায়। পুরোপুরি দেড়-শো টাকা মাইনে। এত বড় একটা লাফ দিয়ে গিরিজা হাঁপাতে লাগলো। যা ঘটেছে সে প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলে না।

কিন্তু রাধারাণী লাফিয়ে পড়লো সেই স্ফীত আয়ের উপর: জানলায়-জানলায় হলদে-আর-কালো পরদা, কুশান আঁটা বেতের চেয়ার, ধবধবে সাদা বিলিতি চায়ের পেয়ালা, রান্নাঘরে কাঠের শেল্‌ফে সারি-সারি কাঁচের গেলাস। ওঃ, কেন এক-জনের খরচ করবার মতো যথেষ্ট থাকেনা, অজস্র থাকেনা? কিন্তু তা হ'লে কি এত উন্মাদনা থাকতো খরচ ক'রে!

তারা এখন বেশ সচ্ছল, রাধারাণীর কপাল আছে, সবাই বলছে। গিরিজার মা-বাপ এসে থাকেন মাঝে-মাঝে; অন্যান্য আত্মীয়রাও দু'চারদিন কাটিয়ে যায়। একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতে তারা তাকায় তাদের দিকে, সেটা রাধারাণীর ভালো লাগে। ঝি-চাকর আছে, তবু এখনো অনেক কাজ তার করা চাই নিজের হাতে; বাড়িটা তার হাতে, তার প্রাণের উত্তাপে যেন দিন থেকে দিন ফুটে উঠতে লাগলো। তার আশ্চর্য শক্তির স্রোত চাপা প'ড়ে থাকবে না, ছড়িয়ে যাবেই। সব সময়, এটা কি ওটা নিয়ে সে আছে; কখনো কেউ তাকে দিনে ঘুমোতে ছাখেনি, কখনো তার হাতে কেউ ছাখেনি একখানা বই কি মাসিকপত্র। কাটলো দু'বছর। তারপরে রাধারাণীর আবার সন্তান-সম্ভাবনা হ'লো। তার মুখ গেলো শুকিয়ে। মনে-মনে বললে, 'আবার কেন?' আবার কেন, যথেষ্ট হয়েছে। তার মনে পড়লো, কী কষ্ট সে পেয়েছিলো, মীরা যখন মারা গেলো। যথেষ্ট, আর সে সন্তান চায় না। শুধু কষ্ট, শুধু যন্ত্রণা—নির্বোধ, নিষ্ফল যন্ত্রণা।

কিন্তু শিশু গ'ড়ে উঠতে লাগলো তার গর্ভে—নিষ্ঠুর নিশ্চয়তায়, তীব্র জন্ম-প্রত্যাশায়। আর তার শরীর যেন একেবারে ভেঙে পড়লো; সে সহ্য ক'রতে পারে না, ও-কথা ভাবতে সহ্য ক'রতে পারে না। তার স্বাস্থ্য এমনিতে চমৎকার, কখনো অসুখ করে না, কিন্তু সে যেন মাতৃত্বের অদ্ভুত রকম অনুপযোগী, তা তাকে মানায় না। দিন-দিন সে ম্লান হ'য়ে যেতে

লাগলো—সে এক মুহূর্ত যার বসবার সময় নেই, সে এখন দিনের বেশির ভাগ শুয়ে কাটায়। গিরিজা শংকিত হ'লো; এলো ডাক্তার। যথারীতি উপদেশ, পদে-পদে নিয়ম মেনে চলা। প্রসব একটু কঠিন হ'তে পারে, ডাক্তার বললে। রাধারাণীর হৃৎপিণ্ড থমকে দাঁড়ালো।

শেষটায়, সময় যখন এলো, গিরিজা তাকে এক ম্যাটার্নিটি হোমে নিয়ে যাওয়াই ভালো মনে ক'রলে। খরচের একশেষ, কিন্তু রাধারাণীর প্রাণ বাঁচাতেই হবে। ব্যাপারটা বেশ উঁচুদরের, রাধারাণীর যত্নের, সেবার কোনো রকম ক্রটি হ'লো না। কিন্তু ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে, ধবধবে সাদা পোসাক পরা নীরবে সঞ্চরমাণ নার্সদের মাঝখানে—সেই নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন শুভ্রতার পরিমণ্ডলে তার মনে হ'তে লাগলো, সে যেন এরই মধ্যে মরে গেছে—মৃত্যুর এই শুভ্রতা, এই স্তব্ধতা। যেন একটা মোহের মধ্যে—সে সময় কাটাতে লাগলো,—কিছু না-ভেবে, নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা তাকে ঘিরে।

শিশু এলো, তার মাকে যেন দীর্ণ ক'রে দিয়ে। অসম্ভব, অসম্ভব। সে মরবে, রাধারাণীর কোনো সন্দেহ রইলো না। তাকে মরতেই হবে—যদি শুধু এই যন্ত্রণা থেকে, এই দ্বি-খণ্ডিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। আ, এত ভালো, মৃত্যুর কথা ভাবতে এত ভালো লাগে!

কিন্তু সে মরলো না; আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র আর বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধ পরিচর্যার ফলে সে বেঁচে উঠলো। আর শিশুটিও মরবার কোনো লক্ষণই দেখালে না; জীবন-ক্ষুধাতুর মুখ দিয়ে সে তার মা-র বুক আঁকড়ে ধরলে, শোষণ ক'রে নিলে নিষ্ঠুর তীব্রতায় জীবনের রস। মেয়ে। তার দিকে তাকাতে রাধারাণী শিউরে উঠলো—ঠিক যেন মীরার ছবি।

একমাস পর সে মুক্তি পেলো; মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো বাড়িতে। সবশুদ্ধ পাঁচ শো টাকা প্রায় খরচ। পাঁচ শো টাকা—রাধারাণীর বুকের রক্ত যেন জল হ'য়ে যায় সে-কথা ভাবতে। এতদিনের এত কষ্টের সঞ্চয়। এ-টাকা যেতে পারতো একটু জমি কেনবার জন্য; দু' এক বছরের মধ্যে সে আরম্ভ ক'রতে পারতো তার বাড়ি। চেষ্টা ক'রলে কিছু ধারও পাওয়া যেতো। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, বাড়ি করা—চেষ্টা ক'রলে। অন্তত, এখন থেকেই উদ্যোগ ক'রতে হয়, সুবিধে মতো এক টুকরো জমি পেলে কিনে রাখতে দোষ কী? তার বাক্স ভরা আছে গয়না, সে কখনো সে-সব পরে না, কী হবে তা দিয়ে? ওঃ, সে তার শেষ সোনার টুকরো বেচে দেবে—এক্ষুনি, এক্ষুনি, সমস্ত জীবন সে কাটিয়ে দেবে লোহা প'রে যদি সে তার নিজের বাড়িতে থাকতে পারে, তার নিজের বাড়িতে।

কিন্তু—ওঃ, এই তো অতগুলো টাকা বেরিয়ে গেলো, তারই জন্যে। বিষের মতো এ-চিন্তা। নিজেকে সে ঘৃণা ক'রতে লাগলো, তার জীবনকে; ঘৃণা ক'রতে লাগলো শিশুকে। ও কেন এলো? ওর কী দরকার ছিলো আসবার? সে তো ওকে চায়নি; ও কেন এলো তাকে সেই

দুঃখ মনে করিয়ে দিতে ? এক-এক সময় এমন হ'তো যে সে তার মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে সহ্য ক'রতে পারতো না।

আবার অন্য কোনো সময়ে সে হয় তো বাক্স থেকে রাশি-রাশি ছোট ছোট রঙিন জামা বার ক'রতো, মীরার জন্য সে যে-গুলো তৈরি করেছিলো নিজের হাতে। একটা-একটা ক'রে পরাতো খুকিকে, পরিয়ে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতো। খুকি হাত-পা ছুঁড়তো, অস্ফুট শব্দ কর'তো। তারপর হঠাৎ রাধারাণী ওকে টেনে নিতো বুকে, প্রাণপণে ওকে আঁকড়ে ধরতো বুকের উপর, এত জোরে যে খুকি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতো।

'আর যেন আমাদের ছেলেপুলে না হয়', এক রাত্রে সে তার স্বামীকে বললে।

'কেন ?'

'কোনো মানে হয় না।'

'মানে হয় না ?' গিরিজা কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না।

'শোনো, একটা কথা বলি।'

'কী ?'

'একটা বাড়ি ক'রলে কেমন হয় ?'

'বাড়ি ?'

'এত অবাক হচ্ছো কেন ? লেকের দিকে তো খুব সস্তায় জমি দিচ্ছে।'

গিরিজা বললে 'হুঁ।'

'এই কলকাতায়ই' তো চিরকাল থাকতে হবে—কতকাল আর বাড়ি-ভাড়া গুণবে। সবই কি আর একদিনে হবে—আস্তে-আস্তে একটা বাড়ি হয় বইকি—ইচ্ছে ক'রলে। নবীন, যতীন—ওরা কলেজে পড়ছে, ওদেরও তো রোজগার হবে। আর, অন্যদিকের খরচ কমিয়ে দিলেই হয়।'

গিরিজা সব কথা শুনলে, তারপর বললে, 'তা হয়।'

'হয় না ? নিশ্চয়ই হয়। হ'তেই হবে। আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, ভাড়াটে বাড়িতে আমি আর বেশিদিন থাকবো না।'

গিরিজা বললে, 'যাক্ কিছুদিন।'

সে-বছর পুজোর পর গিরিজার মাইনে দু'শো হ'লো। রাধারাণী আর অপেক্ষা ক'রলে না; বালিগঞ্জে অল্প একটু জায়গা কেনা হ'লো ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট থেকে। অর্ধেক টাকা একসঙ্গে দিতে গিরিজার ব্যাঙ্কের খাতা তলায় এসে ঠেকলো। বাকিটা দিতে হবে কিস্তিতে। রাধারাণীর বুকের ভিতরটা জল্‌জল্ ক'রতে লাগলো; তার চোখে এক নতুন দীপ্তি।

ফাল্গুন মাসে অত্যন্ত সাধারণ জ্বরে রাধারাণীর খুকি মারা গেলো। তার উপর যেন একটা শাপ আছে, তার কোনো সন্তান বাঁচবে না। খুকির মরবার কোনো কারণ ছিলো না ; সে যে মরবে, রাধারাণীর তা একবারও মনে হয় নি। এখন—এখন জানা গেলো যা-ই হোক্, সেটা কম নয়। খুকির মৃত্যুতে সে মনে-মনে একটা অদ্ভুত স্বস্তি অনুভব ক'রলে ; তার মনের মধ্যে সে যেন মুক্ত হ'লো। এ-মুক্তি চরম। যা-কিছু হবার শেষ হ'লো ; আর নয়।

এর পর রাধারাণী যেন হঠাৎ একেবারে অন্য রকম হ'য়ে গেলো। তার বয়েস এখন বাইশ—পরিপূর্ণ, পরিপক্ক নারীত্বের সময়—কি তা হ'য়ে আসছে। কিন্তু এরই মধ্যে তার নাকের দু'পাশে গভীর হ'য়ে রেখা দিয়েছে ; তার শরীরও যেন হ'য়ে উঠেছে অনেকটা শুকনো, নীরস। চট্ ক'রে দেখে মনে হয় না, এ যুবতীর শরীর। আর তার মেজাজ—তাও এমন খারাপ হ'য়ে পড়লো আগে তাকে যারা দেখেছিলো, তারা গেলো অবাক হ'য়ে। সবাই বলাবলি ক'রলে, যে 'আহা— এত গুলো শোক, আর তাও সন্তানের শোক—এ সামলানো কি সোজা।' রাধারাণী তার স্বামীকে ধম্‌কাচ্ছে, দেওরদের ধম্‌কাচ্ছে, ঝি চাকরদেব ধম্‌কাচ্ছে—কিছুতেই সে খুশি নয়, সবটাতেই তার আপত্তি। তার চোখে এক অদ্ভুত, প্রায় হিংস্র আভা। ঐ চোখ যেন তার সমস্ত শরীর থেকে শুষে নিয়েছে সব জীবনশক্তি। তার মুখে এখন শুধু এক কথা,—'বাঁচাও, খরচ বাঁচাও, বাড়ির জন্য পয়সা জমাও।' বাড়ি—বাড়ি তুলতে হবে, যত শিগ্‌গির হয়। প্রতিটি ছোট পয়সা জমা হ'তে থাকবে সেই উদ্দেশ্যে। আর সংসারের খরচ সে কমিয়ে দিলে রূঢ়ভাবে। আট আনার বেশি বাজার হ'তে পারবে না কোনো দিন ; নবীন কি যতীন জামা কাপড়ের কথা বললে সে মারমুখো হ'য়ে ওঠে, গিরিজার বৈকালিক জলযোগের প্রস্থ ক'মে গেলা ; পারতপক্ষে সে ঘরের আলো জ্বালতো না ; ইলেক্ট্রিসিটির বিল্ যাতে হাল্‌কা হয়, পুরোনো ছেঁড়া কাপড় সেলাই ক'রে-ক'রে সে চালিয়ে দিতো যতদিন সম্ভব। তাদের প্রত্যেককে যে খেতে হ'তো, সেটাও যেন তার সহ্য হ'তো না ; যদি পারতো খাওয়ার ব্যাপারটা বাতিল ক'রে দিয়ে পয়সাটা তুলে রাখতো ইট কেনবার জন্য। খরচ কমাও, খরচ কমাও—এ ছাড়া তার আর কথা নেই, এ ছাড়া আর ভাবনা নেই। তার মুখের উপর কথা বলতে কেউ সাহস পেতো না ; সবই হ'তো তার যেমন ইচ্ছা। তার কঠিন, কঠিন ইচ্ছার কাছে সবাই আনত। সে কর্তৃত্ব ক'রবে, রাজত্ব ক'রবে। সে সবার উপরে, সে চরম। আর, এই উন্মাদনা আর তিক্ততা সত্ত্বেও, এই তিক্ততা আর উন্মাদনার ভিতর দিয়েই সে পেলো তার পরিপূর্ণতা, তার ইচ্ছার নিঃসংশয় পরিপূর্ণতা। এ তার মনের মধ্যে একটা ব্যাধির মতো, তীব্র মোহের মতো তার বাড়ির এই চিন্তা। এ তাকে পেয়ে ব'সেছে ; সে নিজেকে আহুতি দিচ্ছে এর কাছে, এই অসহ্য আকাঙ্ক্ষার তীক্ষ্ণ আগুনে। তা জ্বলে-জ্বলে উঠছে তার চোখে, তার চোখের স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে, হিংস্র আভায়।

গেলো আরো তিন বছর। নবীন আর যতীন বেরুলো কলেজ থেকে। একজন জুটিয়ে

নিলে একটা ইস্কুল-মাস্টারি ; যতীন বি-এস্‌-সি, পাশ ক'রে ঢুকে গেলো কলকাতার কাছাকাছি এক চিনির কারখানায়। তাদের আয় বেশি নয়, খরচ আরো কম। রাধারাণীর সংসারের আরো উন্নতি হ'লো।

জমির দেনা শোধ হ'য়ে গেছে অনেক আগেই ; হাতে কিছু জমেছে। যতীন বললে, 'বৌদি, এইবার আরম্ভ করো তোমার বাড়ি।'

রাধারাণী বললে, 'আগে তোমাদের বিয়ে দিয়ে নিই।'

'তোমার বাড়ি তৈরি হবার আগে নয়।'

'তোমাদের এখন নিজেদের সংসার পাতবার সময় হয়েছে।'

যতীন বললে, 'এতদিন যে-বাড়িতে থাকবার অধিকার দিয়েছো, আজ কি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে ?'

'তোমরা নিজেদের সুখের ভাগ ছাড়বে কেন ?'

নবীন বললে, 'তোমাকে সুখী ক'রতে চাই ; এর বেশি সুখের আশা রাখিনে।'

'তাহ'লে বিয়ে করো।'

কোনো ওজর আপত্তি টিঁক্‌লো না ; রাধারাণী ওদের দু'জনের বিয়ে দিলে। নিজেই মেয়ে ঠিক ক'রলে দেখে। তার সংসার এখন বিরাট।

প্রত্যেককে পেতে হবে তার সুখের ভাগ। তার জন্য কাউকে নিজের স্বার্থ একটুকু ছেড়ে দিতে রাধারাণী দেবে না, সবাই স্থির হ'য়ে বসুক—তারপর তার বাড়ি, সবার শেষে, সবার উপরে। এ-কথা সে কাউকে মনে ক'রতে দেবে না যে অন্যকে ভাসিয়ে তার বাড়ি উঠেছে।

ঠিক হ'লো সামনের বছর আরম্ভ হবে কাজ।

কিন্তু এরই মধ্যে তার আবার গর্ভ-সঞ্চার হ'লো। যে মুহূর্তে সে জানলে, তার বুকের রক্ত হিম হ'য়ে গেলো। ভয়ে, আতংকে। আর ক্রোধে—অন্ধ, তীব্র ক্রোধে, তার স্বামীর প্রতি। স্বামীকে সে ঘৃণা ক'রতে আরম্ভ ক'রলে। ওঃ, সে চারিদিক মোটামুটি গুছিয়ে এনেছিলো—হঠাৎ সব নষ্ট হ'য়ে গেলো, সব। এর কী দরকার ছিলো ? এ যদি কারো নিষ্ঠুর বিদ্রূপ না হয়, এ তবে কী ? সে প্রায় পাগল হ'য়ে গেলো ব্যর্থতায়, ব্যর্থ আক্রোশে। তার বাড়ি কি তৈরি হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বে ধূলোয় ? নিষ্ফলতার একটা প্রেত কি তার পিছনে লেগে থাকবে সব সময় ?

স্বামীকে সে বললে, 'এ আবার কী ?'

গিরিজা কাঁচুমাচু মুখে বললে. 'কেন, ভালোই তো, দু'একটা ছেলেপুলে না-থাকলে ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না! কিন্তু ও কি থাকবে, ও কি থাকবে—'

'অলক্ষুণে কথা বোলো না, রাণী।'

'তুমি তো জানো আমার উপর শাপ আছে—'

'বাজে কথা ভেবে খামকা কেন মন-খারাপ করছো?'

রাধারাণী চুপ ক'রলে, তার পর থেকে, একেবারে চুপ ক'রে গেলো। সে যেন ডুবে গেলো তার নিজের মধ্যে। নিঃশব্দে সে কাজকর্ম করে, নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়, ক্লান্ত হ'লে চুপচাপ ব'সে থাকে। তার ক্ষীণ, ফ্যাকাশে শরীর নিয়ে সে প্রায় প্রেতের মতো, প্রেতের মতো আত্ম-বিস্মৃত, বিলুপ্ত। যেখানে সে আছে, সেখানে সে যেন নেই। তার শরীর-যন্ত্রের প্রত্যেকটি স্নায়ু এক আশংকিত অনিবার্যের জন্য টান্ হ'য়ে, স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

সময় যখন এলো, রাধারাণী কিছুতেই নিজেকে ম্যাটার্নিটি হোমে নীত হ'তে দিলে না। যদি সে মরবে তো মরবে। কিন্তু তার স্বাস্থ্য গেলোবারের মতো ভেঙে পড়েনি; বিশেষ কোনো ভয়ের কারণ ছিলো না। ডাক্তারও সে ডাকতে দেবে না; দিশি দাইয়েই কাজ চলবে।

হ'লো এক ছেলে। পরম অবজ্ঞা, উদাসীনতা নিয়ে রাধারাণী ওকে জন্ম দিলে। তার মনে কোনো ভাবনা নেই ওর জন্যে। শিশুকে সে লালন ক'রলে শুধু তার অর্ধেক সত্তা দিয়ে; দু'য়ের মধ্যে কোনো প্রকৃত সংস্পর্শ নেই। নিজেকে সে অনুভব ক'রলে অদ্ভুত রকম বিচ্ছিন্ন, আলাদা-হ'য়ে-সরে-যাওয়া।

কয়েক মাস পর গিরিজা বললে, 'বাজার খুব সস্তা যাচ্ছে, এইবার আরম্ভ ক'রে দিই কাজ।'

রাধারাণী বললে, 'কিছুদিন যাক্।'

'কেন?' গিরিজা অবাক হ'লো।'

'যাক্ না।' রাধারাণী নিজের কাছেও বোধ হয় বোঝাতে পারতো না, কেন সে এখন বাধা দিচ্ছে। কিন্তু অস্পষ্ট-ভাবে, খোকার সঙ্গে এ জড়িত। যদি খোকা—যদি খোকা মরে যায়। দেখা যাক অপেক্ষা ক'রে। নতুন বাড়িতে কোনো মৃত্যু হ'তে দিতে পারবে না সে। যেন এক দীর্ঘ, অসহ্য ডিলিরিয়মের ভিতর দিয়ে সে তার খোকার মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রতে লাগলো।

এক বছর গেলো। এর আগে তার কোনো সন্তান এক বছর পৌঁছাতে পারেনি। আস্তে-আস্তে, রাধারাণী খোকার দিকে ভালো ক'রে তাকাতে লাগলো। ফুটফুটে ছোট ছেলে, গোল-গাল হাত পা। গাল টোলে ভরা। আলোয় চঞ্চল তার ছোট শরীর। আশ্চর্য, এ যে তার শিশু। আর সে এর দিকে কখনো তাকায়নি, ভালো ক'রে একবার চেয়েও ছাখেনি।

আর হঠাৎ, খোকার জন্য বিশাল, উত্তপ্ত ভালোবাসায় সে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, অন্ধ হ'য়ে

গেলো। বিশাল বন্যার মতো তা গেয়ে গেলো তার উপর দিয়ে তাকে অভিভূত ক'রে, রুদ্ধশ্বাস ক'রে, মুহ্যমান। এত ভালোবাসা, তার বুক টন টন ক'রে ফেটে পড়ছে, সে আর পারে না। তার এত-দিনকার নিপীড়িত, ব্যর্থ মাতৃত্ব হঠাৎ জেগে উঠলো, মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। তা কষ্টের মতো, এত তীব্র। একজনকে, অন্তত, বিধাতা রেখেছেন তার আনন্দের জন্য, তাকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলবার জন্য। ওঃ, তারই জন্যে খোকা বাঁচবে, বেঁচে উঠবে। আর সে তার খোকার জন্য নিজেকে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে মিশিয়ে দেবে ধূলোয়, যদি তাতে খোকার ভাল হয়।

রাধারাণী যেন রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো কোনো জাদুতে; তার যৌবন জ্বলে উঠলো আগুনের শিখার মতো, তার শরীর অলোময়। এত আনন্দ জীবনে সে কখনো পায়নি: চারদিক কথা ক'য়ে উঠছে সমস্বরে, প্রতিধ্বনি তুলছে তার মনে। ঢেউয়ের ছলছলানি দিয়ে ঘেরা সে যেন এক দ্বীপ; প্রতি ছোটো হাওয়ায় ঢেউ উছলে যাচ্ছে তার বুকের উপর দিয়ে। আর এই আনন্দের উৎস তার খোকা; খোকা তার জীবনের, তার বিশ্বের কেন্দ্র।

কিছুকাল পরে আরম্ভ হ'লো বাড়ি। রাধারাণীর সব ব'লে দেয়া চাই—কোথায় কী হবে, ক'টা জানলা আর দরজা, বাথরুমটা কোন্‌খানে, কী রং হবে মেঝেতে। সব হ'য়ে ওঠে না, কুলোয় না টাকায়। এমনিতেই, গিরিজা আর তার ভাইয়েরা সর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছিলো বাড়ির পিছনে, রাধারাণীকে খুশি করবার জন্য। কেননা, তাদের মনে-মনে ধারণা ছিলো রাধারাণীই তাদের বাড়ির লক্ষ্মী।

রাধারাণী মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসে, কতদূর হ'লো। বাড়ি ফিরে এসে খোকাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, 'খোকা, নতুন বাড়িতে যাবি, নতুন বাড়িতে?'

খোকা বলে, 'ম্‌মা—'

'আমরা সেখানে থাক্‌বো, তুই আর আমি, টুকটুকে লাল সিঁড়ি, টুকটুকে লাল—'

মার মুখের দিকে তাকিয়ে খোকা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

চারমাস পরে বাড়ি শেষ হ'লো। গৃহ-প্রবেশে অনেককে, তারা নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালে। মোটের উপর বেশ বাড়ি—যদিও রাধারাণী যতটা আশা ক'রতে পেরেছিলো, ততটা হয়-তো নয়। তা হোক্, তবু এই ঝকঝকে নতুন বাড়ি, জানালায় রঙের গন্ধ, চোখ-ধাঁধানো সাদা দেয়াল—সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো ঠেকলো রাধারাণীর মনে। মেঝেতে রং দেওয়া সম্ভব হয়নি—নাই বা হ'লো, সিঁড়িটা তো লাল—অনেক, অনেক আগে সে ঠিক্ ক'রে রেখেছিলো, সিঁড়িটা লাল হবে। অনেক জায়গায় অনেক দেনা পড়ে আছে, ধারও হয়েছে বিস্তর—এ একরকম গায়ের জোরে তোলা বাড়ি। তা হোক্, ধার শোধ হ'য়ে যাবেই, কিন্তু বাড়িটা থাকবে, রাধারাণীর, তার নিজের। কলকাতায় তাদের প্রথম বাড়ির কথা তার মনে পড়লো, আর

হাঁটু ভাঙা দ'য়ের মতো সেই চেয়ার। চেয়ারটা এখনো আছে। এখন আর কোনো কাজেই লাগে না; তবু সে সেটা ফেলে দিতে আয়নি, নতুন বাড়িতেও সেটাকে নিয়ে এসেছে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে। ওটা তার ভাগ্যের প্রতীক।

সবাই বলাবলি ক'রলে, 'বৌটার কপাল আছে বটে। গিরিজা যে এতখানি ক'রবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

নতুন বাড়িতে প্রথম রাত্রি রাধারাণীর এক ফোঁটা ঘুম হ'লো না। জেগে থেকে-থেকে সে যেন সমস্ত বাড়িটাকে অনুভব করছিলো তার শরীর দিয়ে, আত্মা দিয়ে। এই বাড়িতে সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রবে তার নিজের প্রাণের এক অংশ দিয়ে। বাড়িটা বাঁচবে—তার মধ্যে, তার সঙ্গে বাঁচবে। তার আকাঙ্ক্ষায়, তার দুরাশায় এর হাওয়া বিদ্যুৎ-চকিত। এমনি অন্ধকার শুদ্ধরাত্রে এর কিছু বলবার থাকবে তাকে—স্পষ্ট মর্মরে, বাণীহীন ইঙ্গিতে। সে তার পূর্ণতা, তার অখণ্ডতা নিংড়ে আনবে এর কাছ থেকে। বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে আছে সম্ভাবনায়।

পরের দিনও তার সেই মোহ কাটলো না, যেন স্বপ্নের মধ্যে সে চলাফেরা করছে। দু'এক জনকে খেতে বলা হয়েছিলো; সে নিজেই গেলো রান্না ক'রতে। খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলো, এক ছোকরা চাকরকে কাছে বসিয়ে। রবিবার, কারো আপিসের তাড়া নেই; বিশাল সওদা এসেছে বাজার থেকে। রান্না আর ফুরোয় না। এক ফাঁকে সে উঠে গিয়ে খোকাকে দেখে এলো: খোকার ঘুম ভেঙে গেছে। হীরালাল তাকে মেঝেতে নামিয়ে ব'সে খেলা করছে। খোকাকে স্নান করাবার সময় হ'লো, কিন্তু এখন থাক্, সে ভাবলে, রান্নাটা সেরেই আসি। বললে, 'খোকা চান করবিনে?'

খোকা তার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ব'লে উঠলো 'ননা।' তারপর লাল বলটা হাতে নিয়ে তার মাকে দেখিয়ে বললে, 'ব।'

'হ্যাঁ, বল্।' খোকা কি দেরি ক'রে কথা কইতে শিখছে, না কি এমনিই হয়। ওর সঙ্গে সব সময় কারো-না-কারো কথা কওয়া দরকার, তা হ'লেই তাড়াতাড়ি শিখবে। 'হীরা ওর সঙ্গে ব'সে গল্প কর্, আমি এক্ষুনি আসছি'।

রাধারাণীর রান্না শেষ হ'য়ে এসেছিলো। খোকা কি সত্যি দেরি ক'রে কথা কইতে শিখছে, সে ভাবছিলো। তার মনে হচ্ছিলো, আর যত দেড় বছরের ছেলে সে দেখেছে, এর চেয়ে অনেক বেশি কথা কইতে পারে। কিন্তু হয়-তো সে শুধু ওরকম ভাবছে, হয়-তো এটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া একটু দেরি ক'রেই যদি কথা কইতে শেখে, তাতেই বা কী এসে যায়? শেষ পর্যন্ত যা হবে, সেটাই তো আসল। শেষ পর্যন্ত—কী হবে সে? সে-কথা ভাবতেই তো বুক কাঁপে—আশংকায় আনন্দে। তার এই খোকা—সে এক-দিন আশা ক'রবে, ব্যর্থ হবে, রাস্তার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চ'লে যাবে; সে একদিন দুঃখ পাবে, স্বপ্ন দেখবে, গ'ড়ে তুলবে নিজের অদৃষ্ট। ওর মা তখন কোথায়, ওর মা-কে ও তখন ভুলেও গেছে; ও জানবেও না যে ওর রক্তের

মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে ওর মায়েরই প্রাণ। যা-ই হোক, তবু মাঝে-মাঝে মনে করিয়ে দেবার জন্য রইলো এই বাড়ি, ওর মায়ের প্রাণে পরিপূর্ণ।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চীৎকার শোনা গেলো; তারপর মোটা পুরুষের গলা ব'লে উঠলো 'কী হ'লো?' কী আবার হ'লো? বাড়িতে বড় বেশি লোক; সব সময় কিছু-না-কিছু ঘটছেই। রাধারাণী হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মুছে বাইরে এলো। সিঁড়ির গোড়ায় সবাই জড়ো হয়েছে—তার স্বামী, দেওররা, জায়েরা। ব্যাপার কী? হঠাৎ সে স্বামীর তীব্র স্বর শুনতে পেলো, 'স'রে দাঁড়াও, স'রে দাঁড়াও—জল আনো, পাখা।' তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে গেলো। খানিকটা এসেই তার সমস্ত শরীর পাথর হ'য়ে গেলো, আর এক পা সে এগোতে পারলেনা। গিরিজা কোলে নিয়ে ব'সে আছে—খানিক আগে যা ছিলো তার খোকা, এখন একটা মাংসের তাল—অদ্ভুত, তা-ই তার মনে হ'লো, মুখটা কী-রকম থেঁতলে গেছে, কপালে, মাথায় রক্ত এরই মধ্যে দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। লাল সিঁড়িটা কোনো ভীষণ পিশাচের আরক্ত মুখ-ব্যাদনের মতো; লাল বল্‌টা গড়িয়ে পড়েছে গিয়ে বারান্দার অন্য কোণে। রাধারাণী একবার দেখলে। একবারে সব দেখে নিয়ে, তারপর চোখ বুজলো।

বেলা চারটার সময় হাসপাতাল থেকে খবর এলো। একবারের জন্যও খোকার জ্ঞান করানো যায়নি; এই মাত্র সে মারা গেছে।

শুনে রাধারাণী বললে, 'জান্‌তুম।'

তুলসী-গন্ধ

ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে অনেকগুলো অজ্ঞাত পদক্ষেপ, অনেক অবচেতন মুহূর্ত; ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে স্বপ্নের সেতু, যে-স্বপ্ন শেষের দিকে বাস্তবের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যায়। মিহিরকুমার সোমের পক্ষে, শীতের সেই সকালবেলায়, সেই স্বপ্ন গ'ড়ে উঠতে লাগলো সংগীতের ধ্বনিতে; ঘুমের সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো এক-একটা সুরময় শব্দের ওঠা-পড়া; তারপর সেই ঢেউ এসে লাগলো তার চেতন মনে; স্বপ্নের সেতু জাগরণের প্রান্তে এসে ঠেকলো। ঢেউয়ের পর ঢেউ, পৃথিবীর সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে বিক্ষিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া শব্দের আশ্চর্য সমাবেশ, সুর, সুরময় শব্দ। ঢেউয়ের পর ঢেউ অর্গ্যানের মৃদু, নরম স্বর ঘরের আবহাওয়াকে আদর ক'রে চলেছে। জেগে-ওঠার অনেকটা পরে মিহির বুঝতে পারলে, সে জেগে উঠেছে। অর্গ্যানের স্বর আরো স্পষ্ট হ'লো; এতক্ষণে যেন সংগীত হ'লো সম্পূর্ণ সরব। তবু, মিহিরের মনের উপর তা আদরের মতো, বিছানার যে-অংশ থেকে তার স্ত্রী একটু আগে উঠে গেছে, সেই উষ্ণতার মতো। একটুও নড়াচড়া না ক'রে মিহির সে-উষ্ণতা অনুভব ক'রতে পারছিলো। যেন কমলা তার শরীরের সারবস্তু ওখানে ফেলে রেখে গেছে। চোখ না খুলেও মিহির স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, কমলার বালিশটা যেখানে গর্ত হ'য়ে গেছে। যেখানে কমলা সমস্ত রাত ভ'রে তার মাথা রেখেছিলো; তার ছড়ানো, কালো চুল একটা ইসারার মতো, আহ্বানের মতো। সেই চুল নিয়ে সে আদর করেছিলো, একটা গোছা তুলে নিয়ে জড়িয়েছিলো তার আঙুলে। এ-কথা মনে ক'রতেই এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে মিহিরের মন যেন সোনালি-উষ্ণ হ'য়ে পেকে উঠলো, দক্ষিণপক্ক সোনালি আঙুরের মতো সোনালি—তার অন্তর্নিহিত রস, তার উত্তাপ, তার প্রাণ কমলার সত্তার সচেতনতা, কমলার উপর তার পরিপূর্ণ অধিকারের অনুভব। সোনালি আঙুর থেকে নিষ্কাষিত সোনালিতরো মদের মতো মিহিরের আত্মায় প্রবাহমান এই চিন্তা; কমলা তার, তার সমস্ত কালো চুল, তার তার সমস্ত উষ্ণ নরম শরীর নিয়ে কমলা তার।

এই চিন্তা একটা দীপ্তি, যা তারই ভিতর থেকে উত্থিত হ'য়ে তাকে আচ্ছন্ন করেছে; সেই দীপ্তিতে স্নাত, নিশ্চল, সে শুয়ে রইলো, পক্ক-সোনালি। ঘুমের মোহ সে তার মন থেকে কেটে যেতে দিলে না; তার স্বেচ্ছাবৃত তন্দ্রায়, সদ্য-পরিত্যক্ত স্বপ্নে অর্গ্যানের সুর-স্বর ঝ'রে পড়ছে। সে শুনতে লাগলো, বরং—তার একটা অংশ শুনতে লাগলো, অন্য অংশ দিয়ে সে যতক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব করছে কমলাকে; নিজের মধ্যে, নিজের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত কমলার ঐশ্বর্যময় চেতনা, সেই চেতনার বিলাস। আর শান্তি তার মনের মধ্যে গভীর। কমলায় আচ্ছন্ন, সে ভুলে গেলো, এখনো কত জিনিসপত্র খোলা বাকি রয়েছে, কতগুলো মাল আনাতে হবে ইস্টিশান থেকে, তারপর সেগুলো গুছোনো—নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে এসে প্রথমটায় কত যে হাঙ্গামা, দুশ্চিন্তা, গেলো কয়েক দিন ধ'রে তাকে যা অবিশ্রান্ত পীড়া দিয়েছে, এই সময়ে, ঘুম আর জাগরণের ক্ষণিক রামধনু-সংগমে, তা সে বিস্মৃত হ'য়ে রইলো। অর্গ্যান বেজে চলেছে, ধ্বনির পর ধ্বনি, সাতটা শব্দের অফুরন্ত লীলা। কী বলছে সে, এই অশরীরী স্বর, শূন্য বায়ুমণ্ডলে এই গীত-উৎসারী রন্ধ্রের পর্যায়? সে জানে না, জানতে চায় না। সে শুধু স্তব্ধ হ'য়ে থাকবে, আর তার চৈতন্যের উপর দিয়ে এই শব্দের স্রোত। সে চোখ খুলবে না—না, অযত্নে বাঁধা শিথিল খোঁপার নিচে কমলার শাদা ঘাড় দেখবার জন্যেও নয়, তার পিঠের নরম বাঁকা রেখা, তার শাড়ির এলায়িত আঁচলের স্মৃতিঘন অবিন্যস্ততা। বোজা চোখে মিহির টের পেলো, রোদে ঘর ভ'রে যাচ্ছে। এতক্ষণে তার ঘুমের আবেশও একেবারে ছুটে গিয়েছিলো, কিন্তু তবু সে উঠবে না।

হঠাৎ অর্গ্যান থেমে গেলো। যেন একটা আলো নিবে গেলো—কিম্বা প্রেক্ষাগৃহের রহস্য-নিবিড় অন্ধকারে জ্ব'লে উঠলো অতি স্পষ্ট, অতি সাংসারিক, নেহাৎই প্রয়োজনীয় আলো, রঙ্গমঞ্চের নাট্যের পর দেখতে-দেখতে চোখের সামনে নেমে আসছে বিচি বিজ্ঞাপন-অংকিত পরদা। স্বপ্নের আধো-অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল দিনের আলোয় মিহির চোখ মেললো। সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'য়ে গেলো কমলার সঙ্গে, যে ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলো তার স্বামীর দিকে, তার ঘুম এখনো ভাঙলো কিনা, দেখবার জন্য।

'ঘুম ভাঙলো এতক্ষণে?'

স্ত্রীর চোখে তাকিয়ে মিহির একটু হাসলো, কোনো কথা বললে না। আর, কমলার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ তার জন্য ভালোবাসা একটা ঢেউয়ের মতো মিহিরের হৃৎপিণ্ডের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো; একটা অন্ধ শক্তি, যার চাপে, তার মনে হ'লো, সে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

'ওঠো না', মৃদুস্বরে কমলা বললে, 'বেলা যে বাড়ছে, খেয়াল আছে? শেষটায় যে আপিসের তাড়ায় আর নাকে-মুখে পথ দেখবে না।'

মিহির লেপের নিচে থেকে একটা হাত বাড়িয়ে বললে, 'এখানে এসো।'

অর্গ্যানের ধার থেকে উঠে কমলা আস্তে-আস্তে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মিহির এক হাত দিয়ে তাকে নিজের বুকের উপরে টেনে এনে তার মুখে নিবিড় চুম্বন ক'রলো। আঙুলের ডগাগুলো দিয়ে তার মসৃণ ঘাড়ের উপর আঁচড় কাটতে কাটতে বললে, 'থাকো থাকো এখানে।'

এলায়িত, শান্ত, একটু সময় কমলা চুপ ক'রে রইলো, তারপর বললে, 'ছাড়ো এখন, চায়ের ব্যবস্থা করি গে।'

দিন আরম্ভ হ'য়ে গেলো, কাজের উৎকণ্ঠায়, বিরক্তিতে, অশান্তিতে ভরা দিন: প'ড়ে রইলো স্বপ্ন, মিলিয়ে গেলো তন্দ্রার অন্তর্লীন প্রেত-সংগীত। তার কাচারি-ঘরের কথা মনে প'ড়ে মিহিরের যেন ঈষৎ ন্যক্কারের উদ্রেক হ'লো—সেই দলিল আর ধুলোর গন্ধ, উড়নোন্মুখ সবুজ পাখির মতো গাউন-পরা ক্ষীণদেহ উকিলের দল, আর কোলাহল, সেই বিরামহীন কোলাহল। যেন এক বিশাল পতঙ্গবাহিনীর মতো তার মস্তিষ্কের ভিতর খেয়ে যাচ্ছে। আর বাড়ি ফেরবার সময় সেই ক্লান্তি, যেন সে একটা বিষ-বাষ্পের ভিতর দিয়ে হাঁটছে—সে ঠিক সে-ই আছে কিনা, বুঝতে পারছে না। সেই ক্লান্তির খানিকটা মিহিরের মধ্যে তখনই যেন সঞ্চারিত হ'লো, সেই সদ্য-নিদ্রোত্থিত শীতের রোদে উজ্জ্বল সকাল বেলায়।

বিছানা থেকে উঠে সে পূবের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাহিরে তাকিয়ে এক নতুন শহর, প্রাদেশিক শহরের শান্তি, মন্থরতা যেন সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে গাছের ঘন সারি, রাস্তা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চ'লে গেলো, ছোট এক মুসলমান ছেলে গোল লোহার চাকার পিছনে-পিছনে দৌড়চ্ছে। হেঁটে যারা যাচ্ছে, তাদের তাড়া নেই; এই সাধারণ মন্থরতার মধ্যে অদ্ভুত-রকম দ্রুত মনে হচ্ছে ছেলেটাকে। যতটা খারাপ হবে সে ভেবেছিলো, ততটা নয়। অন্তত, সকালবেলার এই আলোয়, গাঢ়-নীল আকাশের নিচে ততটা খারাপ লাগলো না।

কিন্তু তার মত বদ্‌লে গেলো, চায়ে ব'সে যখন সে খবরের কাগজ পেলো না। এখানে যে বিকেলে খবরের কাগজ আসে, এই ব্যাপারে সে এখনো অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি। বিকালবেলা খবরের কাগজ! এমন আজগুবি কাণ্ড কে কবে শুনেছে! তার নতুন কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মিহির একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর মন্তব্য ক'রলে।

'তা আর কী হয়েছে', কমলা বল্‌লে। 'কাগজটা ভাঁজ না খুলে পরদিন সকালের জন্য রেখে দিলেই তো হয়।'

মিহির নিজের মনে গর্জাতে লাগলো', 'এ-রকম জায়গায় ভদ্দরলোক কী ক'রে বাস ক'রতে পারে! আমি আগেই জানতাম। বদ্‌লির খবর যেদিন এলো, সেই দিনই তো বলেছিলাম—'

'কী আর ক'রবে। তোমার আপত্তি সরকার তো শুনবে না।'

'আর তুমি বলেছিলে, "বেশ হবে, চলো। ঢাকা বেশ জায়গা।—" বেশ!'

'আমার তো ভালোই লাগে। সত্যি।'

'পৃথিবীতে কার যে কী ভালো লাগে, বোঝা মুস্কিল।' যেন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে তাদের মনান্তর হ'য়ে গেছে এইভাবে মিহির চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে। তার মুখ লক্ষ্য ক'রে কমলা মনে-মনে হাসলো। অদ্ভুত, তার স্বামীর এই একগুঁয়েমি, যে-কোনো বিষয়ে এতটুকু মতদ্বৈধ—সহ্য ক'রতে না-পারা, তার এই আশা করা যে যে-কোনো বিষয়ে অন্য-সবাই ঠিক তার মতো ক'রেই ভাববে। তাকে তোয়াজ করবার জন্য সে বললে, 'ছেলেবেলায় এখানেই ছিলুম কিনা, অনেকদিন পর পুরোনো জায়গায় এলে ভালো লাগে না?'

মিহির অন্য মনস্কভাবে বল্‌লে 'হুঁ।'

বরাবর কমলার মনে এ-ইচ্ছে ছিলো, আর একবার ঢাকায় আসবার, একবার অন্তত। মনে-মনে সে জানতোও যে এই ইচ্ছা তার পরিপূর্ণ হবে। আর তা-ই তো হ'লো, দুপুর-বেলাকার ঘুমন্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নিজের মনে সে বললে, তা-ই তো হ'লো। তার মুর্শিদাবাদ সিল্কের নক্সা-আঁকা শাড়ি আর রঙিন ছাতা নিয়ে প্রাদেশিক শহরের দুপুরবেলাকার শান্ত রাস্তায় সে এক সুন্দর ছবি: রাস্তা দিয়ে আর যে-দু'চার জন লোক যাচ্ছিলো তাকে ভালো ক'রে দেখবার জন্য একটু থমকে দাঁড়াচ্ছিলো। কিন্তু ও-সব কিছুই তার চোখে পড়ছিলো না, সে শুধু ভাবছিলো, এ কী অদ্ভুত, কী অদ্ভুত যে সে এখানে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে ছ'বছর পরে; আকাশ যেমন তার সমস্ত নীলিমা দিয়ে সূর্যের আলোকে পান করছে, কমলার মন তেমনি সবগুলো তন্তু দিয়ে, প্রতি তন্তুর প্রতিটি সূক্ষ্ম অণু দিয়ে শুধু শোষণ করছে এই চিন্তা। সে একবার ভাবলো না, কোথায় যাচ্ছে, আর কেনই বা যাচ্ছে। কিন্তু যেন আগে থেকে কারো সঙ্গে সব ঠিক হ'য়ে আছে, স্বামী আপিসে চ'লে যাবার খানিক পরে সে-ও বেরিয়ে এসেছে। কিছুই এসে যাবে না, স্বামীর অনেক আগেই সে ফিরতে পারবে। একটা পুরোনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি প্রচুর শব্দ ক'রতে ক'রতে চ'লে গেলো, ধুলোয় চারিদিক প্রায় অন্ধকার ক'রে দিয়ে। চারটে চাকার ঘূর্ণনের ফল এত ধুলো হ'তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তা-ও কমলার মনের সুর কেটে দিলে না; এই ধুলো, এর গন্ধও তার পরিচিত, একে তার প্রত্যাবর্তনের একটা অংশ ব'লে অনুভব ক'রলো। এখানকার উপর তার অধিকারের এটা একটা স্বীকৃতি। পথ সংক্ষেপ করবার জন্য রাস্তা ছেড়ে সে যখন মাঠে নামলো নিজেকে তার আশ্চর্যরকম সুখী মনে হ'তে লাগলো, যে-সময়ে সে ইস্কুলে প'ড়তো, প্রায় সেই সময়কার মতো। সত্যি বলতে, হঠাৎ তার মনে হ'লো, সত্যি বলতে সে ভুলে গিয়েছিলো, সুখ কী জিনিস। সে বেঁচে ছিলো, এ পর্যন্ত; আরামে, স্বাচ্ছন্দ্যে, তার স্বামীর, অন্য-সবার এবং কখনো-কখনো তার নিজেরও মতে সুখে বেঁচে ছিলো। কিন্তু একটা উপলব্ধি তার

হয়েছিলো: তা এই যে, আসলে সুখ কি দুঃখ ব'লে কিছু নেই ; আছে শুধু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের বিরোধ কি সামঞ্জস্য, দিন থেকে দিন নিজের মধ্যে নিজের আচ্ছাদন কি উন্মীলন। সুখ আর দুঃখ, নিজেকে সে বলতে ভালোবাসতো, হচ্ছে ইস্কুল পড়ুয়া অবস্থার কুসংস্কার। সেই কুসংস্কারের মোহে আজ আবার সে পড়েছে। তার মনে হ'তে লাগলো, নিজের থেকে আলাদা যেন কিছু আছে, যাকে কতদিন সে খুঁজেছে, যদিও সেটা বুঝতে পারেনি। উঁচুনিচু মাঠের মধ্যে লঘু তার পদক্ষেপ ; সহজ তার গতি-ভঙ্গি, শূন্য মাঠ আর অজস্র আকাশের মাঝখানে একটি রঙিন পালকের মতো উজ্জ্বল, অনায়াসবিহারী তার শরীর।

যে-জায়গায় সে যাবে, তা কাছে এসে প'ড়লো। হঠাৎ তাকিয়ে সে পাড়াটাকে চিনতে পারলো না। পাড়ার ঠিক প্রান্তবর্তী প্রকাণ্ড এক বটগাছ ছিলো, সেখানটা এখন খাঁ-খাঁ করছে। মনের মধ্যে সে একটা আঘাত পেলো, কিন্তু এ-রকম না হ'য়ে উপায় নেই। প্রগতি থামতে পারে না। ভাখো না, দালানে-দালানে পাড়াটা ছেয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত নগরোপকণ্ঠ— যেখান থেকে সাপ্তাহিক পত্রে নারী-অধিকার সম্বন্ধে চিঠি যায়, যেখানে সরস্বতী পূজো ও নববর্ষে ছোট-ছোট মেয়েদের নৃত্যাভিনয় হয়, যেখানকার ছেলেরা দস্তুরমতো এইচ্-জি-ওয়েল্‌সের বই পড়ে। পেন্সন প্রাপ্ত ডেপুটি মুন্সেফের উপনিবেশ: নিখুঁত-রকম ভদ্রোচিত, অতিরিক্ত মাত্রায় সাজানো-গুছোনো, পালিশ-করা। আশ্চর্য নয়, বট গাছকে যে ওখানে টিঁকতে দেবে না, কে জানে কত দীর্ঘ বছর ধ'রে যা আস্তে-আস্তে মাটির গভীর অন্ধকারের মধ্যে মূল বিস্তার ক'রে আকাশের নিচে অগণ্য পাতায় বিকশিত তার ঝিরঝিরে প্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

এখন আর এখানে, কমলা মনে-মনে ভাবলে, গভীর রাত্রে শকুন-শিশুর ডাকে গা-ছম্-ছম্ ক'রবে না ; জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যাবে না জমাট-কালো সেই অন্ধকার, বর্ষার দিনে জল দাঁড়াবে না মাঠে। এই পাড়ার উপর পড়েছে সভ্যতার লৌহ-মুষ্টি, শকুন-পরিবারের অন্য বাড়ি খুঁজতে হয়েছে, গজিয়ে উঠেছে কয়েক গজ পর-পর লোহার থাম, বিদ্যুদ্বহ যুগ্ম-তারকে যা ধারণ করছে। অবাক হবার কিছু নেই ; এ-রকম যে হবে, তা আশাই করা যায়। তবু দু'পাশে জানলায়-রঙিন-পরদা-খাটানো বাড়ির সারির মাঝখানে পাকা সড়ক দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কমলা একবার সে-সময়ের কথা মনে না ক'রে পারলে না, যখন বর্ষার দিনে সেই বড় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জল-কাদা ভেঙে কত কষ্টে এসে বাড়ি পৌঁছতে হ'তো—নির্জন প্রান্তরের মধ্যে দু'চারখানা মাত্র বাড়ির একটি। চৈত্রমাসে কাঁচা রাস্তায় ধূলো উড়তো, বটের শুকনো ঝরা পাতার রাশিতে সমস্ত রাস্তা যেতো গেরুয়া হ'য়ে। বৃষ্টির জল যেখানেই একটু জমতো, হলদে সবুজ রঙের স্ফীতদেহ ব্যাঙের দল স্ফীততরো কণ্ঠনালী প্রদর্শন ক'রে উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি ক'রতো: মাঠ দিয়ে হাঁটতে গেলেই কাপড়ে বিঁধে যেতো অগুন্তি চোরকাঁটা ; শ্রাবণের সকালবেলায় ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে বর্ষাপ্রকৃতি যেন আলোর ভিক্ষায় তার নীল হাতের অঞ্জলি বাড়িয়ে

ধ'রতো। আর রাত্রিতে—কী নির্জনতা, কী অন্ধকার! রহস্যে আর ভয়ে ভরা বটগাছের বিশাল আবছায়া-মূর্তি। একদিন এই সমস্ত জায়গাটা ছিলো বন; শহর থেকে দুঃসাহসী ইস্কুলের ছেলেরা এখানে বেড়াতে এসে সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ি ফিরে যেতো। সেই সময় থেকে—আরো কত, কত আগে থেকে! সেই বটগাছ রাজত্ব করেছে এখানে: পাখিতে পতঙ্গে পাতায় বিচিত্র প্রাণময় এক জগৎ, আকাশের দিকে বিশাল ডালপালা মেলে দিয়ে সূর্যকে সে পান করেছে আর বৃষ্টিকে, সূর্যের শক্তিকে সে প্রেরণ করেছে তার দেহের অন্ধকারে লীন লক্ষ-লক্ষ তন্তুতে, বৃষ্টির উজ্জীবনকে সে প্রস্ফুটিত করেছে নতুন, সবুজ পাতার ঐশ্বর্যে। সেই সমস্ত প্রাণ, প্রাণের ক্লান্তিহীন, ক্ষান্তিহীন লীলা হঠাৎ একদিন শেষ হ'য়ে গেলো। এই বনদেবতার পতনের সঙ্গে-সঙ্গে কী ভীষণ আর্তনাদ উত্থিত হ'য়ে থাকবে! কমলা যেন নিজের মধ্যে সেই শব্দ শুনতে পেলো—আকাশ-ফাটানো মৃত্যু চীৎকার।—কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা, মন খারাপ করা বৃথা; এ-রকম যে হ'তেই হবে। প্রজাসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, নতুন জায়গা চাই। মানুষ এলো তার সভ্যতার যন্ত্রপাতি নিয়ে। দেখা গেলো, এতখানি জায়গা জুড়ে এই যে গাছটা রয়েছে, সেটা বাহুল্য। যে শক্তি রাস্তার ধারে বসিয়েছে জলের কল, ইলেকট্রিক আলোর থাম, তারই একটা প্রশাখা উপ্‌ড়ে ফেললো গাছটাকে। সেই শক্তিকে কে বাধা দেবে? তার আশ্রয়ের বাইরে কমলার নিজেরও যে এক মুহূর্ত চলেনা। না, প্রতিবাদ করা বৃথা।

পাড়াটা একেবারে চুপচাপ; বাড়িগুলোর দরজা বন্ধ; সমস্ত আবহাওয়ায় মধ্যাহ্ন-আহার-পরবর্তী বুর্জোয়া বিশ্রাম। কমলার সময়ে বেশির ভাগ বাড়িই ছিলো না, পাড়াটার চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে। তার চোখে, তবু, কিছুই নতুন ঠেক্‌ছিলো না; বরং, নতুন যা-কিছু তার চোখ কিছুই গ্রহণ করছিলো না; বরং শুধু চোখেই গ্রহণ করছিলো। তার মনের মধ্যে সারাক্ষণ যে-ছবি ছিলো, তা ছ'বছর আগেকার, শীতকালে যখন এখানকার রাস্তা শাদা ধুলোয় ছেয়ে যেতো। যেন সেই সময়কার কোনো স্মরণচিহ্ন, কোনো অভিজ্ঞান সে বহন করেছিলো তার নিজের মধ্যে, এই জায়গার আত্মা তা চিনতে পেরেছে। যেন বয়ঃক্রম-অনুসারে বর্তমানে উপস্থিত থেকেও, তারই ভিতর থেকে উৎসারিত ছ'বছর আগেকার এক অনুভব তাকে আচ্ছন্ন করেছে; তারই ভিতর দিয়ে সে হাঁটছে। হঠাৎ একটা বাড়ি তার চোখে পড়লো—সেটা পুরোনো। এ-বাড়ির লোকের সঙ্গে তার অল্প জানা-শোনা ছিলো। কী অদ্ভুত হয়, সে যদি এখন ঢুকে পড়ে। বিধবা ভদ্রমহিলা প্রথমে তাকে চিনতে পারবেন না, তারপর চিনতে যখন পারবেন—সেই কঠিন, মধ্যবিত্ত ভদ্রতা, লোহার জামা-পরা সৌজন্য, অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্র আলাপ, সবসুদ্ধ তার প্রতি এমন মনোযোগ দেখানো, যাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, সে যত শিগ্‌গির চ'লে যায়, ততই ভালো।—কমলা ও-সব ভালো ক'রেই জানে, তার বাড়িতে কেউ এলে সে-ও ঐ রকমই করে। এরই মধ্যে তার প্রতিবেশীরা সচেতন হ'য়ে উঠেছে, কাল একজন এসেছিলেন। ঘরদোরের নিরাসবাব অবস্থার জন্য সে প্রচুরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা

করেছিলো—পরে নিজেই অবাক হ'য়ে ভেবেছিলো, ওটা ক'রতে গেলো কেন? কারণ সত্যি বল্‌তে, যেমন ছিলো, তাকেই আস্‌বাবের বাড়াবাড়ি বলা যেতে পারে। তাদের যে আরো অনেক জিনিসপত্র আছে, প্রতিবেশীকে পরোক্ষে তা জানিয়ে দেয়া ছাড়া এ আর কী? সে যাক্‌, পারিপার্শ্বিককে একেবারে ছাড়িয়ে ওঠবার আশা কোনোরকমেই করা যায় না। তা ছাড়া, একজনের কাছ থেকে লোকে যেমন আশা করে, তেমনি ক'রতে হয়। মহিলাটি বলেছিলেন, 'ঢাকায় বড় মশা।' সে বলেছিলো, 'হ্যাঁ, তা-ই দেখছি।' 'মশারি খাটিয়ে শুলে মশা লাগে না।' 'মশারির ফাঁক দিয়েও অনেক সময় এসে ঢোকে', এ কথার উত্তরে সে বলেছিলো। আশ্চর্য, সে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে নি। এতে যে হাস্যকর কিছু আছে, তা-ও তার মনে হয় নি। এ-সব ব্যাপারে হেসে উঠলে তার চলতো না; একজনের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, তা-ই সে করে।

একটা বাড়ির সামনে ছোট বাগানে অজস্র গাঁদা ফুল আগুন জালিয়ে দিয়েছে, এক কোণে ফুটে রয়েছে প্রকাণ্ড এক সূর্যমুখী। কিন্তু গতি মন্থর ক'রে এনেও সে থামলো না; আবার চ'লতে লাগলো। ইটের দেয়ালে ঘেরা খড়ের ছাউনি দেয়া সেই ঘর দেখা যাচ্ছে; দূর থেকে তা প্রায় আগেকার মতোই দেখালো—কোনোকালেই ঘরটা খুব ঝকঝকে, ফিটফাট ছিলো না। তার কাছে আসতে কমলার পদক্ষেপ স্বতঃই মন্থর হ'য়ে এলো, তার শরীরের সলীল লঘুতা গেলো হারিয়ে। এতক্ষণ সে নিজেই আসছিলো; এখন একটা ইচ্ছা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যা তার নয়। দেয়ালের ঠিক বাইরে এসে সে দাঁড়ালো। ইটগুলো এখানে-ওখানে খ'সে পড়েছে। স্বচ্ছন্দ মধ্যবিত্ততার মধ্যে এই জীর্ণ গৃহ একটা অশোভনতা, ঔদ্ধত্য। এতদিন যে এটাকে টিকতে দেয়া হয়েছে, তা-ই আশ্চর্য। দেয়ালের গায়ে কাঠের একটা দরজা খোলাই রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে সে তাকালো; উঠোন আগাছায় ছেয়ে গেছে; একটা লাল গোরু আর কয়েকটা ছাগল সেখানে চ'রে বেড়াচ্ছে। এক পাশে ঘরের ছায়ায় একটা কুকুর সামনের দু'পা সোজা বাড়িয়ে দিয়ে তার ফাঁকে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে। কমলা তাকালো, তাকিয়ে রইলো। সে-যে বিশেষ-কিছু ভাবছিলো, তা নয়; তখনকার মতো তার মন যেন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে। আস্তে-আস্তে দরজা পার হ'য়ে সে ভিতরে ঢুকলো। তার পায়ের শব্দে কুকুরটা চমকে চোখ মেললো। তারদিকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে কয়েক পা হেঁটে একটু দূরে গিয়ে আবার শুয়ে প'ড়লো। উদাসীন গোরুটা সশব্দে দাঁত দিয়ে ঘাস ছিঁড়ছে; তার লেজের প্রান্তদেশের ঝুঁটি অলসভাবে অল্প-অল্প নড়ছে। ঘরের বারান্দা ছাগলের পরিত্যাগে ও বিবিধ আবর্জনায় নোংরা; তীব্র দুর্গন্ধ যেন কমলার মস্তিষ্কে হঠাৎ এক বাড়ি মারলো। স্পষ্টত, বহুদিন এ-বাড়িতে কেউ বাস করে নি, বহুদিন এ-বাড়িকে নিজের মনে ফে'লে রাখা হয়েছে। ঘরে ঢোকবার দুটো দরজাতেই তালা লাগানো রয়েছে, বাড়িটা চুরির উপযুক্ত ব'লেও বিবেচিত হয় নি। বেড়ার গা থেকে পেলেস্তরা উঠে

আসছে। কমলা ঘরটার চারদিকে একবার ঘুরে দেখলো। পিছনের দিকে একটা পেয়ারা গাছ ছিলো, এখন একেবারে শুকিয়ে-যাওয়া, এখানে-ওখানে তার দু'টি-একটি ক'রে পাতা ছড়ানো। বাইরের দরজার দিকে দেয়ালের কাছে তুলসীমঞ্চের কাছে সে একটু দাঁড়ালো। সে-জায়গাটা রীতিমত তুলসীর জঙ্গল হ'য়ে গেছে। মঞ্জরীগুলো পেকে লাল হ'য়ে এসেছে। বর্ষার দিনে এই মঞ্চ বেয়ে উঠতো একটা অপরাজিতার লতা, ফুটতো গভীর নীল ছোট-ছোট ফুল—তার চোখের মতো। তার চোখের মতো! সে নিজে কখনো বুঝতে পারে নি, তার চোখ সত্যি-সত্যি নীল কিনা। এখন কয়েকটা ফুল ফুটে থাকতে দেখলে সে খুশি হ'তো। নিচু হ'য়ে একটা তুলসীর পাতা ছিঁড়ে সে তার আঙুলের মধ্যে চটকালো, গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে। তার সামনের হাওয়াটাকে সে কয়েকবার শুঁকলো, তুলসীর গন্ধ লেগে রইলো তার ঘ্রাণে। আর এই, এই হ'চ্ছে সব, যা সে এখানে থেকে নিয়ে যাবে; আর এরই জন্য সে এসেছিলো।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে দেখলো, একটা লোক কী কতগুলো জিনিস নিয়ে সাইকেল ক'রে তার দিকে আসছে। তার মনে হ'লো, লোকটা তার চেনা। সে কাছে আসতে কমলা তাকে ইসারা ক'রে ডাকলো। লোকটা সসম্ভ্রমে সাইকেল থেকে নেমে মাথার একটা অনির্দিষ্ট ভঙ্গি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তোমার ঐ দোকান?' কমলা জিজ্ঞেস ক'রলে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ', লোকটা তার সাধ্যমত পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণ করবার চেষ্টা ক'রলে। কমলা ঠিকই ধরেছিলো, লোকটা হচ্ছে পাড়ার মুদি। কিন্তু, তার মুখ থেকে এমন মনে হ'লো না, সে কখনো কমলাকে আগে দেখেছে ব'লে বুঝতে পারছে।

'শোনো, এই বাড়ি—এতে কেউ থাকে না আজকাল?'

'আজ্ঞে এ বাড়ি তো অনেকদিন খালি প'ড়ে আছে।'

'কোথায় গেলো—ছিলো যারা? একজন ছোক্‌রামতো বাবু আর তাঁর মা—'

'হ্যাঁ, মা-ঠাক্‌রুন বড় ভালো লোক ছিলেন—সব সওদা নিতেন আমার কাছ থেকে।' মুদির আস্তে-আস্তে সাহস বাড়ছিলো, চ্যাপটা কপালের নিচে তার ছোট-ছোট চোখ উঠছিলো উজ্জ্বল হ'য়ে। 'এখানে তাঁরা যখন এসে বাড়ি করলেন, আমি সবে দোকান খুলেছি। সেই থেকে মা-ঠাকরুণ—'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা এ-বাড়ি তাঁরা কবে ছেড়ে গেছেন, জানো?'

'এই—' মুদির চ্যাপ্‌টা কপালে কয়েকটা রেখা প'ড়লো, 'আজ্ঞে সে-তো অনেকদিন।'

'কতদিন?'

'চার বছর হবে', একটু ভেবে মুদি জবাব দিলে, 'কি কিছু বেশিও হ'তে পারে।'

'কোথায় গেছেন জানো?'

'ঠিক জানিনে।'

কমলা চুপ ক'রে রইলো।

মুদি বলতে লাগলো, 'যাবার আগের দিন মা-ঠাকরুনের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা কেউ এখানে আসেন নি আর?'

'আজ্ঞে না। মা-ঠাকরুনকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম; তিনি বললেন, "আর বোধ হয় আমরা ফিরবো না।" '

'হুঁ। আর বাড়িটা?

'বাড়িটা সেই থেকে খালি প'ড়ে আছে তো আছেই। এমন সুন্দর জায়গাটা, কী ছিরি ক'রে ফেলে রেখেছেন। পাড়ার পাঁচজন বলাবলি করেন। এখানে নতুন একটা বাড়ি তুললে—'

'আচ্ছা—'

মুদি মাঝপথে তার কথা থামিয়ে মাথার আর-একটা অনির্দিষ্ট ভঙ্গি ক'রে সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিলো, কমলা পিছন ফিরে ডাকলে, 'এই, শোনো—'

'আজ্ঞে?'

'এই নাও', কমলা তার হাতব্যাগ থেকে একটা টাকা বার ক'রলে।

মুদির মুখ হাসিতে ভেঙে গেলো। 'আজ্ঞে আপনি এ-পাড়ায় থাকেন নাকি?' সাইকেলের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে সে জিজ্ঞেস ক'রলো। কিন্তু কমলা ততক্ষণে উল্টো দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

তুলসীর গন্ধ তার সঙ্গে-সঙ্গে চ'লতে লাগ্‌লো, যে-পাতাটা সে আঙুলের মধ্যে চট্‌কেছিলো। একবার সে তার চোখের সামনে তার হাত মেলে ধ'রলো; বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে হল্‌দে দাগ লেগে রয়েছে। তার দু'আঙুলে অল্প একটু দাগ—এ-ই সব। এ-রকম যে হবে সে জানতো। সে জানতো, তবু এই সমস্ত পথ সে হেঁটে এসেছিলো। যতক্ষণ আসছিলো, সে কিছু ভাবে নি, ভাবতে পারে নি। কিন্তু সেই তুলসী-গন্ধ যেন তাকে একটু-একটু ক'রে জাগিয়ে তুলছিলো মোহ থেকে, যে-মোহ এতক্ষণ তাকে ঘিরে ছিলো। এতক্ষণে সে যেন তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে সচেতন হ'লো: অনুভব ক'রলো এই মধ্যবিত্ত পাড়ার দূর, বিচ্ছিন্ন বৈপরীত্য আর তার মাঝখানে সেই পরিত্যক্ত গৃহের তীব্র, তিক্ত শূন্যতা। তিক্ত, যেন তার হৃৎপিণ্ড

তিক্ত আর কঠিন হ'য়ে গেছে। শুধু একবার তাকে দেখতে! যাতে চোখে জল এসে না পড়ে, কমলা শক্ত ক'রে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধ'রলো; তার নিজেরই অজান্তে তার পদক্ষেপ দ্রুত থেকে দ্রুততরো হ'য়ে উঠতে লাগলো। শুধু একবার, এই সব দীর্ঘ বছরের সব তিক্ততা আর সংগ্রাম, প্রার্থনা আর প্রত্যাশার পরে, শুধু একবার তাকে দেখতে! কিন্তু সময় ক্লান্তিহীন, তা ব'য়ে চলে আর ব'য়ে চলে; তা ধুলো ছিটিয়ে যায়, আর যা ধুলো নয় তাকে ধুলো বানিয়ে যায়। কিন্তু এখনো নয়, কমলা প্রায় সশব্দে ব'লে উঠলো, এখনো নয়। ধুলো যখন ছিটিয়ে দেয়া হবে, ঠিক তারই আগে শুধু আর-একবার তাকে দেখতে! এই বাসনা কমলার মধ্যে ব্যাধির মতো হ'য়ে উঠলো, তার মাংসের মধ্যে অদৃশ্য এক ক্ষতের মতো। তার গালের উপর সে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অনুভব ক'রলো। সে তার রুমালের জন্য ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকালো, কিন্তু হঠাৎ তার সমস্ত দৃষ্টি এলো ঝাপসা হ'য়ে, শীতের উজ্জ্বল আকাশ বিবর্ণ হ'য়ে গেলো। সে একটুও অপেক্ষা ক'রলো না, হেঁটে চললো। চোখের জল আপনিই থেমে গেলো; রুমাল দিয়ে সে সযত্নে চোখের কোণ আর গাল মুছে ফেললো।

কী ক'রে কোন্ পথে সে বাড়ি ফিরে এলো, কমলা নিজেই টের পেলো না। ঘরে ঢুকে দেখলো, তার স্বামী খাটের উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে টানছে চুরুট আর পড়ছে কাগজের মলাটের এক ইংরিজি নভেল। মিহির বই থেকে চোখ সরিয়ে কমলার দিকে একটু তাকিয়ে রইলো। এটা তার একটা অভ্যাসের মধ্যে, কমলাকে কোনো কথা বলবার আগে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকা। যেন দৃষ্টি দিয়ে তার শরীরকে চাটছে, কমলার হঠাৎ মনে হ'লো। ঠিক এই মুহূর্তে তার দিকে অমন ক'রে তাকাবার জন্য মিহির বাড়িতে না-ও থাকতে পারতো। 'এত শিগ্গিরই ফিরে এলে?' সে জিজ্ঞেস না, ক'রে পারলে না।

'হ্যাঁ, একটা মামলার শুনানি আজ হঠাৎ অ্যাড্জোর্নড্ হ'য়ে গেলো কিনা—শিগ্গিরই চ'লে আসতে পারলাম। বাঁচলাম্। শুয়ে থাক্তে কী আরাম লাগছে।' আরামের বিলাসিতায় মিহির একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে কাৎ হ'য়ে শুলো। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'এই একটু ঘুরে এলাম।'

'তোমার মুখ বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে কিন্তু।'

'যা ধুলো রাস্তায়।'

পাশের ঘর থেকে জামাকাপড় বদ্লে একটু পরে কমলা এসে বললে, 'তিনটে বাজে। চা খাবে নাকি এখনই।'

'মন্দ কী।' তারপর, 'চলো না', একটু চুপ ক'রে থেকে মিহির বললে, 'আজ একটা বায়োস্কোপ দেখে আসি।'

'না, আমি আজ না গেলাম।'

'কেন ? বেশ তো—একটা দিন হটাৎ একটু ছুটি পাওয়া গেছে—'

'আমার তো আর ছুটির অভাব নেই।'

'সারাটা দুপুর', মিহিরের চোখে অত্যন্ত সস্নেহ, প্রায় করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠলো, 'তোমার পক্ষে একা-একা কাটানো সত্যি বিশ্রী। নয় ?'

'তা আর কী, আমাদের জন্যেই তো বাংলা মাসিকপত্র রয়েছে।'

'চলো আজ বায়োস্কোপেই যাওয়া যাক্। আমাদের কাচারির সামনে একটা সিনেমায় জ্যানেট্ গেনর দিচ্ছে, দেখলাম। অনেকদিন এ-সব দেখি নে; আজ ইচ্ছে করছে।'

'বেশ তো, যাও না তুমি।'

'তুমিও চলো।'

'আমার ইচ্ছে করছে না।'

'না, না, সে কী হয়। তুমি না গেলে আমার যে ভালোই লাগবে না।'

'কিন্তু আমায় যে গেলেই ভালো লাগবে না।'

'গেলেই, দেখবে, ভালো লাগবে।' ব্যাপারটার যেন মীমাংসা হ'য়ে গেছে, মিহির বললে, 'তা হ'লে চায়ের ব্যবস্থা করো।'

চায়ের ব্যবস্থা কমলা ক'রলো। স্বামীর মুখোমুখি ব'সলো চেয়ারে, তাকে চা ঢেলে দিয়ে নিজেও নিলে। নীরব চা সেবন। মিহিরের মেজাজ খুব ভালো ছিলো, সে দাঁত বা'র ক'রে অবিশ্রান্ত হাসতে লাগলো, যেন একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা তাকে অবিশ্রান্ত সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কমলা আত্ম-বিস্মৃত, স্তব্ধ, যেন সে সত্যি-সত্যি ওখানে নেই।

'ওঃ হো', রুটির টুকরোয় কামড় দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে মিহির ব'লে উঠলো, 'ইস্টিশন থেকে জিনিস-পত্তরগুলো তো আজও আনানো হ'লো না।'

কমলার কানে ও-কথা ঢুকেছে, তার কোনো পরিচয় পাওয়া গেলো না। 'বসবার ঘরটাই এখনো পর্যন্ত অগোছাল হ'য়ে প'ড়ে রইলো—অথচ নতুন এসেছি ব'লে কেউ-না-কেউ যে দেখা ক'রতে না আসছে, এমন নয়। নাঃ, এরই মধ্যে একদিন সময় ক'রে নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেলতে হবে। কী বলো ? আজ দুপুরেই তো চাকরটাকে দিয়ে তুমি খানিকটা করিয়ে রাখতে পারতে।' মিহির চায়ে আর এক চামচে চিনি ঢাললে।

'আচ্ছা ছাখো, বড় আয়নাটা শোবার ঘরে না রেখে বসবার ঘরে রাখলে কেমন হয় ? আর আজ আমার হঠাৎ মনে হ'লো, অ্যান্টিম্যাকাসারগুলো পুরোনো হ'য়ে যাচ্ছে—বদলানো দরকার। কলকাতায় থাকতে মনে হ'লেই ভালো হ'তো ; এখানে কি ভালো ক্রেটোন কাপড় পাওয়া যাবে ?—কী, চুপ ক'রে আছো কেন ?'

'চুপ ক'রেও কি থাকতে পারি নে ?'

'কিন্তু কাজের কথা বলছি যে, অত্যন্ত দরকারি কথা। শোনো ; বড় আয়নাটা বসবার ঘরে নিয়ে রাখলে—'

'কাল হবে ও-সব কথা। আজ থাক্।'

এতক্ষণে মিহির যেন তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রলে। 'কী হয়েছে ?'

'কিছু হয় নি।'

'কিছু হয় নি ? তা হ'লে তুমি ও-রকম চুপ ক'রে আছো কেন ? তোমার মন-খারাপ হয়েছে ?'

'যদি হ'য়েই থাকে, ধরো ? মাঝে-মাঝে কি মানুষের মন-খারাপও হ'তে নেই ?'

'যদিও আমি তো সম্প্রতি তার কোনো কারণ দেখছি নে', মিহির মন্তব্য ক'রলে, বেশ একটু ঝাঁঝ দিয়েই। তার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলো। একেবারে শিশুর মতো, অন্যের সম্বন্ধে তার এই অসহিষ্ণুতা। তার আশে-পাশে যা-কিছু, সব সময় ঠিক তারই মতো হ'তে হবে ; এক চুল এদিক ওদিক হ'লে সে সহ্য ক'রতে পারে না। এ-এক কঠিন অন্ধতা, প্রবৃত্তিগত একমুখিতা, যা এমন কোনো জিনিসকে কিছুতেই গ্রহণ ক'রবে না, যার সঙ্গে তার নিজের কিছুমাত্র গরমিল হয়। গ্রহণ না করুক, তাকে স্বীকারও ক'রবে না ; ভাণ ক'রবে—বোধ হয় বিশ্বাসও ক'রবে—যে তাদের অস্তিত্বই নেই। 'আমি হচ্ছি গিয়ে চরমপন্থী', নিজের সম্বন্ধে সে ব'লতে ভালোবাসতো, 'হয় আমি ঘৃণা করি, নয় ভালোবাসি।' সত্যি বলতে, অবিশ্যি, ঘৃণাতেই সে বিশেষত্ব অর্জন করেছিলো। যত লোকের সঙ্গে তার দেখা হ'তো, তাদের প্রায় প্রত্যেককেই সে শেষ পর্যন্ত ঘৃণা ক'রতো, তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এমন-কোনো জিনিস সে পেতোই যা তার ভালো লাগতো না, এবং সেই একটুখানি ভালো-না-লাগাই তার চরমপন্থী মনে ঘনীভূত হ'য়ে উঠতো ঘৃণায়। এবং সেটা সে তীব্র, স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ ক'রতো তার সেই মুহূর্তের প্রিয় বন্ধুর কাছে, ও অন্যের অভাবে কমলার কাছে। 'I hate him,' কি 'That loathesome man !' কি 'He's simply detestable'। বিশেষণ যত বেশি কড়া হ'তো, তার মুখ দাঁত-বা'র-করা হাসিতে ঠিক সেই অনুপাতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, মিহির চরমপন্থী লোক। আর ভালোবাসা—হ্যাঁ, ভালোবাসা। তার মানে কমলা। কমলাকে সে ভালোবাসে ; প্রবলভাবে, উচ্চ-সরবে ভালোবাসে। কথায়-কথায় তার ঘোষণা। কোনো বাড়িতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে গেলে এটা সে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেয় যে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। সকলের দেখবার জন্য, দেখে মুগ্ধ হবার জন্য সে সেটা যেমন ক'রে পারে সবখানে জাহির ক'রে বেড়ায়। অতি পবিত্র, সুন্দর ভালোবাসা। তার গৌরব, তার মুক্তি।

বাকিটা চা নীরবে সম্পন্ন হ'লো। চাকর এসে পেয়ালাগুলো সরিয়ে নিলে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মিহির চুরুট ধরালো। 'তা হ'লে বায়োস্কোপে যাবে না?'

'তুমি যাও না', কমলা বললে।

'কিন্তু তোমাকে ছাড়া যে—'

'Oh don't', কমলা ব'লে ফেললো।

'Don't—what?'

কমলা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো তার স্বামীর মুখে। ক্ষীণ হাসিতে তার ঠোঁট একটু বেঁকে গেলো। মৃদুস্বরে সে বললে, 'তুমি যাও, জ্যানেট গেনরকে দেখে এসো গে। আমার কেমন-যেন ক্লান্ত লাগছে।'

'বাজে কথা', মিহির তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে। 'ক্লান্ত লাগবার তোমার কী হ'য়েছে?'

কমলার চোখে হঠাৎ লুকোনো আগুন ঝলসে গেলো।—'না, ক্লান্ত লাগা, মন-খারাপ হওয়া, চুপ ক'রে থাকা ইত্যাদি সবই তোমার একচেটে ব্যাপার।'

কেউ তাকে ঠাট্টা করছে, এমন সন্দেহও মিহিরের পক্ষে বিষের মতো। সে কালো হ'য়ে গিয়ে বললে, 'মেয়ে মানুষের ন্যাকামি দেখলে আমার গা জ্ব'লে যায়।'

'তা যাতে বেশিক্ষণ আর দেখতে না হয়, সেই জন্যই তো আমি তোমাকে বলছি বায়োস্কোপে চ'লে যেতে।'

'আমার সঙ্গ তোমার আর ভালো লাগছে না, মনে হচ্ছে।' রাগে মিহির তার শাদা, বড়-বড় দাঁত প্রদর্শন ক'রলো।

'সব মানুষেরই কখনো-কখনো একা থাকবার অধিকার আছে।'

'আর সুতরাং, তুমি যাতে একা থাকতে পারো, আমাকে দু'ঘণ্টা বায়োস্কোপে গিয়ে ব'সে থাকতে হবে!'

'তোমার ইচ্ছে', ব'লে কমলা উঠে দাঁড়ালো। সে বেরোবার জন্য দরজার কাছে যেতেই মিহির ডাকলে, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'এখানেই সারাদিন ব'সে থাকতে হবে—না, কী?'

'হঠাৎ একেবারে বাদশাজাদি হ'য়ে উঠলে যে? ব্যাপার কী?'

'তুমি কি কখনোই চুপ ক'রে থাকতে পারো না?'

'না। আমি জানবো—আমাকে জানতেই হবে, তোমার কী হয়েছে।' সশব্দে চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে মিহির উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি আমার কাছ থেকে কী লুকোচ্ছো—তা আমাকে বলবে।' মিহির কয়েক পা হেঁটে এসে কমলার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

কমলার শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু শক্ত আর টান হ'য়ে উঠলো। যেন অন্য কারো কণ্ঠস্বরে সে বললে, 'কিন্তু তা তোমার না জানাই ভালো।'

'বলো, বলো', মিহির প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো। 'আমাকে জানতেই হবে।'

'শোনো তবে', অত্যন্ত শান্তভাবে, মিহিরের চোখের উপর চোখ রেখে কমলা বললে, 'আমি একজনকে ভালোবাসতাম—আজ তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম।' ব'লেই মিহিরকে এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে কমলা সে-ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

মিনিট দুই পরেই দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা পড়তে লাগলো। 'কমলা, লক্ষ্মী, একটু দরজটা খোলো, একটিবার খোলো।' ধাক্কার শব্দ আর মিহিরের চীৎকার সমস্ত বাড়িতে ধ্বনিত হ'লো।

চাকর-বাকররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রলে।

'খোলো, দরজা খোলো—কমলা, কমলা!'

খানিক পরে মিহির কমলার গলা শুনতে পেলো, 'একটু দাঁড়াও।' মিহির চুপ ক'রে অপেক্ষা ক'রলো।

'দরজা খোলা আছে এসো।'

মিহির ঘরে ঢুকে দেখলো, কমলা খাটের উপর ব'সে আছে। সে অত্যন্ত নরম স্বরে আরম্ভ ক'রলে, 'সত্যি—তুমি যা বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে?' মিহিরের কণ্ঠস্বর যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে গেলো।

কমলা চুপ ক'রে রইলো।

'কে সে? কোথায় থাকে সে?'

'যদি বলি', কমলা বললে, 'যদি বলি, তা হ'লে তুমি কী ক'রবে?'

'আমায় কী ক'রতে হবে, তা আমি জানি। তুমি শুধু আমাকে বলো, খপ ক'রে মিহির কমলার এক মনি বন্ধ জোরে চেপে ধ'রলো। 'বলো শিগগির।' মিহির আরো জোরে চাপ দিলে, আরো জোরে। কষ্টে কমলার চোখে জল এসে প'ড়লো।

আর হঠাৎ ভাঙা-ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠলো, 'সে কোথায় আমি কী ক'রে বলবো? সে কোথায়, আমি যদি তা জানতাম!'

'তার মানে?' কমলার মনিবন্ধের উপর মিহিরের হাতের মুঠি শ্লথ হ'য়ে এলো। 'তুমি মিথ্যে কথা বলছিলে?'

'You fool', একটানে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কমলা ব'লে উঠলো, 'You fool! সে মরে গেছে—মরে গেছে, তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। কখনো আর দেখা হবে না।' বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে কমলা কান্নায় ভেঙে প'ড়লো। কান্না থামাবার জন্য সে দাঁতের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে; তুলসীপাতার ক্ষীণ গন্ধ তখনও সেখানে লেগে ছিলো।

ভেরনল

মনীন্দ্রলাল বসু

মনীন্দ্রলাল বসু—জন্ম ১৮৯৭ কলকাতা। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯২০ সালে এম-এ ও ১৯২৩ সালে বি-এল পাশ করেন। ১৯২৫-২৯ ইউরোপে যান ব্যারিষ্টারী পড়তে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস করছেন। প্রথম প্রকাশিত গল্প—"অরুণ" এম-এ পড়বার সময়। ১৩২৭ সালে "প্রবাসী" গল্প প্রতিযোগিতায় এই প্রথম লেখা গল্পটিই প্রথম স্থান লাভ করে। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস—"রমলা" ১৯২৯-৩০ সালে ধারাবাহিক ভাবে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। জার্মান নাট্যকার আর্থার স্নিতস্লারের দু'খানি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন—"প্রেমের খেলা" (বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৫) "সবুজ কাকাতুয়া" (উত্তরা, কার্তিক ১৩৩৬)।

মনীন্দ্রলালের লেখার বিশেষত্ব এঁর ভাষার শব্দতরঙ্গ-; জল তরঙ্গের মতো উচ্ছাসী। সহজ প্রকাশভঙ্গি, বচনবিন্যাস, ভাষা, ভাব ও কল্পনা, কল্পনা-মাধুর্যে কবিতার মতো বর্ণে ও ছন্দে স্বচ্ছ প্রবাহিণী। সাহিত্যসৃজনে কবিতা রচনা না ক'রেও ইনি কবি। এঁর লেখা : ছোটগল্প—মায়াপুরী ১৩৩০, সোনার হরিণ ১৩৩১, রক্ত কমল ১৩৩১। উপন্যাস—স্বপ্ন ১৩৩১, ছেলেদের উপন্যাস—অজয়কুমার ১৩৩৯। ছোটগল্প—কল্পলতা ১৩৪১। ছেলেদের ছোটগল্প—সোণারকাঠি ১৩৪১। উপন্যাস—জীবনায়ন ১৩৪৩, ঋতুপর্ণ ১৩৪৪।

ভেরনল

উত্তর-ভারতের নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে নৈনিতালে এসেছি। নভেম্বরের শেষে নৈনিতাল প্রায় জনহীন। আমাদের হোটেলের দোতালায় আমি আর একজন বাঙ্গালী প্রৌঢ় ডাক্তার, দু'জন আছি। হোটেলটি পাহাড়ের মাথায় বনের ধারে নীচে নীল হ্রদ পাহাড়-ঘেরা, কখনো মরকতমণির মত ঝকমক করে, কখনো গলিত পোখরাজের মত। রৌদ্রতপ্ত সুনির্মল দিন, জ্যোৎস্নাময় সুশীতল পাণ্ডুর রাত্রি, চারিদিকে অপূর্ব নিস্তব্ধতা।

সমস্ত দিন হ্রদটি চিত্রিত দর্পণের মত স্থির ছিল, রঙিন বাংলোর সারি, সবুজ বন, নীলাকাশ, মেঘের স্তূপ, তার ওপর নানা রূপ ও বর্ণের প্রতিবিম্ব। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিমাকাশে মেঘপুঞ্জে রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি, দিগ্বধূরা হোলিখেলায় মেতে উঠল, হ্রদ সুবর্ণবর্ণ। তারপর পাইন-বনের পিছনে চাঁদ উঠল, পাহাড়ের তলায় ঘন অন্ধকারময় হ্রদ রহস্যময়ী নারীর কালো চোখের মত।

ডিনার খেয়ে যখন ঘরের সামনে কাচ-ঘেরা বারান্দায় বসলুম, বিষ্টি পড়ছে, চারিদিক সজল অন্ধকার, দেবদারু-বন আন্দোলিত ক'রে ঝোড়ো বাতাস উঠছে ক্ষুব্ধ ক্রন্দনের মত।

বারান্দায় ব'সে থাকা গেলো না, ঝড়ের জন্য নয়, দাঁতে অসহ্য বেদনা অনুভব করলুম। বাঁ মাড়ির শেষে একটু ব্যথা দু'দিন ধ'রে রয়েছে, সহসা মাঝ রাত্রে ঝড়ের মধ্যে ব্যথা অসহ্য মনে

হ'ল, দাঁতের স্নায়ুগুলি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভয়ংকর যন্ত্রণা! ঘরে ঢুকে দেখলুম, এ্যাস্‌পিরিন্ বা বেদনা-নাশক কোন ওষুধ সঙ্গে নেই। রাত বারোটা হবে, বাইরে ঝড় উঠেছে। ওষুধের জন্য কোথায় যাওয়া যায়?

মনে পড়ল, আমার ঘরের পরে দুটি খালি ঘর, তার পরেরটাতে প্রৌঢ় ডাক্তার সরকার আছেন। তাঁর কাছে নিশ্চয় কোন ওষুধ পাওয়া যাবে। ডাক্তারের সঙ্গে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল। অদ্ভুত মানুষ মনে হয়। তিনি সমস্ত পৃথিবী দু'বার পরিভ্রমণ করেছেন। কোনদিন দেখি, বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে স্তব্ধ ব'সে আকাশে মেঘের লীলা হ্রদে রঙের খেলা দেখছেন, কোনদিন দেখি মোটা চাবুক হাতে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছেন ভীমতালের দিকে। ছ'ফুট লম্বা দীর্ঘ দেহ, সুঠাম, দৃঢ়, বৃদ্ধ শালগাছের মত সব সময়ে ছাই রঙের একটা সুট প'রে, চোখে কালো কাচের চশমা, রেখাংকিত মুখে আরক্তিম ভাব, নাকের ডগায় লাল ছাপ কাঁচকড়ার ফ্রেমের নীচে টক্‌টক্ করে।

দাঁতের যন্ত্রণা অসহনীয় হ'য়ে উঠল। ডাক্তারের ঘরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

করিডরের এক কোণে একটি আলো মৃদু জ্বলছে। ডাক্তারের ঘরের দরজার ওপর তিনটে টোকা দিলুম,—ডাক্তার সরকার!

ভেতর হ'তে উত্তর হ'ল,—আঁজ্ঞে! (দরজা খুলে আসুন)

দরজা ভেজান ছিল, একটু ঠেলতে খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখলুম, স্প্রিং-গদিওয়ালা রেক্সিন-মোড়া লম্বা সেক্তিতে ডাক্তার সরকার অর্ধশয়নভাবে সামনের জানালার দিকে চেয়ে; জানলার কাচের ওপর বৃষ্টি-ঝাড় আছড়ে পড়ছে ক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত। বাহিরে ঝঞ্ঝার আর্তনাদ কিন্তু ঘরের ভেতর অদ্ভুত স্তব্ধতা।

সেক্তির পেছনটা দরজার দিকে, ডাক্তার সরকার আমার প্রবেশ দেখতে পাননি, তিনি ব'লে উঠলেন, আসুন হের্ রোজেনবেয়ার্গ, আপনার প্রতীক্ষা করছিলুম।

হের রোজেনবেয়ার্গ! এ হোটেলে কোন জার্মানকে তো কখনো দেখিনি। চেঁচিয়ে বললুম, আমি—কিছু মনে করবেন না—দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা—

চমকে তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, চশমার কালো কাচ-ঢাকা চোখ দেখা গেল না, কুঞ্চিত কপালের ওপর কালো সাদা চুলগুলি চক্‌চক্ ক'রতে লাগল।

ও, আপনি! কি চাই?

দেখুন, দাঁতে বড় ব্যথা, যদি আপনার কাছে কোন ওষুধ থাকে, আমার এ্যাস্‌পিরিন—

ব্যথা! ভাল, যত ব্যথা পাবেন জীবনকে তত গভীর ভাবে অনুভব করবেন। যার যত বেদনা-বোধ সে তত উচ্চস্তরের জীব।

দেখুন, ডাক্তার যদি দার্শনিক হ'য়ে ওঠেন, রোগীর অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়।

হা! হা! ডাক্তার-দার্শনিক! কোথায় ব্যথা, বলুন?

দাঁতে, এই বাঁ মাড়িতে, স্নায়ুগুলি কে ছিঁড়ে—

থাক, ব্যথার, বর্ণনা ক'রতে হবে না, আমি বুঝেছি। বসুন, বসুন ওই সোফায়। কি লিক্যর আপনি ভালবাসেন, ক্যুমেল, বেনেডিকটিন্—আমার এখানে কয়েক রকম আছে মাত্র।

সামনের ছোট টেবিলে নানা বর্ণ ও আকৃতির বোতল ও ছোট বড় লিক্যর-গ্লাস।

না, আমি কিছু খাই না!

খান না? হা, হা, খেলে দাঁতের ব্যথা হ'ত না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে দেখছি আচ্ছা, দেখি একটা ওষুধ আছে।

ডাক্তার সরকার লেখবার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি ছোট শিশি বের করলেন। শিশি হ'তে দু'টি চ্যাপ্টা বড়ি এক মাঝারি গ্লাসে রাখলেন, তারপর একটা বড় বোতল হ'তে সোনালী তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে দিলেন। গ্লাসটা নেড়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, খেয়ে ফেলুন, একটু হাল্কা বোর্দো দিলুম, ওতে ওষুধের কাজ ভালই হবে, আর আমার ঘরে জল নেই, চাকরটা সন্ধ্যা থেকে পলাতক। ভাবুন ওষুধের অনুপান হচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সের সূর্যালোকপুষ্ট রক্তিম দ্রাক্ষারস।

ব্যথা দূর করবার জন্য তখন কেউ হাতে বিষ দিলেও খেয়ে ফেলতে পারতুম। বড়ি-মিশ্রিত বোর্দো এক চুমুকে খেয়ে ফেললুম।

ডাক্তার সরকার আমার মুখোমুখি বসলেন সেত্তিতে হেলান দিয়ে। ছোট গ্লাস হ'তে এক চুমুক সারক্রুজ খেয়ে বললেন, কেমন মনে হচ্ছে?

বেদনা কম মনে হচ্ছে।

ব্যস, তা হ'লেই হ'ল। বেদনা হয়তো আপনার আগেকার মতই আছে, তবে ওই যে মনে হচ্ছে বেদনা নেই তাহলেই হ'ল। আসল হচ্ছে মনে, আর মন দিয়ে যা অনুভব না করি তাই মিথ্যা। বসুন, গল্প করা যাক, এ ঝড়ের রাতে কি আর এখন ঘুম হবে!

বেশ তো, আপনি একটা গল্প বলুন, আপনার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা, কত দেশ কত রকম মানুষ দেখেছেন, তার ওপর আপনি ডাক্তার, কত রকম রোগী—

ডাক্তারের রোগী দেখা, clinical eye দিয়ে দেখা, সত্যিকার দেখা নয়, যে দেখায় বেদনা নাই, হৃদয়ের ব্যথা নাই, আতংক নাই, সে দেখা সত্যি দেখা নয়।

কিন্তু দেখায় আনন্দও তো থাকতে পারে!

হাঁ, কিন্তু সব গভীর আনন্দানুভূতির সঙ্গে তীব্র বেদনা রয়েছে। শুধু মনের ব্যথা নয়, দেহের ব্যথাকেও যত রকম ভাবে যত নূতন নূতন ক'রে জানতে পারবেন, জীবনকে তত গভীর ভাবে

জানবেন, প্রাণের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছবেন। এই দেহ-মনের বেদনার অভিজ্ঞতায় আমাদের সত্তা গড়ে ওঠে, আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়।

আপনার জীবনে বহু অভিজ্ঞতা আছে মনে হয়।

হাঁ, নব নব অনুভূতিলাভের তৃষ্ণা আমাকে সারা জীবন দিশাহারা করেছে। ডাক্তাররূপে আমাকে দেখতে হয়েছে মানুষের দেহ-মনের ভাঙনের রূপ, তার পরম বেদনার মূর্তি। সেজন্য প্রকৃতির বা মানবসৃষ্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দেখবার জন্য আমি দেশ হ'তে দেশান্তরে ঘুরেছি, দেহের সমস্ত স্নায়ু শিরা উপশিরার রক্তস্রোত দিয়ে প্রাণের গতি উল্লাস আনন্দময় অভিব্যক্তি অনুভব ক'রতে চেয়েছি। এমনি ঝড়ের রাতে আমি সাঁতরে পদ্মাপার হয়েছি, বন্যায় নগর গ্রাম ভেসে যেতে দেখেছি, কারাকোরাম পর্বতের সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে তুষার-নদী পার হ'য়ে কাশ্মীর হ'তে খোটান গেছি, মোটরকারে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করেছি, উগাণ্ডার জঙ্গলে সিংহ মেরেছি। কত অপূর্ব বস্তু কত অপরূপ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠে, শ্রীনগরে ডাল্ হ্রদে রঙিন সন্ধ্যা; শীতের সুইজারল্যাণ্ডে জ্যোৎস্নারাত্রে তুষার-শুভ্রতায় শ্লেজ্ চালান; লিডোতে ভূমধ্যসাগরের সমুদ্র তীরে সূর্যালোক পান, নিউইয়র্কের পঞ্চম এভিনিউর জনতা; জঙ্গল-বেষ্টিত এঙ্কোর-ভাট; বেলজিয়ামের যুদ্ধ-ট্রেঞ্চ; অন্ধকার রাত্রে তাজমহল; প্রয়াগে কুম্ভমেলা; মিসিসিপির ঘন অরণ্য; প্রশান্ত মহাসাগরের উপর এরোপ্লেন। এ সব অভিজ্ঞতা আমার আত্মাকে মুগ্ধ করেছে বটে কিন্তু আমার সত্তার বিকাশ হয়েছে মানব অন্তরের বেদনাময় অনুভূতিতে।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। ঝোড়ো বাতাসে কাচের জানালা ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠল। অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত বিদ্যুৎ চমকে গেল। ঘন নীলপর্দা ঘেরা আলো কেঁপে কেঁপে উঠল।

আমি ধীরে বললুম, আচ্ছা আপনি হের্ রোজেনবেয়ার্গ নামে কার আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন?

ডাক্তার সরকার চমকে সোজা হ'য়ে বসলেন; তাঁর চশমার কাচ চকচক্ ক'রতে লাগল অন্ধকার রাত্রে কালো বাঘের চোখের মত। বোতল থেকে একটু সুরা ঢেলে পান ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

তারপর আমার দিকে চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বললেন, একটা চুরুট ধরান। গল্পটা আপনাকে তাহলে বলি—

মুনসেনে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ ক'রে আমি কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে ডাভোসে এক যক্ষ্মা-স্যানোটোরিয়মে কাজ করি। এমনি নবেম্বর মাসের শেষাশেষি একবার ডাভোস থেকে

প্যারিসে আসি। গরদ্যানির্য়তে যখন নামলুম, রাত এগারটা হবে। কুলিকে জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি, ওভারকোটের ওপর কে থাপ্পড় মারলে—হের ডক্টর!

ফিরে দেখি রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ, আমাদের স্যানাটোরিয়মের একটি রোগী। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে, দেখতে আমার চেয়েও লম্বা, বহুদিন রোগে ভুগে শীর্ণ শুষ্ক মুখ, চোখে একটা তীব্র ক্ষুধিত দৃষ্টি। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির এক হাড়ে যক্ষ্মা, ছ'বছর স্যানাটোরিয়ম বাসের পর প্রায় সেরে গেছে, এখন ক্রাচের (crutch) সাহায্যে বাঁ পা তুলে খট্‌খট্‌ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। লোকটি জাতিতে সুইস, তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন নরওয়ে থেকে। জুরিকের এক ধনী মহাজনের একমাত্র সন্তান।

বিস্মিত হ'য়ে বললুম, আপনি এখানে? পরশু আপনার জ্বর হয়েছিল, আপনার তো স্যানাটোরিয়ম হ'তে বার হওয়া বারণ।

আমি পলাতক, হের ডক্টর। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। আপনি কোন হোটেলে যাচ্ছেন?

ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার এক জানা সস্তা হোটেল আছে, সেখানে ঘর রাখতে লিখেছি।

চলুন, আপনার সঙ্গেই যাব। একা বড় হোটেলে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে না। ছাত্রদের থাকবার হোটেল তো?

পথে ট্যাক্সিতে রোজেনবেয়ার্গ বললেন, তাঁর মাথায় মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাঁর বিশ্বাস তাঁর মস্তিষ্কে ক্যানসার হচ্ছে; জুরিকে এক ডাক্তার নাকি বলেছেন ছোট একটা টিউমার হ'তেও পারে। প্যারিসে বড় ডাক্তার দেখবার জন্য তিনি স্যানাটোরিয়ম থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস, একটা ক্যানসার কোথায়ও হচ্ছে।

কথাটা আমি বিশ্বাস করলুম না। আমার হোটেলে আমার ঘরের কাছেই রোজেনবেয়ার্গের জন্য ঘর ঠিক ক'রে দিলুম। শোবার উদ্যোগ করছি, ট্রেণের সুট বদলে সাজসজ্জা ক'রে রোজেনবেয়ার্গ আমার ঘরে এসে ঢুকলেন, বললেন,—চলুন, একটু বেরোন যাক।

আমি বড় শ্রান্ত।

ছ'বছর পরে প্যারিসে এলুম, এরমধ্যেই শোব! Tender is the night—

আপনি ঘুরে আসুন, আমি কাপড় জামা ছেড়ে ফেলেছি।

সেন-নদীর তীরে একবার ঘুরে আসতে না পারলে রাত্রে ঘুম হবে না। আচ্ছা, বন্‌ নুই!

বিছানাতে শুয়ে শুনতে লাগলুম, হের্‌ রোজেনবেয়ার্গ সরু সিঁড়ির কাঠের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্‌ শব্দ ক'রে দ্রুত নেমে চলেছেন, প্যারিসের পথে আনন্দ লাভের সন্ধানে।

পরদিন সকালে খবর নিয়ে জানলুম, রোজেনবেয়ার্গ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন, রাত তিনটের সময় মত্তাবস্থায় হোটেলে ফিরেছিলেন।

এরপর সাতদিন রোজেনবেয়ার্গের সঙ্গে দেখা হয় নি।

রাত্রে পুচিনির টস্কা দেখে অপেরা-প্রাসাদ হ'তে রাস্তায় বের হয়েছি, ওভারকোটের

ওপর এক থাপ্পড় মেরে কে বললে—হের্ ডক্টর! পিছন ফিরে দেখি, রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ!

হের্ ডক্টর, কেমন লাগলো অপেরা?

চমৎকার।

চলুন, কাছে ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ আমার জানা আছে, চমৎকার মোজেল মদ রাখে। ১৯১৩ সালের যুদ্ধের ঠিক আগের বছরের মোজেল মদ, না এলে আমি সত্যই দুঃখিত হব।

অপেরার সংগীত লহরী শ্রবণে অন্তর তখন উল্লসিত। শালিয়াপেনের সুরদীপ্ত মহান কণ্ঠধ্বনি কানে বাজছে। বললুম, চলুন আজ রাত্রে একটু হল্লা করা যাক।

রেস্তোরাঁতে কিছু খেয়ে আমরা অপেরার কাছে এক কাফেতে এসে বসলুম। পথের ফুটপাথের অর্ধেক জুড়ে টেবিল চেয়ারের সারি, পাশ দিয়ে নানা সজ্জার নরনারী স্রোত অবিরাম চলেছে।

রোজেনবেয়ার্গ, প্যারিসের জীবন কেমন উপভোগ করছ? বড় বেদনা, মাথার মধ্যে অসহ্য বেদনা হয়।

পকেট থেকে সে একটি ছোট শিশি বের ক'রে ছোট টেবিলের উপর রাখলে। কিছুক্ষণ পর শিশি থেকে দুটো বড়ি বার ক'রে কফির সঙ্গে খেয়ে ফেললে।

দু'ঘণ্টা অন্তর এই এ্যাস্পিরিন্ খাচ্ছি; না খেলেই যন্ত্রণায় ম'রে যাবো।

কোনও ডাক্তার দেখালে?

দেখালুম বৈকি, ডাক্তার লৈভি বললেন, মাথায় নয় পেটে, লিভারের কাছে টিউমার মনে হচ্ছে, ক্যানসারের পূর্বলক্ষণ হ'তে পারে। তবে আমি জানি ক্যানসার, ও ক্যানসার হবেই। ক্যানসারে আমার মা মরেছেন। ও! সে কি অসহ্য যন্ত্রণা।

সহসা সে থামল। দেখলুম জ্বালাময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের সুসজ্জিতা নারবিলাসি...দের দিকে চেয়ে আছে। তিনটি রূপাজীবা চলেছে শীকারের সন্ধানে। রোজেনবেয়ার্গের চেয়ারের পাশে খাড়া করা ক্রাচ দু'টির দিকে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে তারা চ'লে গেলো। রোজেনবেয়ার্গের শীর্ণ মুখ আরও কালো হ'য়ে উঠল।

বললুম ডাক্তাররা তো নিশ্চিতরূপে কিছু বলছেন না?

নিশ্চিতরূপে কে কি বলতে পারে? অহর্নিশি এই যে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছি! ক্যানসার রোগীকে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরতে আমি দেখেছি, তার সব সিম্‌টম্ আমি জানি। গার্সঁ, আরও দু'গ্লাস। আচ্ছা আপনি ডাক্তার, ক্যানসারের কোন চিকিৎসা আছে?

এখনও পর্যন্ত আমাদের জানা নেই, নানা পরীক্ষা চলছে।

শুধু রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে মরে।

একদিন তো আমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।

ক্যানসারের রোগী যদি আত্মহত্যা করে, তাকে দোষ কি ?

প্রাণ অমূল্য, প্রাণকে আমরা এখনও সৃষ্টি ক'রতে পারিনি, স্বইচ্ছায় তাকে বিনাশ করার অধিকার আছে কি ?

শুধু যন্ত্রণা ভোগের অধিকার আছে। আমি আত্মহত্যা ক'রতে পারি, আমার মা নেই বাবা ছ'মাস হ'ল মারা গেছেন, কিন্তু এক বুড়ী দিদিমা আছেন, তিনি মনে বড় আঘাত পাবেন। গারসঁ, এই নোটটা ভাঙিয়ে আন- দেখি।

কাফের এক খিদমৎগার এগিয়ে আমাদের কাছে এল। রোজেনবেয়ার্গ তার বুকের পকেট থেকে এক মোটা মনিব্যাগ বের ক'রলে, নানা রঙের নোটে ভরা। নোটের তাড়া থেকে একখানি একহাজার ফরাসী ফ্র্যাঙ্কের নোট বের ক'রে গারসঁর হাতে দিলে। তারপর মনিব্যাগটা খুলেই টেবিলের ওপর রাখলে। শুধু কাফের নয়, রাস্তার লোকেও দেখতে পেলে নোটভরা মনিব্যাগ টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে !

ব্যাগটা তুলে রাখ, রিচার্ড।

হুঁ ! এ ব্যাগে মার্ক-ফ্র্যাঙ্ক-পাউণ্ড-ডলারে ত্রিশ হাজার ফরাসী ফ্রাঙ্কের বেশি আছে।

রোজেনবেয়ার্গ কথাগুলি এত উচ্চস্বরে বল্‌ল যে রাস্তার লোকও শুনতে পেলে। কাফের লোকেরা আমাদের টেবিলের দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল।

আস্তে, এত চেঁচামেচি করছ কেন। ব্যাগটা পকেটে রাখ। এত টাকা পকেটে নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় এ রকম ভাবে ঘোরার মানে কি ?

হুঁ, মানে কি ? বেশ বলেছ ডক্টর, আচ্ছা তোমাকে ধাঁধা দেওয়া যাচ্ছে, উত্তর দাও ; একটা লোক ত্রিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক পকেটে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেন ? হা হা, জীবনটা একটা গোলকধাঁধা নয় কি ? একবার প্রবেশ ক'রলে সব সময়ে তা থেকে বের হবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দেখ, এর চেয়ে কম টাকার জন্য প্যারিসের পথে লোক খুন হয়েছে।

বা, বেশ বলেছ ! শোন ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল, ভালই হ'ল আমার যে রকম শরীরের অবস্থা, যে কোন সময়ে কিছু ঘটিতে পারে, আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, দেখ আমি এখন লক্ষপতি, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি এক ক্যানসার রিসার্চ হাসপাতালে দিয়ে যেতে চাই, আমার একটা উইল আছে, স্যানাটোরিয়মে আমার ঘরে নয়, এক জায়গায় লুকোনো আছে, সেটা তোমায় ব'লে যেতে চাই—

সহসা রোজেনবেয়ার্গ চুপ ক'রে পথের দিকে চাইলে। আমাদের কাছ দিয়েই একটি যুবক ও যুবতী যাচ্ছিল, যুবকটি কদাকার ভীম প্রকৃতির দেখতে, প্যারিসের গুণ্ডাদলের মনে হয়, যুবতী কিন্তু পরমাসুন্দরী, সদ্যপ্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত স্নিগ্ধ লীলায়িত মূর্তি !

রোজেনবেয়ার্গ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে ডাকলে,—মাদলেন ! মেয়েটি হেসে এগিয়ে

এল, আমাদের টেবিলে আমাদের দু'জনের মাঝে চেয়ারে এসে ব'সল। যুবকটি কিন্তু কোথায় স'রে পড়ল।

এ্যালো মাদলেন! কি খাবে?

চল এক রেস্তোরাঁতে যাওয়া যাক; সন্ধ্যে থেকে খাইনি, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

মাদলেনের দুই চোখে কৌতুকময় হাসি, রোজেনবেয়ার্গ তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে। ধীরে সে বল্‌লে, আমরা এই খেয়ে এলুম, এই নাও কাল সকালে খেও।

রোজেনবেয়ার্গ আবার ব্যাগ বের ক'রে মাদলেনের হাতে একখানা পাঁচ'শ ফ্র্যাঙ্কের নোট দিলে। ব্যাগে নোটের তাড়া রাস্তার লোক শুদ্ধ দেখতে পেলে। মাদলেনের নয়ন দু'টি বিদ্যুৎপর্ণা।

আমি বল্‌লুম্, অনেক রাত হয়েছে এবার যাওয়া যাক।

আমরাও যাব, চলো মাদলেন।

ট্যাক্সিতে মেয়েটি ব'সল আমাদের দু'জনের মাঝখানে। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলুম, *রোজেনবেয়ার্গ অনর্গল ব'কে যেতে লাগল।*

দেখ ডাক্তার, আজকাল রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না। আচ্ছা, কোন ভাল ঘুমের ওষুধ তোমার জানা আছে? তুমি দিতে চাও না, বুঝতে পারছি।

মেয়েটি হেসে ব'লে উঠল, আমি জানি।

আবেগের সঙ্গে রোজেনবেয়ার্গ বল্‌লে, কি?

মেয়েটি উচ্চ হেসে বল্‌লে, সে ব'লব না।

তারপর সমস্ত পথ রোজেনবেয়ার্গ আমার সঙ্গে ভেরনলের গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে ক'রতে এল,—সে তিন থেকে চার ট্যাবলেট খায়; ক'টা ট্যাবলেট খেলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা, ডাভোসে কে কবে ভুলে বেশি ভেরনল খেয়ে মরেছে, ইত্যাদি।

হোটেলে ঢুকে রোজেনবেয়ার্গকে একটু আড়ালে ডেকে বল্‌লুম,—মেয়েটি কে? সে অবাক হ'য়ে বল্‌লে, কে? আমি কি ওকে জানি? ওকে আমি চিনি না। বিস্মিত হ'য়ে বললুম, তা হ'লে তুমি ওকে জান না! তোমার সঙ্গে এত টাকা রয়েছে, ব্যাগটা না হয়— দেখলুম, আমাদের ট্যাক্সির পেছনে আর একটা মোটরকার আসছিল।

রোজেনবেয়ার্গের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল।

হের ডক্টর, এই পৃথিবীতে আমরা কে কাকে জানি?

মেয়েটিকে নিয়ে রোজেনবেয়ার্গ তার ঘরে গেল। আমি আমার ঘরে গিয়ে কোচে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়লুম; বাইরে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, শূন্য কালো গলিতে বাতাস বইছে ক্ষ্যাপা কুকুরের অবিশ্রান্ত আর্তনাদের মত; সমস্ত হোটেল নিঝুম নিদ্রিত।

এ রাত্রে ঘুমোবার আশা নেই। ফায়ার প্লেসের উপর অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন ঘড়িটা শূন্য ভাবে চেয়ে রইল। মোপাসাঁর একটি গল্পের বই নিয়ে পড়তে বসলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না, জানালার সার্সির ঝন্ ঝন্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঝড় উঠেছে, তার সঙ্গে মৃদু তুষারপাত।

বাহিরে উন্মত্তা প্রকৃতি, গর্জমান অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিকিমিকি; কিন্তু হোটেল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ।

চমকে উঠলুম, রোজেনবেয়ার্গের ঘরে কি হয়েছে কে জানে? মেয়েটি নিশ্চয় কাজ শেষ ক'রে চ'লে গেছে। পাশে স্নানের ঘরে জলের কল ভাল ক'রে বন্ধ হয়নি, জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ ক'রে পড়ছে।

মনে হ'ল, কে যেন আমায় ডাকছে, ডক্টর, হের ডক্টর! কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে অন্ধকার করিডর পার হ'য়ে সে আহ্বান আসছে।

ধীরে উঠে ঘরের দরজা খুললুম, অন্ধকার করিডর, রোজেনবেয়ার্গের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করা, সেই ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা পথের তমিস্রপুঞ্জে এসে পড়েছে। আলোর রেখা দেখে মনে সাহস হ'ল।

চকিতপদে করিডর পার হ'য়ে রোজেনবেয়ার্গের ঘরে প্রবেশ করলুম। স্তব্ধ ঘর, রোজেনবেয়ার্গ বিছানাতে চাদরের ওপর স্থির হ'য়ে শুয়ে আছে। স্যুট ছেড়ে রাতের পোষাকও পরেনি। অতি স্থির শুয়ে, চোখে অচঞ্চল দৃষ্টি; পাশে ছোট মার্বেল টেবিলে ভেরনলের শূন্য শিশি, দু'টি খালি বোতল ও খালি গেলাস। মেয়েটি কোথায়ও নেই।

ডাকলুম,—রোজেনবেয়ার্গ! রিচার্ড!

কোন সাড়া নেই। কোথায় একটা খট্‌খট্ শব্দ হ'ল। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, তুষার-শীতল। হাত ধ'রে নাড়ী দেখলুম, কোন স্পন্দন নেই। জামা খুলে বুকের ওপর কান চেপে শুনতে চেষ্টা করলুম, বুকের ধুকধুকানি একটু আছে কিনা। চিরদিনের মত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেছে। বাহিরে ঝোড়ো বাতাস গর্জন করছে!

বুঝলুম আমার আর কিছু করবার নেই। ধীরে চোখ দু'টি বন্ধ ক'রে, গায়ের ওপর একটি চাদর ঢাকা দিয়ে দিলুম।

নিজের ঘরে পরিশ্রান্ত হ'য়ে সোফায় ব'সতে শীতের রাত্রে গায়ে ঘাম দিল।

আবার মনে হ'ল, কে আমায় ডাকছে, ডক্টর! হের ডক্টর! অন্ধকার করিডর পার হ'য়ে কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে সে ডাক আমার সমস্ত ঘর ধোঁয়ার মত ভ'রে তুলেছে। একটা সিগারেট ধরালুম, একটা জানালা খুলে দিলুম, যদি বাইরের ঝোড়ো বাতাসের গর্জনে ঘরের এ ডাক ডুবে যায়।

আহ্বান অতি মৃদু ছিল, তীব্র উচ্চ হ'য়ে উঠল। শুধু আমার নাম ডাকা নয়, একটা

খট্‌খট্‌ শব্দ। সিঁড়ির কাঠের ধাপের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্‌ শব্দ। সুষুপ্ত হোটেলের স্তব্ধতা কেঁপে উঠেছে।

ক্রাচের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সারি পার হ'য়ে অন্ধকার করিডর অতিক্রম ক'রে আমার ঘরের সম্মুখে এসে থামল, ঘরের দরজার ওপর তিনটে টোকা প'ড়ল—হের্ ডক্টর!

তখন আতংকে মূর্ছা যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আমি আতংক-রস অনুভব ক'রতে চেষ্টা করছিলুম। রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা দেখতে আমি প্রস্তুত।

বললুম—আঁত্রে!

ধীরে দরজা খুলে গেল। অন্ধকার পটভূমিতে ছবির মত রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের মূর্তি ফুটে উঠল, মোটা কালো ওভারকোট পরা, মাথায় ধূসর টুপি, দুই বগলে লম্বা ক্রাচ! [illegible]খর ওপর ঘরের আলো প'ড়ে কাচের মত চক্‌চক্‌ করছে। চোখে ক্ষুধিত তীব্র দৃষ্টি নেই, [illegible] শ্রান্ত ঝিমানো ভাব।

যেন বেতার-যন্ত্র হ'তে কথাগুলি কানে এল,—হের ডক্টর, আমি বাইরে যা[illegible] উইলের কথা ব'লতে এলুম, উইলটা আছে আমাদের স্যানাটোরিয়মে, ফ্রাউ মায়ারের ঘরে[illegible] টেবিলের তৃতীয় ড্রয়ারে। আচ্ছা, বন্‌সুই, অনেক দূর যেতে হবে।

মূর্তি মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলুম। খট্‌খট্‌ শব্দ দূর [illegible]'তে চ'লে যাচ্ছে।

এতক্ষণে গা শিরশির্‌ ক'রে উঠল। হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে, নিজের বুকের ধুকধুকানি শুনতে পাচ্ছি। দু'ঘরের পরে রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ!

সহসা করিডরে কে আলো জ্বাললে, চোখ ঝলসে উঠল। সিঁড়িতে যুবকদলের হাস্য, যুবতীদের চঞ্চল পদধ্বনি। একদল চৈনিক ছাত্র-ছাত্রী হাস্যে গল্পে সিঁড়ি মুখর ক'রে উঠছে। রাত দু'টোর আগে তারা সাধারণত ফেরে না।

ছাত্রের দল যে যার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। আমিও আমার ঘরের দরজায় চাবি দিলুম। হোটেল আবার সুপ্ত স্তব্ধ।

ঝড় থেমেছে, নিঃশব্দ শুভ্র তুষার পতন হচ্ছে, যেন কে দোলন-চাঁপা ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। খোলা জানালার কাছে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলুম প্রভাতের আলোর আশায়।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। আমি নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলুম। বাইরে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে, মৃদু জ্যোৎস্নায় আকাশ থম্‌ থম্‌ করছে।

ধীরে উঠে দাঁড়ালুম।

ডাক্তার সরকার ব'লে উঠলেন, মিস্টার ঘোষ, আজ রাত্রেও আমার ঘুম হবে না দেখছি। এখন রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না।

কথাগুলি শুনে কোন অজানা ভয়ে চমকে উঠলুম। এ যেন ডাক্তার সরকারের কণ্ঠস্বর নয়।

দেখুন তো ওই খানে একটা শিশি আছে, হ্যাঁ—ওই হলদে শিশিটা। আমি আর উঠতে পারছি না। পায় কেমন ব্যথা হয়েছে। কয়েকটা ট্যাবলেট শিশি থেকে এই-গেলাসে রাখুন।

ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, ক'টা?

ক'টা? ও, এই পাঁচ ছ'টা। ওতে কিছু হবে না আমার। ওর কমে ঘুম হয় না। আপনি হয়তো ছ'টা খেলে—

মন্ত্রচালিতের মত ছ'টা ট্যাবলেট্ ডাক্তার সরকারকে দিলুম। তিনি এক চুমুকে সবটা খেয়ে বললেন—একটু বসুন। তারপর চোখ বুজে সেত্তিতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। পা যেন নাড়তে পারছি না। ঘরে স্তব্ধতা পাথরের মত ভারী; জানালার কাচ ঝকঝক করছে অবগুণ্ঠিতা নারীর ভীতিব্যাকুল দৃষ্টির ম

কতক্ষণ বসেছিলুম জানি না। কালের স্রোত যে ব'য়ে চলেছে, সে ভূতি হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মনে হ'ল খট্‌খট্ শব্দ আসছে, কাঠের মেজের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্ শব্দ সে শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার ঘরের পাশ দিয়ে বারান্দা পার হ'য়ে ঘরের সামনে এসে ল, দরজার ওপর তিনটে টোকা, টক্ টক্ টক্

ভয়ে শিউরে উঠলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম—ডাক্তার সরকার! কোন সাড়া নেই।

প্রাণপণে চেঁচালুম—ডাক্তার সরকার! ডাক্তার!

নিঃসাড়, স্পন্দহীন দেহ।

ডাক্তার সরকারের হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিলুম বরফের মত কন্‌কনে হাত, নাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল না।

নাকের কাছে হাত রাখলুম, বুকের উপর কান দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলুম, নিশ্চল, হৃদপিণ্ড, দেহে রক্ত চলাচল নেই।

ডাক্তার সরকার মৃত? হয়তো ভেরনলের মাত্রা আমি অধিক দিয়েছি, বিবর্ণ মুখ সাদা মুখোসের মত।

আতংকে বিহ্বল দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালুম। দরজার ওধারে রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা, আর এধারে ডাক্তার সরকারের মৃতদেহ।

কালো চশমার কাচের পেছনে চোখ দুটো নড়ে উঠল। শিউরে উঠলুম।

ডাক্তার সরকার ব'লে উঠলেন, কি মিস্টার ঘোষ ! আবার দাঁতের ব্যথা হচ্ছে নাকি ?

না।

তবে ভয়ে পেয়েছেন। না আমি মরিনি, অত সহজে মৃত্যু হয় না।

আমার মনে হচ্ছিল—

হুঁ, সে রাত্রে প্যারিসের হোটেলে কি রকম আতংক অনুভব করেছিলুম তার কিছু আভাস পেলেন বোধ হয়।

আপনি চমৎকার অভিনেতা দেখছি।

অভিনয় ক'রতে পারি ব'লেই তো এতদিন বেঁচে আছি। আচ্ছা আপনি শুতে যান, আজ রাত্রে আর রোজেনবেয়ার্গ এল না। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুতে যান। একটু খেয়ে যান, ভাল ঘুম হবে। শুনুন, গল্পের শেষটুকু আপনাকে বলা হয় নি। পরদিন সকা[illegible] কিন্তু রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ হোটেলের ঘরে পাওয়া গেল না। দু'দিন পরে সে[illegible]র জলে মৃতদেহ পাওয়া গেল। লোকে বলে গুণ্ডারা রাতারাতি মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেছল। কিন্তু আমার থিওরি হচ্ছে মাদলেন ওকে মারেনি। আপনার কি মনে হয় ?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চ'লে এলুম। ঘরে এসে খোলা জানালার পাশে বসলুম। হ্রদের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

ভাবতে লাগলুম, ডাক্তার সরকার কি উন্মাদ, না বানিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ !

পৃথিবী কাদের ?

ও

প্রেতিনী

মনোজ বসু

মনোজ বসু—জন্ম ১৩০৮ যশোহর জেলার ডোঙ্গাঘাটা গ্রামে। শিক্ষা বাগের হাট ও কলকাতায়। বাল্যজীবন কেটেছে গ্রামে। বাড়ির সামনে দিগন্ত বিসারী বিল। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় তার নব নব রূপ……কত বিস্ময়, কত বিচিত্র কাহিনী ঘিরে এঁর অনেক গল্পে ঐ বিল রূপায়িত হয়েছে।

মনোজ বসুর সাহিত্যিক জীবন বেশিদিনের নয়; বোধ হয় বছর ছয় সাত আগে "বাঘ" ও "নূতন মানুষ" প্রবাসী ও বিচিত্রায় প্রায় একই সময় প্রকাশিত হয়। এই প্রথম লেখাতেই ইনি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই ছোট গল্পের লেখক হিসেবে সুপরিচিত হন। আধুনিক যুগে এ[illegible] সৌভাগ্য খুব কম লেখকেরই হয়েছে। এঁর শব্দের জা[illegible]র করা মুস্কিল। অনেক শব্দে লিরিকের মনোরম সুর রণিত হচ্ছে, তাতে মনে হয় লেখক কবিধর্মী; আবার আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বহারা তাদের কথা বলতে গিয়ে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে কাব্যবিলাসের ওপর নির্মম খড়্গাঘাত করেছেন। কান্নার ছবি ও হাসির ছবি সমান নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন। সংগ্রাম বহুল বর্তমান, স্বপ্নসুন্দর অতীত ও রহস্যগভীর ইন্দ্রিয়াতীত অশরীরী জগৎ—সবই এঁর লেখায় অল্পবিস্তর মূর্তি পেয়েছে। এঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমিকা—বাংলার পল্লী। বর্তমানে আছেন কলকাতায়, সাউথ-সুবার্বন স্কুলের শিক্ষক। আজ অবধি এঁর যত গল্প বেরিয়েছে, তার সমষ্টি বোধহয় পঞ্চাশটিও হবে না। গল্পের বই মাত্র তিনটি—বনমর্মর, নরবাঁধ, দেবী কিশোরী।

পৃথিবী কাদের ?

একেবারে উঠানের উপরে বীজতলা ; সেইখানে ধান বুনেছে। নূতন বর্ষায় ধানচারার রং হয়েছে মেঘের মত কালো। নটবর লাঙল নিয়ে ক্ষেতে যাবার সময় দেখে, ক্ষেত থেকে ফিরে এসে দেখে ; রাত্রিবেলা একঘুমের পর তামাক সেজে যখন দাওয়ায় বসে, তখনও ঐ বীজতলার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

এরই মধ্যে একদিন সর্দি ক'রে একটু জ্বর হয়েছে সৌদামিনীর। আর যাবে কোথায় নটবর বলে—হুঁ হুঁ—বুঝতে পেরেছি ! ঘর তো নয়- এ হয়েছে যেন তেঁতুলতলা ! বাইরের বৃষ্টি বন্ধ, হয় তেঁতুলতলার বৃষ্টি থামে না। রোসো—

ক্রোশ পাঁচেক দূরে ভদ্রার ওপারে পিশ-শ্বশুরের বাড়ি ; তাদের অবস্থা ভাল। নটবর ছুটল সেখানে। বলে—তিন কাহন খড় দিতে হবে গো, পিশেমশাই। মেয়ে তোমাদের নবাবনন্দিনী। গায়ে ফোঁটা দুই জল লেগেছে,—সেই থেকে বিছানা নিয়েছেন—

পিশে একটুখানি ইতস্তত ক'রতে নটবর বল্‌ল—ডরাচ্ছ কেন গো ? চারটে মাস দেরি কর—তোমার ঐ তিন কাহনের জায়গায় আর এক কাহনের বেশি দাম ধ'রে দেব। জমিদার এবার লকগেট ক'রে দিয়েছে, আমার বাইশ বিঘে জমিতে সোনা ফলবে। আর কিছু কেয়ার করি ?

ক্ষেতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নটবর মটকায় উঠে ঘর ছায়। নিচে থেকে সৌদামিনী খড়ের আটি ছুড়ে দেয়। খড় সে অবধি বড় পৌঁছায় না, নটবরের কাছেও যায় না, গড়িয়ে আবার নিচে

পড়ে। নটবর বলে—এই তোর হাতের ঠিক ? কোন কামের নস্ রে বউ, তোরা পারিস কেবল বেগুন কুটতে। তাক ক'রে ফেল্ দিকি—

খুব মনোযোগের সঙ্গে বউ তাক করে ; খড় পড়ে এবার চালের উপর নয়,—নটবরের পিঠের উপর।—উহু—হুঃ,...এই ?

বউ হেসে গড়িয়ে পড়ে। নটবরের ইচ্ছা করে, নেমে এসে ঐ পাগলীকে ধাক্কা মেরে জলকাদার মধ্যে ফেলে দেয়। সেখানে গড়িয়ে গড়িয়ে হাস্থক—যত পারে হাস্থক—

নূতন ছাউনিতে ঘরখানা ঝকমক করে। নটবর দাওয়ায় শোয়। রাতের বাতাসে কচি কচি ধানচারার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পায়। লাল ভেরেণ্ডা ঘেরা উঠানের ফালির মধ্যে গাদাগাদি হ'য়ে তারা আর থাকতে চাইছে না, সীমাহীন বিলে যাবার জন্য অধীর হয়েছে। আপন মনে মাথা নেড়ে হাসিমুখে নটবর বলতে থাকে—সবুর, সবুর—মাটি ভেঙে তোদের জন্য গদি তৈরি হচ্ছে। হ'য়ে যাক—সব্বাইকে নিয়ে যাব—সবুর—

এক-একদিন ঘুমের ঘোরে নটবর চমকে ওঠে, মাঝরাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঝড়ো বাতাসে জলের ছাট সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি স'রে সে আগুনের মালসার কাছে বসে। ভুড়ভুড় ক'রে হুঁকো টানে আর ভাবে—সকালটা হ'লে হয়, উঃ কত রাত্রি এখনও !

বিছানাটা বেড়ার দিকে টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ঘুমোবার জো আছে ! তখনই ধড়মড় ক'রে ওঠে। ফরসা তো প্রায় হ'য়েই গেছে। জোরে জোরে সে দরজা ঝাঁকায়। —ওঠ, শিগগির ওঠ,—ও বউ, ঘরে ঘুমুচ্ছিস নাকি ? উঠে বোঁদাটা ধরিয়ে দে না এট্টু—

চোখ মুছতে মুছতে সৌদামিনী দরজা খুলল। নটবর ততক্ষণে গোয়াল থেকে বলদ বের করেছে, লাঙল কাঁদে নিয়েছে। সৌদামিনী বলে—কি ভূত চাপল তোমার ঘাড়ে—দুই চোখ এক ক'রতে পার না। রাত যে এখনো এক প'র বাকি—

হুঁঃ, রাত না হাতি ! আকাশের দিকে চেয়ে নটবর কিন্তু একটু বেকুব হ'য়ে গেল। রাত পোহায় নি সত্যি ; চাঁদ জ্বল-জ্বল করছে ; মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না দিনের মত লাগছে। নটবর বলল—কি বৃষ্টিটা হ'য়ে গেল ! কিচ্ছু তো জানলি নে বউ, তুই তখন নাক ডাকছিলি। আমার ধানচারা আজ এক বিঘত বেড়ে গেছে—

নালা দিয়ে কলকল শব্দে জল বেরুচ্ছে। নটবর হাল-গরু নিয়ে মাঠে নামল। সখ ক'রে বলদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা হয়েছে, ঘণ্টার ঠুন-ঠুন শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। কাদায় ভর্তি উঠান পেরিয়ে ভেরেণ্ডার বেড়ার ধারে সৌদামিনী কতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল—বেশ হয়েছে, আর শোব না, কাজ-কর্মগুলো এইবার সেরে রাখি—। গোবর-মাটি দেওয়া হল, ঘরদোর ঝাঁট হ'য়ে গেল, রাত আর পোহাতে চায় না। তার কেমন ভয় ভয় ক'রতে লাগল—

মানুষটি কি রকম হ'য়ে গেছে—ক্ষেত আর ক্ষেত! রাত-বিরেতে একলা একটি প্রাণী বেরিয়ে যায়, কত রকম দোষ-দৃষ্টি পড়তে পারে, বুনো শূয়োর কি সাপ—

সাপের কথা মনে হ'তে সৌদামিনী শিউরে ওঠে,—আস্তিকস্য মুনের্মাতা...হে মা মনসা, রক্ষা করো।

ঐ ধানক্ষেতের উপরেই সাপের কামড়ে নটবরের বাপ মারা গিয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা, আবাদের জঙ্গল সাফ হচ্ছে,...সৌদামিনী এ বাড়িতে আসেনি, নটবর তখন এক ফোঁটা শিশু। সেই সব কাহিনী নটবর যখন বলে, সৌদামিনীর চোখে জল এসে যায়।

এরই মধ্যে একদিন রান্নাঘরে ব'সে সৌদামিনী ক্ষেতে পান্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল, এমন সময় ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল, ডুম-ডুম-ডুম। তাড়াতাড়ি সে বাইরে এল। বাজনা আসছে মাঠের দিক থেকে। রোদ ওঠেনি ভাল ক'রে, এমন সময় ঢোলের বাজনা...বিয়ে ক'রতে যাবার সময় এ নয়,—তা হ'লে বিয়ের পর বর-কনে ফিরে চলেছে ঠিক।

মাঠের দক্ষিণে বাঁধাল, সেইখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা গিয়েছে ভোমরার ভদ্রপাড়ার দিকে। সৌদামিনী দৃষ্টি বিসারিত ক'রে সেই দিকে তাকাল। বিস্তর লোক সেখানে—চারো, দোয়াড়ি, ঘুণি পেতে নানা উপায়ে মাছ ধরা হচ্ছে। বর-কনের কোন পালকি কিন্তু নজরে এল না।

লাঙল-গরু নিয়ে একটু পরেই নটবর ফিরে আসছে।

—এ কি? এরই মধ্যে যে!

নটবর ম্লান হেসে বল্‌ল—কিছু না; ব্যস্ত হ'সনে বউ—একটা মাদুর দে দিকি—

—কি হয়েছে, বল না তুমি। বলদদু'টোর দড়ি নিজের হাতে নিয়ে সৌদামিনী কাতর-চোখে চাইল।

নটবর বল্‌ল—বড্ড মাথা ধরেছে, ক্ষেতে আর দাঁড়াতে পারলাম না।

দাঁড়াবার জো ছিল না সত্য। সৌদামিনী বিছানা ক'রে দিল, নটবর শুয়ে প'ড়ে সেই যে চোখ বুজল, সমস্তটা দিনের মধ্যে আর উঠল না—খেলও না। সৌদামিনী বারম্বার গায়ে হাত দিয়ে দেখে, গায়ে কিন্তু জ্বর নেই।

আরও ক'দিন কাটল এই রকম। নটবরের কি যে অসুখ, সব সময়ে শুয়ে শুয়ে থাকে। ক্ষেতে ওদিকে বড় গোল লেগেছে—প্রিয়নাথ, মদন, কাসেম আলি ওরা সব সকাল-সন্ধ্যা, দু'বেলা চাষ জুড়েছে। ক'দিনের বৃষ্টিতে ধানচারা আরও বেড়ে গেছে। তারপর আবার একদিন রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে নটবর ডাক্‌তে লাগল—ও বউ, শিগগির ওঠ—উঠে বোঁদাটা ধরিয়ে দে এট্টু।

রাতদুপুরে নটবর ক্ষেতে যায়, ভোর না হ'তে ফিরে আসে। সৌদামিনী আর পারে না, হাত দু'খানা ধ'রে একদিন জিজ্ঞাসা ক'রল—কি হয়েছে তোমার? সত্যি কথাটা বল দিকি—

—কিছু না; কিছু না—নটবর কথাটা উড়িয়ে দেয়। —রোদ লাগলে মাথা ধরে যে! রাতারাতি না চষে উপায় কি?

সন্ধ্যার পর সৌদামিনী ভাত বেড়ে সামনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসেছে। কেরোসিনের ল্যাম্পো জ্বলছে। দু'চার গ্রাস মুখে দিয়ে নটবর ফিক্ ক'রে হেসে উঠল। বলে—বউ একেবারে যে মহামচ্ছব ব্যাপার! রোজ রোজ এ তুই আরম্ভ ক'রলি কি?

ব্যাপার গুরুতর বটে। ডাল এবং শাকের ঘণ্টের উপর খেজুর-গুড়ের পায়েস দিয়েছে। সৌদামিনী গাই দুইতে পারে ভাল। হরি চাটুজ্জের বেয়াড়া গরু কেউ সামলাতে পারে না, আজ সৌদামিনী দুয়ে দিয়ে এসেছে। সেখান থেকে দুধ পেয়েছে এবং দুধ যখন পাওয়া গেল—ঘরে তো গুড় রয়েছে—আগুনে একটু সিদ্ধ করা বই তো নয়! কিন্তু এত সব কৈফিয়ৎ দেবার মেয়ে সৌদামিনী নয়। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—দেখ, মানা ক'রে দিচ্ছি, আমি গিন্নি, আমার ঘর-সংসার। তুমি কেন আমার সংসারের কুচ্ছো ক'রবে?

হাসতে হাসতে নটবর বলে—আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলছি নে। কিন্তু বউ আলোটা নিভিয়ে দে। মাছ নেই যে কাঁটা বেছে খেতে হবে। এত রোসনাই ক'রলে লাটসাহেবও যে ফতুর হ'য়ে যায়!

সৌদামিনী তাড়া দিয়ে ওঠে—আবার!

হতাশ স্বরে নটবর বলে—বেশ, কিন্তু আবার যে কাল বল্‌বি একটা পয়সার কেরোসিন—

কাল বল্‌ব না, পরশুও না। তুমি চুপ কর দিকি। অত বকবক ক'রলে খেয়ে কখনো পেট ভরে।

বাঁশ বাগানের ফাঁক দিয়ে উঠানে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না পড়েছে। নটবর এক এক গ্রাস খায় আর ভাবে, না—মেয়েমানুষের মত বেহিসাবী জাত আর নেই। এই তো চাঁদের আলো পড়েছে, কি দরকার ছিল কেরোসিন পুড়িয়ে নবাবি করবার!

হঠাৎ কুকুর ডেকে উঠল। নটবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চাইল। সৌদামিনী বলে—কিছু না, তুমি খাও—

হাত গালে ওঠে না। সৌদামিনী বল্‌ল—ওকি, উঠছ যে! শেয়াল-টেয়াল কি হয় তো যাচ্ছিল। তুমি বসো, আমি দেখে আসছি—

ল্যাম্পোর কেরোসিন অকারণে ব্যয় হ'তে লাগল—লাটসাহেবের অপব্যয়! কিন্তু নটবরের সেদিকে দৃষ্টি নেই। দূরের অন্ধকারে সুঁড়িপথের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

—ফুঃ ফুঃ—আলো নিভিয়ে এক ঝটকায় সৌদামিনীর হাত ছাড়িয়ে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কাছারির মাণিক বরকন্দাজ উঠানে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক উঁকি মেরে সে ব'লে উঠল—কোথায় গো?

—বাড়ি নেই—

—ভেগেছে ?

পিঁড়ি টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে মাণিক দাওয়ায় উঠে ব'সল; আপন মনে বকাবকি করে—আঁধারে ভূতের মত এসেও দেখা পাবার জো নেই···মানুষ কম শয়তান হয়েছে আজকাল!

আবার বলে—আলো জ্বালো না গো, ভাল মানুষের মেয়ে···এই তো জ্বলছিল এতক্ষণ।

আলো জ্বেলে দিয়ে সৌদামিনী নিরুত্তরে রান্নাঘরের দিকে চল্ল। মাণিক হি-হি ক'রে হেসে উঠল। —তা নটবরের দিনকাল যাচ্ছে ভাল; পিঠে-পায়েস যেন যজ্ঞির বাড়ি। শোনো গো লজ্জাবতী ঠাকরুণ, নতুন হাঁড়ি নিয়ে এস—আর চাল-ডাল কাঠকুটো—

সৌদামিনী ফিরে দাঁড়াল। মাণিক বলে, রান্না-খাওয়া আজকে এইখানে হবে। তারপর একটা মাদুর দিও, পড়ে থাকব। হুজুরের সাক্ষাৎ তো সহজে মিলবে না—

গোবরমাটি দিয়ে পরম যত্নে নিকানো দাওয়া—সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বলা নেই, কওয়া নেই—খন্তা এনে মাণিক নির্মমভাবে দাওয়া খুঁড়তে লাগল। সৌদামিনীর পাঁজরে সেই খন্তার কোপ পড়েছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রল—কি হচ্ছে ?

—উনুন খুঁড়ছি। তুমি আর দাঁড়িও না মা, সিধের উয্যুগ করগে—

ঘরের পিছনে বাঁশতলায় বড় উনুন। শীতকালে খেজুর রস জ্বাল দেওয়া হয়; এখন ঝরা বাঁশের পাতায় প্রায় ভর্তি হ'য়ে আছে। চারিদিকে আশশ্যাওড়া ও ভাটের জঙ্গল; উনুন ব'লে আর ধরবার জো নেই। সৌদামিনী নিচু হ'য়ে দু'হাতে বাঁশের পাতার স্তূপ তুলতে লাগল।

—বলি, বেঁচে আছ না সাপ-খোপে দয়া করেছে ?

সাড়া পাওয়া যায় না।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সৌদামিনী বল্ল—উঠে এস বলছি। তুমি চোর না ডাকাত যে উনুনে সেঁদিয়ে থাকবে। বরকন্দাজ কি লাগিয়েছে দেখ, আমার ঘর-দোর খুঁড়ে তছনছ করেছে—

নটবর ফিসফিস ক'রে বল্ল—চুপ! মেজাজ দেখাস নে বউ—তিন বছরের খাজনা বাকি, জানিস ?

মাণিক হুসিয়ার লোক, তারও এই রকম গোছের একটা সন্দেহ ছিল। সে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ব'লে উঠ্ল—কে রে উনুনের মধ্যে কথা বলে কে ?

আতংকে ঢুকে পড়া যত সহজ, বেরিয়ে আসা তেমন নয়। নটবর নানারকমে চেষ্টা করে, বলে—হবে, হ'য়ে যাবে—ও মাণিক ভাই, অত হাসছ কেন ? মাজাটা বড্ড ধ'রে গেছে কিনা! বউ, কাঁধের এই এইখানটা ধ'রে একটু টান দে দিকি হ্যাঁ, জোর ক'রে টান দে—

অনেক কষ্টে সে বেরিয়ে এল। কাঁধের কাছে কেটে গেছে, বিছুটি লেগে সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠেছে। একটুখানি হাসির মত ভাব ক'রে নটবর বল্ল—উনুনটা সাফ ক'রতে ঢুকেছিলাম মাণিক ভায়া—কি রকম জঙ্গল হয়েছে, দেখ—

মাণিক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। বল্‌ল—তবু ভাল। আমি ভাবলাম বুঝি শেয়াল—

ঘাড় নেড়ে নটবর বলে—তাই, ঠিক তাই—শেয়াল-কুকুর ছাড়া আমরা কি! মানুষের ভয়ে শেয়াল গর্তে ঢোকে, আমরা গর্তে ঢুকি তোমাদের ভয়ে! নিজের রসিকতায় খানিক সে হা-হা ক'রে হাসে, তারপর খপ ক'রে বরকন্দাজের হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রে বলে—কাছারি গিয়ে বলোগে ভায়া, বাড়ি নেই। তোমার রোজ-গণ্ডা সমস্ত দিয়ে দেব—

মাণিক হাত বাড়িয়ে বলে—দাও··· আমার নগদ কারবার—

—আজ নয়, পরশু। হাটে দিয়ে দেব। মাইরি—আজ একটা পয়সা নেই, থাকে তো বাপের হাড়—

বরকন্দাজ বল্‌ল—তবে হবে না, মনিবের নুন খেয়ে আমি মিথ্যে বলতে পারব না। আজ আবার ছোটবাবু এসেছেন সদর থেকে। রেগে আগুন হ'য়ে আছেন। চলো—

দৃঢ়মুষ্টিতে তার হাত এঁটে ধ'রল।

ফাঁসির আসামীর মত নটবর কাছারির হলঘরে এসে দাঁড়াল।

ছোটবাবু অল্প কথার মানুষ; বল্‌লেন—মালিকের মাল-খাজনার দায়ে তোমার জমি নীলাম হ'য়ে গেছে—

—আজ্ঞে।

—বয়নামা জারি হয়েছে, ঢোল-সহরৎ হয়েছে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

নায়েব একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন চশমার ফাঁকে চেয়ে বল্‌লেন—শুধু তাই নয়, হুজুর একদিন লাঙল খুলে জমি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিলাম—

ছোটবাবু বল্‌লেন—অথচ শুনতে পাই রাত্তিরে রাত্তিরে জমি চষা হ'চ্ছে। বলি মতলবটা কি?

নায়েব টিপ্পনি কাটলেন—মতলব বোঝাই যাচ্ছে, হুজুর। পেছনে ঠিক রঘুনাথ সা রয়েছে, এই ব'লে দিলাম। জমির দখল বজায় রাখছে—

ছোটবাবু বলতে লাগলেন—তোমাদের জন্য আমি সদরে ফৌজদারি ক'রতে যাব না। আসবার সময় কলকাতা থেকে একখানা ভাল হাণ্টার নিয়ে এসেছি। তা-ই যথেষ্ট। দেখবি?

নটবর আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠল। —হুজুর বাঁধ ভেঙে তিন তিন বছর ক্ষেত ভাসিয়ে দিল—পেটে খেতে পাইনি, খাজনা দেব কোত্থেকে? সে ছোটবাবুর পা জড়িয়ে ধ'রল।—এবার জমিতে বাবু ভাল গোণ; সোনা ফলবে, হুজুর। খাবার ধান যা, জোগাড় ছিল, সমস্ত বীজতলায় ছড়িয়েছি। এইবারটা রক্ষে করুন, ধর্মবাপ—সিকি পয়সা আর বাকি থাকবে না—

নায়েব ডাকলেন—শোন্, শোন্— ইদিকে আয় নটবর। তোদের ঐ মায়াকান্না শুনলে কি আর রাজ্যি রক্ষা করা যায়? আচ্ছা, তামাক সাজ দিকি। তোর ধানের চারা খুব ভাল হয়েছে—না?

—হ্যাঁ বাবা—

—কত জমিতে বীজধান ছড়িয়েছিস? কাঠা দশেক?

—বেশি হবে বাবা—

—ভাল ভাল! তা হ'লে সেই বা কোন্ না বিশ-কুড়ি টাকার ফসল! মাণিক বরকন্দাজের দিকে চেয়ে নায়েব বললেন—এ সব খবর তো আমাদের কানে আসে না।—

নটবর হাত জোড় ক'রে অস্পষ্টস্বরে আবার কি বলতে গেল। নায়েব বললেন—হ্যাঁ, হবে। ধানচারার একটা উপায় হবে বই কি! তুই হুজুরের হুকুম নিয়ে চলে যা এখন।

ছোটবাবু বল্‌লেন—আচ্ছা যা। কিন্তু জমি জমিদারের। আর কোনদিন লাঙল চষবি নে—খবরদার!

ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এল। তারপর হেসেই খুন।—জমি চষিস না—হঃ, বললেই হ'ল। চষব না তো সোনা হেন ধানের চারা বুঝি বীজতলায় শুকিয়ে মারবে?···নায়েব মশায় লোক মন্দ নয়, ওর মনে মনে দরদ আছে। ছোটবাবু আগে চ'লে যাক সদরে···কাছারির কিছু পার্বণী লাগবে, তা লাগুক—

সৌদামিনী রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা ক'রল কি হ'ল?

—কিছু না, কিছু না, বাবু শিবতুল্য লোক—

—সে জানি। তারপর গম্ভীর আর্তকণ্ঠে সৌদামিনী বল্‌ল—জমি চষেছ ব'লে মারধোর করেছে কিনা, সেই কথাটা বল আমায়—

—মারধোর? বাঃ রে—। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নটবর বিব্রত হ'য়ে উঠল। বল্‌ল, মগের মুল্লুক নাকি! এ সব কথা কে বলেছে শুনি? বাবু যে আমাদের সাক্ষাৎ শিবঠাকুর।

—যা ওরা সবাই—ঐ বরকন্দাজটা অবধি। শিবঠাকুরের ঢোল বাজিয়ে জমি নিলাম করেছে—ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—সেই দিন থেকে তোমার মাথাধরা আর ছাড়ে না। তুমি বলনা, কিন্তু আমি সমস্ত শুনেছি, সমস্ত জানতে পেরেছি।

সৌদামিনীর চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল। নটবর মৃদু কণ্ঠে অপরাধের স্বরে বল্‌ল—তার আর কি বলব বউ—ওদের দোষ কি, তিন বছরের মাল-খাজনা পায়নি—

সৌদামিনী আগুন হ'য়ে উঠল। ওরা খাজনা পায়নি, আর তুমি এই তিন বচ্ছর—দিন নেই রাত নেই—তিল তিল ক'রে জীবন দিয়েছ, তুমি কি পেয়েছ, শুনি?

নটবর বল্‌ল—ঠাণ্ডা হ—বউ, তুই একেবারে আস্তপাগল। খাজনা না পেলে ওদের চলে!

বুড়ো কর্তা কত টাকা দিয়ে বিষয় ক'রে গেছেন—ছোটোবাবু আজও বলছিলেন সে টাকার সুদ পোষাচ্ছে না—

—আর, আমার বুড়ো শ্বশুর আবাদ ক'রতে সাপের কামড়ে মরেছেন, তাঁর ছেলেপুলের পেটে দানা পড়ছে না—সেটা কিছু নয়!

—অবোধ চাষার ঘরের বউ—নটবর যা বলেছে, পাগলই ঠিক!—এই কথাটা কিছুতে বোঝে না, লাঙল টানতে টানতে গরু-মহিষও তো কত মুখ খুবড়ে মরে যায়! মানুষ সাপের কামড়ে মরেছে, জ্বরে ওলাউঠায় পঙ্গপালের মত মরেছে, বাঘ-কুমীরের পেটে গেছে—আবার নূতনের দল এসেছে, যুগের পর যুগ চলেছে, বন কেটে জনপদ হয়েছে, শস্যশালিনী পৃথিবী হাসছে। যাঁদের এই পৃথিবী, রাজ্য দেখতে তাঁরা মাঝে মাঝে শুভ পদার্পণ করেন, রাজকাছারিতে উৎসব পড়ে যায়, আলো জ্বলে, মাছ আর মিষ্টান্ন দেশদেশান্তর থেকে ভারে ভারে উদয় হয়, শতজনে তটস্থ, তিলমাত্র ত্রুটি যেন না ঘটে!···কবে কোনখানে কে মরেছিল, কে তার ইতিহাস মনে রেখেছে···আর তার দরকারই বা কি!

প্রকাণ্ড দিন এবং তারও চেয়ে মন্থর চারিপ্রহর রাত্রি কেটে যায়, নটবরের কাজকর্ম নেই। বিলের মধ্যে কেবল তার ক্ষেতটাই ফাঁকা। যখন-তখন সে আলের উপর গিয়ে বসে; বুকের মধ্যে হু-হু করে। ওদের সব রোওয়া হ'য়ে গেছে, এমন গোণ আজ কত বছর হয় নি! দেবরাজ অঝোর ধারে জল ঢালছেন, বৃষ্টির মধ্যে রিমঝিম বাজনা বাজে, গাছপালা মাঠ-ঘাট উল্লাসে সবাই মিলে গান ধরে, বীজতলায় ধানের চারা দুষ্ট ছেলের মত বৃষ্টিতে বাতাসে দাপাদাপি করে। হতভাগারা বলছে যেন, নিয়ে যাও গো আমাদের ঐ বড় বিলের মাঝখানে—দুপুরের কড়কড়ে রোদ পড়বে মাথার উপর, চারিদিকে জল থৈ-থৈ ক'রবে,—আবার দু'ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ থেকে বাদলা ছুটে আসবে, দেয়া ঝিলিক দেবে, কত আমোদ! তার লাঙল-বলদও যেন নিঃশব্দে কথা বলে, তার শূন্যক্ষেত হাতযোড় ক'রে চেয়ে থাকে···

এমনি সময় এক একদিন নটবর ভাবে ঐ পাগলী—সৌদামিনীর কথাগুলো। জমি চষতে দেবে না...হুঃ, বল্লেই হ'ল! আমার বাবা মরেছে সাপের কামড়ে···যে ক'টা ধান ছিল, পেটে না খেয়ে বীজতলায় ছড়িয়েছি···জমি দেবে না তো এদের জায়গা দেব কি মাথার উপর?—কেন দেবে না?

আবার একদিন সে কাছারি গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়ল।—নায়েব মশায়, আর যে বাড়ি থাকতে পারিনে—

—ফাঁকা ক্ষেত, দাওয়ায় ব'সলে দেখা যায়। থাকি কি ক'রে? হুকুম দাও—রুয়ে ফেলি। ফসল না হয় কাছারির গোলাতে উঠবে—

—ছোটবাবু নেই, আমার হুকুমে হবে কি? আসছে, সদর থেকে পাকা হুকুম আসছে—

তারপর রোজই প্রায় নটবর হাঁটাহাঁটি করে।—চোখের উপর চারাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, তুমি যে বলেছিলে বাবা, উপায় একটা হ'য়ে যাবে—

নায়েব অভয় দিয়ে বলেন—হবে, বলেছি যখন—উপায় হবে না? ব্যস্ত হ'সনে নটবর, পাকা হুকুম এল ব'লে—

অবশেষে হুকুম এল—পাকাই বটে; আদালতের ছাপ মারা। নটবর সকালবেলা উঠে দেখে, বীজতলায় গরু পড়েছে।

—হোই গো কি সর্বনেশে কাণ্ড গো!

বাঁক নিয়ে তাড়া ক'রতে গরু পালালো, এগিয়ে এল চরণ ঘোষ।

—গরু তাড়াও কেন গো, মোড়ল? বারো টাকা গুণে দিয়ে তবে বন্দোবস্ত পেয়েছি—

বন্দোবস্ত? নটবরের চক্ষু কপালে উঠ্‌ল।

মাণিক বরকন্দাজ দখল দিতে এসেছিল; সে-ই সমস্ত বুঝিয়ে দিল। জমি নিলাম হয়েছে, তাতে খাজনা সব শোধ হয়নি। তাই বীজতলার ধানচারা ক্রোক হয়েছে। চরণ ঘোষ জাতে গোয়ালা—গরু-বাছুর অনেক, গরুর খোরাকির কম প'ড়ে গেছে, তাই কাছারি থেকে বীজতলার বন্দোবস্ত নিয়ে গরু নামিয়ে দিয়েছে।

—ভাল, ভাল। নটবরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল; বলতে লাগল, পাগল—তোমাদের আক্কেল ভাল বটে, মাণিক-ভাই কোন চাষার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা গেল না বুঝি তবু আমার ধানচারা গরুর পেটে যেত না—ভুঁয়ে ঠাঁই পেত।

মাণিকের অনেক কাজ, হাসতে হাসতে সে চ'লে গেল। চরণ ঘোষের দিকে নটবর গর্জন ক'রে উঠল—গরু নিয়ে চ'লে যাও, ভাল হবে না বলছি—

চরণ বল্‌ল—টাকা কি তবে আক্কেল সেলামি দিয়ে এলাম?

নটবর অধীর কণ্ঠে বলতে লাগল—ধান গরু দিয়ে খাওয়াবে, চাষার ছেলে হ'য়ে চোখে তা দেখতে পারব না—পারব না। গরু সরিয়ে নাও বলছি। না হয় আমিই উপড়ে দিচ্ছি, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়াও গে—

অদূরে দেখা গেল, চরণের ছেলে কানু—একটা দু'টো নয়—তাদের গোয়ালশুদ্ধ গরু নিয়ে আসছে। তাই দেখে চরণের জোর বাড়ল, কিন্তু নটবর একেবারে উন্মাদ হ'য়ে উঠল। বাঁক নিয়ে সে সমস্ত ক্ষেত ছুটাছুটি ক'রে ধান মাড়িয়ে বীজতলা চষা ক্ষেতের মত কাদা-কাদা ক'রে গরুগুলো ছুটে। নটবর চীৎকার ক'রতে লাগল—বেরো—বেরো আমার জমি থেকে—

কানু ছুটে এল। বাপে-বেটায় একসঙ্গে এসে নটবরের সামনে রুখে দাঁড়াল—খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে বাঁকের একবাড়ি চরণের চোয়ালের উপর। চোখে অন্ধকার দেখল, বাবা গো ব'লে জলকাদার মধ্যে সেইখানে চরণ ব'সে পড়ল। কানু চেঁচাতে লাগল, মাণিক বরকন্দাজ

বেশিদূর যায় নি, ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, মাঠ থেকে চাষারা এল গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষও কেউ আর বড় বাকি রইল না। সকলের শেষে এলেন নায়েব মশায়, অনেকক্ষণ গুম্ হ'য়ে থেকে বল্‌লেন—পিপীলিকার পাখা উঠেছে—

কিন্তু আসামীর দেখা নেই, ঘর বাড়ি অন্ধি-সন্ধি কোথাও খুঁজতে বাকি নেই—গোলমালের মধ্যে কখন সে স'রে পড়েছে, যেন পাখি হ'য়ে উড়ে গেছে।

উত্তেজনা ও আস্ফালন চল্‌ল রাত্রি অবধি। ক্রমশ যে যার বাড়ি যেতে লাগল, চারিদিক নির্জন হ'য়ে এল। সৌদামিনী আজ সমস্ত দিন রান্না করেনি, এক জায়গায় চুপটি ক'রে ব'সে সকলের গালি শুনেছে আর কেঁদেছে। গভীর রাতে ল্যাম্পো জ্বলছিল। ল্যাম্পোর আলোয় ছায়া দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। নটবর টিপিটিপি ঘরের মধ্যে এসে উঠেছে। ফিস্‌ফিস্ ক'রে সে বল্‌ল—চরণ কেমন আছেরে, বউ?

—ভাল। একটু চুপ ক'রে থেকে সৌদামিনী বোধ হয় উদ্যত অশ্রু রোধ ক'রল। বল্‌ল—ভাল না থাকলে কি অমন বাঁধুনি-ঝাঁটা গালি-গালাজ বেরোয়?

নটবর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ল।—সমস্ত চরণের ভিরকুটি—ছুতো ধ'রে পড়েছিল, আমি তখনই জানি...

সৌদামিনী বল্‌ল—তা ব'লে নায়েব ছাড়বে না। থানায় গেছে, কাল তোমার কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে। আর বলেছে, ঘরের চাল কেটে বসত ওঠাবে—

মুখ খানা ম্লান ক'রে নটবর বল্‌তে লাগল—কেন ছাড়বে? সুবিধে পেলে কে কাকে ছাড়ে বল্? একটা ফ্যাসাদ বাধালে দু-চার পয়সা পাওনা-থোওনাও তো রয়েছে? তারপর সে বল্‌ল—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু ভাত-টাত আছে রে বউ?

বধূ উঠে দাঁড়াল, ভাত তো নেই—রাঁধার সম্ভাবনাও নেই, উনুন ভেঙে হাঁড়িকুড়ি ভেঙে চাল-ডাল ছড়িয়ে তারা প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী নটবরের হাত ধ'রে টানলো।

—চল, চ'লে যেতে হবে এখান থেকে—

নটবর একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসল। মেয়ে মানুষ, তায় বয়সে কত ছোট—এই তো মাত্র ক'বছর আগে এই সংসারে এসেছে—কিন্তু সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকালে নটবর প্রতিবাদের ভরসা পায় না। একটু ইতস্তত ক'রে বল্‌ল—তাই চল্। জমি যখন দেবে না—চল্ তোর পিসের বাড়ি যাই তবে। পাইকঘেরির বন কেটে নাকি নূতন আবাদ ক'রবে শুন্‌ছি—

যা কিছু সামনে পেল পুঁটলি বেঁধে তারা কাঁধে নিল। ক'পা গিয়ে বধূ থম্‌কে দাঁড়াল।

—কি?

—ল্যাম্পোটা জ্বলছে যে—

নটবর তাচ্ছিল্যের ভাবে বল্‌ল—থাক গে কি হয়েছে—জলে জলে আপনি নিভে যাবে—

কিন্তু সৌদামিনী মানা শুন্‌ল না। ঘরে ঢুকে জলন্ত ল্যাম্পো নিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। এসে সেই ল্যাম্পো ধর্‌ল চালের কিনারায়। নূতন ছাওয়া ঘরের চাল রাতের অন্ধকারে ঝিকঝিক করছে। চালে আগুন ধ'রল। নটবর ছুটে এসে বলে---ক'রলি কি? ঘরে আগুন দিলি? কি সর্বনাশ ক'রলি বউ!

সৌদামিনী হেসে উঠ্‌ল। আগুন দাউদাউ ক'রে ওঠে। হাসি তার আরও উগ্র হয়। বলে—ব'য়ে গেল—ব'য়ে গেল। আমাদের কি—যাদের জিনিস তাদের পুড়েছে, তাদের সর্বনাশ—

ল্যাম্পোটা সে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নটবরের হাত ধ'রে বাঁধের উপর দিয়ে ছুটল। নটবর আর ছুটতে পারে না।—থাম্‌ থাম্‌—ওরে বউ, ভুল পথে চললি যে! পিসের বাড়ি কি এইদিকে?

—না, যমের বাড়ি—

—বালাই ষাট। নটবর একটু রসিকতার চেষ্টা ক'রল। তোর যে কত সাধ, বউ। এই বয়েসে—এত সকাল সকাল সেখানে যাবি?

সৌদামিনী বল্‌ল—হাঁ, যাব। গিয়ে সেই পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা ক'রব, পৃথিবী যদি বাটোয়ারা ক'রে দিয়েছিস—তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে?

প্রেতিনী

চণ্ডীদহের মুখে পড়িয়া ডিঙি টলমল করিতে লাগিল। একে তো গাঙে ভয়ানক টান, তার উপর উল্টা বাতাস। মাঝির কলিকায় আগুন কেবলমাত্র ধরিয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ বলিল—না, না—মাঝি, তামাক খাওয়া রেখে দুই হাতে বোঠে চালাও দিকি—এবং মাঝির সেই কলিকা নিজের দুই হাতে চেটোর মধ্যে অভিনিবেশ সহকারে টানিতে আরম্ভ করিল। হইলে কি হয়, শান্তিতে তামাক খাওয়া তাহারও কপালে নাই। ছইয়ের ভিতর [illegible] আওয়াজ। চুড়ি অবশ্য নানা কারণে বাজিতে পারে—নিচু ছই, উঠিতে বসিতে হাত [illegible] যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একবার—দুইবার—তিনবার, কলিকা রাখিয়া উঠিতে হইল—

ভিতরে ঢুকিয়া দেখে একটা টিনের ট্রাঙ্ক, সেইটা দুই হাতে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া প্রভা বসিয়া আছে। হরিচরণকে দেখিয়া একটু হাসিবার মত ভাব করিল। কহিল—নৌকো কি রকম টলমল করছে দেখ না—আর তুমি ব'সে ব'সে বেশ তামাক খাচ্ছিলে—

হরিচরণ বলিল—ভয় হচ্ছে নাকি তোমার ?

প্রভা বলিল—কিসের ভয় ? না, আমার ভয়-টয় নেই মশায়। ···ওঃ সর্বনাস ! তুমি যে অত কাছে এসে বসলে—মাঝে মোটে পাঁচ-সাত হাত জায়গা। আর একটু-খানি দূরে গিয়ে বসতে হয়। মাঝিরা দেখলে ভাববে কি ?

এটা প্রভার মিথ্যা কথা। দুইজনের মাঝে যে ফাঁকটুকু ছিল তাহা পাঁচ-শত হাত তো নয়, হাত দুয়েকও হইবে না। কিন্তু প্রভার কাঁচা বয়স, বিয়ে মোটে বছর দুই আগে হইয়াছে,

যা বলে তাহাতে তর্ক করিতে নাই। হরিচরণ সরিয়া একেবারে পাশে আসিল। অমনি প্রভা তাহার কোলের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একটু পরে মাথা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, আজকে যদি এখানে নৌকা ডুবে যায়—

হরিচরণ রাগ করিয়া উঠিল—ও-সব কি কথা? গাঙের উপর ভর-সন্ধ্যেকালে অমন বলতে নেই—

প্রভা নিষেধ মানিল না। —ধর যদি ডুবেই যায়, আমি তো মোটেই সাঁতার জানিনে—তুমি কি কর তা হ'লে?

—কি করি? দিব্যি হাসতে হাসতে গাঙ পাড়ি মেরে একলা ঘরে ফিরে যাই। তুমি কি ভাব বল দেখি?

প্রভা বলিল—না, তা কক্‌খনো যাও না। সত্যি তুমি কি কর আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে, বল না।

—তোমাকে জড়িয়ে ধরে সাঁতার কাটি।

প্রভা তবু ছাড়ে না।—আর কোনোগতিকে যদি তোমার হাত ফসকে যায়? আমি তো অমনি চণ্ডীদ'র অথই জলে তলিয়ে যাব, তা হ'লে কি ক'রবে?

হরিচরণ বলিল—তোমার আর কথা নেই আজ?

প্রভা জেদ করিয়া বলিল—না, বল কি কর তা হ'লে? বলবে না? আচ্ছা, থাক গে। মুখ ভার হইয়া উঠিল।

—তা হ'লে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে আমিও অমনি ডুবে মরব। ঐ গাঙের তলায় ফের যুগল-মিলন হবে।

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ইঃ, তা আর হ'তে হয় না! সাঁতার-জানা মানুষ সাঁতার না দিয়ে ইচ্ছে ক'রে ডুবে মরতে পারে কখনও?

—বিশ্বাস কর না?

প্রভা বলিল—না!

—তোমায় ছেড়ে আমি সত্যি-সত্যি বেঁচে থাকব, এই তুমি ভাব?

প্রভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—ভাবি না তো কি? বেঁচে থাকবে এবং পছন্দ মত তিন নম্বরের জন্যে তক্ষুণি ঘটক লাগাবে। পুরুষ মানুষের আবার ভালবাসা!

হরিচরণ বলিল—বেশ, তবে তাই। তোমায় আমি ভালবাসিনে, আদর করিনে, জ্বালাতন করি, এই তো? ভাল ভাল কাপড় গয়না দিতে পারিনে, আমি গরিব মানুষ—আমার আবার ভালবাসা! বেশ—বেশ—বলিয়া সে অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া মনোযোগের সহিত স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে প্রভাই কথা কহিল—ওদিকে এক-নজরে চেয়ে কি দেখছ?

ওগো, কি দেখছ বল না ? গরু ? মাছরাঙা ? জেলেদের বউ ? কই, জবাব দিলে না যে !

হরিচরণ নিরুত্তর।

প্রভা উঠিয়া বসিল। তারপর খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—রাগের পুরুষ, অত রেগো না—তুমি ভালবাস, ভালবাস—একঝুড়ি, দশঝুড়ি, দশ হাজার ঝুড়ি ভালবাস। হ'ল তো ! সহসা জোর করিয়া তুই হাতে হরিচরণের মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—তুমি ওদিকে তাকাতে পাবে না, কক্‌খনো না—এই ব'লে দিলাম। মাঝগাঙে আমার একা একা ভয় করে না বুঝি ? কই তাকাও আমার দিকে—কথা কও—

কাজেই কথা কহিতে হইল। বলিল—কি কথা কব ?

প্রভা কহিল—আমি শিখিয়ে দেব নাকি ? আচ্ছা, বল—আর কোনদিন তামাক খাব না, কারণ মুখ দিয়ে ভারি বিশ্রী গন্ধ বেরোয়, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী পছন্দ করেন না—বল, বল—

হরিচরণ বলিল—মুখের কথা ফস্ ক'রে তো ব'লে ফেল্‌লে ! প্রথম যখন তামাক খাওয়া প্র্যাক্‌টিশ করি সে কৃচ্ছ সাধনের ইতিহাস তো শোন নি। নিমু দাসকে দেখেছ—কৈবর্ত পাড়ার নিমাই ?

প্রভা গল্প শুনিতে ভারি ভালবাসে। গল্পের গন্ধ পাইয়া তৎক্ষণাৎ পরম উৎসাহে সায় দিল—হুঁ।

ঐ নিমুর সঙ্গে খুব ভাব করেছিলাম। রোজ তুপুরে স্কুল পালিয়ে তার বাড়ি যেতাম। আমাকে দেখে খুব খাতির ক'রে ছাঁচতলায় কোদালখানা নামিয়ে দিত—দিয়ে নিমু নিজেই যেত তামাক সেজে আনতে। ফিরে আসতে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দেরি হ'ত—যত্ন ক'রে তামাক সাজত কিনা ! ততক্ষণ হলুদের ভুঁই তৈরি করবার ব্যবস্থা। ঠিক-তুপুরে রোদ্দুরে ঘণ্টাদেড়েক ধ'রে জমি কোপান—একবার ভাব তো ব্যাপারখানা !

প্রভা কহিল—ওমা আমার কি হবে ! এতখানি কষ্ট ক'রতে তামাক খাওয়ার জন্যে ?

হরিচরণ কহিল—এই শেষ নাকি ? একদিন কথাটা কেমন ক'রে বাবার কানে উঠ্‌ল। একটা আস্ত কল্কি ভাঙলেন পিঠের উপর। সংসারে একেবারে ঘেন্না ধ'রে গেল। বল্‌লে বিশ্বাস ক'রবে না, তখন তো মোটে বার-তের বছর বয়স—শেষ রাতে জয়গুরু ব'লে বৈরাগী হ'য়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গের সম্বল একটা দেশলাই, এক কৌটা তামাক এবং বাবার নক্‌সী-কাটা সখের কল্‌কেটা—

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেলে ?

হরিচরণ বলিল—কিছু তো ঠিক ক'রে বেরুই নি। যাচ্ছি তো যাচ্ছি। মাঝে মাঝে গাছতলায় ব'সে তামাক সেজে নিচ্ছিলাম। গোড়ায় ফুর্তিও ঠেকছিল খুব—একেবারে মাঠের

প্রভা কহিল—তারপর ?

—তারপর বোধগম্য হ'ল যে সন্ন্যাসে মজা নেই। কিন্তু আপাতত এক ছিলিম তামাক এবং রাত কাটাবার একটুখানি জায়গার তো দরকার, শেষে ভাত-টাত জোটে ভালই। একজন চাষা শুকনো খেজুরপাতার আটি নিয়ে যাচ্ছিল, ডাক দিলাম—ও মিয়া সাহেব, তোমার হাতের কল্‌কেয় কিছু আছে নাকি ? সাফ জবাব দিল—না। ফের জিজ্ঞাসা করলাম—এ গাঁয়ের নাম কি ? বল্‌লে—কমলডাঙা।

প্রভা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—কমলডাঙা ? ঐ-খানেই তো দিদির বাপের বাড়ি না ?

হরিচরণ প্রশ্ন করিল—দিদি ? তোমার আবার দিদি কে ? চিনলাম না তো।

প্রভা বলিল—আমার দিদি। সরযূ—সরযূ, আমার আগে যিনি ছিলেন গো। তুমি প্রথমে কমলডাঙায় বিয়ে করনি ?

হরিচরণ বলিল—উঁহু, কলমীডাঙায়। কমলডাঙা সেই কোথায়—সাত-সমুদ্দুর পার। আর কলমীডাঙা ঐ সামনে—খান পাঁচ-সাত বাঁকের পর গিয়ে প'ড়ব।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—তাই নাকি ? আমাদের এই নৌকো দিদির বাপের বাড়ির গাঁ দিয়ে যাবে ?

হরিচরণ বলিল—হুঁ, তা ছাড়া আর পথ কই ? ও মাঝি, নৌকো কলমীডাঙার খাল দিয়ে উঠবে তো ?

কিন্তু মাঝি কি বলে শুনিবার মোটেই অপেক্ষা না করিয়া প্রভা বলিল—আমি নামব কিন্তু, নেমে এক দৌড়ে দিদির বাপের বাড়ি গিয়ে সব দেখে শুনে আসব। হাসছ যে—হাসলে শুনব না। যাব আর আসব, একমিনিটও সেখানে থাকব না, কেমন ?

হরিচরণ বলিল—যাঃ, তা কি হয় ?

—কেন হবে না ? দিদির বাবা মা বুঝি আমার পর। আমি যাব কিচ্ছু দোষ হবে না—

হরিচরণ বলিল—দোষের কথা কে বলছে ? ঘাট থেকে সে বাড়ি অনেক দূর—

প্রভা কহিল—অনেক দূর ? দু'-ক্রোশ দশ-ক্রোশ ? যাও—ও তোমার যেতে না দেবার কথা—

ইহারও উত্তরে হরিচরণ একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু প্রভা শুনিল না। সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ও শুনেছি, যখন সেই ঘাটে যাব আমায় বোলো। হ্যাঁ—তুমি যা বলবে তা আমি জানি। ও মাঝি, কলমীডাঙায় নৌকো গেলে আমায় বোলো, একটু নামব।

বুড়া মাঝি স্বীকার করিল।

প্রভা পুনরায় আরম্ভ করিল—দিদি মারা যান এই কলমীডাঙায়—না ?

হরিচরণ বলিল—হ্যাঁ, বাপের ভিটে যেন ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো। এসে দশটা দিনও কাটল না। সে তো তুমি সব শুনেছ।

সে গল্প প্রভা আগেই শুনিয়াছে। হরিচরণ অবশ্য সর্বদা চাপা দিতে চায়, কিন্তু প্রভাকে পারিবার জো আছে! একটা একটা করিয়া সব শুনিয়া তবে ছাড়িয়াছে।

বছর চার আগের কথা, তখন হরিচরণ চৌধুরী-সেরেস্তায় নায়েবী করিত। আষাঢ়-কিস্তির টাকা আদায় হইয়াছে, সেই টাকা লইয়া কলিকাতায় জমিদার-বাড়ি যাইবে। পানসীও ঠিক হইয়া গিয়াছে। ক'দিন পরে রথ, মতলব আছে কলিকাতা হইতে অমনি রথের বাজার সারিয়া আসিবে—গোটা পাঁচ-সাত কলমের আঁবের চারা, এক সেট ছিপ-সুতা-বড়শী, সরযূর জন্য একখানা হাতিপাড় মটকার শাড়ি—পাড়টা একটু পছন্দ করিয়া কিনিতে হইবে, অমন গায়ের রঙের সঙ্গে যাহাতে মিল হয়। এই সমস্ত ঠিক হইয়া আছে, কিন্তু হঠাৎ সরযূ বাধাইল মুস্কিল।

সন্ধ্যার সময় কেহ কোথাও নেই, হরিচরণ নিজের মনে টাকার চালান ঠিক করিতেছিল—হঠাৎ সরযূ আসিয়া সামনে বসিল। হরিচরণ একবার চাহিয়া দেখিতেই বিনা ভূমিকায় বলিল—আমি তোমার নৌকোয় কলমীডাঙায় যাব। চালানের যোগটা যাহাতে নিভুর্ল হয় হরিচরণের মন ছিল সেই দিকে শুধু বলিল—হুঁ। সরযূ অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—তাহলে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিইগে?—হরিচরণ প্রশ্ন করিল—কি—কি বলছ? কিন্তু সরযূর অনাবশ্যক উত্তর দেবার জন্য একমুহূর্ত ও দাঁড়াইল না। পরে চালান লেখা শেষ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যখন সরযূর দেখা মিলিল, তখন তাহার বাক্স গোছানো প্রায় সারা। কলমীডাঙায় রথের সময় বড় ধুমধাম হয়। হরিচরণের এই পানসীতে চড়িয়া সরযূ সেখানে যাইবে, চাঁপাতলার ঘাট কাছেই পড়ে—সেইখানে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে, তারপর ও রথের মেলার ক'টা দিন বাপের বাড়ি থাকিয়া আবার হরিচরণের ফিরতি-বেলায় সেই নৌকা হই ফিরিয়া আসিবে—এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পাকা হইয়া গিয়াছে, আর তাহার নড়চড় হইবার উপায় নাই। হরিচরণ একটু প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বলিল—বাঃ রে, তুমি যে হুঁ বল্লে, আগে রাজী হ'য়ে শেষকালে—এবং মুখের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কাজেই বরকন্দাজকে একটু বড় দেখিয়া পানসি আনিতে বলিয়া দেওয়া হইল। শ্বশুর-মহাশয়কে চিঠি লেখা হইল,। বুধবারে দিনের ভাঁটায় খালের ঘাটে যেন পালকি-বেয়ারা উপস্থিত থাকে।

এই যে এত জেদ ক'রে বাপের বাড়ি আসা, কিন্তু চাঁপাতলার ঘাটে যখন নৌকা লাগিল সরযূ কেমন কেমন হইয়া গেল—যেন নামিবার উৎসাহ পায় না। নামিতে গিয়া ফিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর হরিচরণের কাছে আসিয়া বলিল—আমি যাব না, তুমি এসো, না হ'লে একা একা কখনো যাচ্ছিনে। কিন্তু হরিচরণের তো নামিবার উপায় নাই। সঙ্গে

বিস্তর কাঁচা টাকা—লাটের কিস্তি আসিয়া পড়িয়াছে, টাকাটা ঠিক সময়ে পৌছাইয়া দেওয়া দরকার, পথে একটুও দেরি করিবার জো নাই। মেয়েমানুষে এসব বোঝে না। সরযূর ধারণা, হরিচরণ ঠিক রাগ করিয়াছে। রাগ যে করে নাই, তাহা যতই বলা যায় কিছুতে বিশ্বাস করিবে না। কেবলই বলে—জেদ ক'রে এসেছি ব'লে তুমি ঠিক রাগ করেছ, ঠিক—ঠিক—তোমার মুখ দেখে বুঝেছি—আমাকে ঠকাতে পারবে না—হাসলে কি শুনি?

বিপুল বেগে হাস্য করিলেও ভুলিবে না, এমনি মুস্কিল! ওদিকে ঘাটের উপর শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং পালকি বেয়ারা সহ উপস্থিত। হরিচরণ একবার নামিয়া প্রণাম করিয়া এবং সবিশেষ নিবেদন করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছে। তিনি ঠায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া, অথচ মেয়ে-জামায়ের বিদায়ের পালা আর সাঙ্গ হয় না। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল—যাও, যাও শ্বশুর মশায় কি ভাবছেন বলতো? সরযূর সেই আগের কথা—রাগ করনি? আচ্ছা গা ছুঁয়ে বল। হ্যাঁ, বল যে ফিরতি-বেলা সঙ্গে নিয়ে যাবে—

সরযূর গা ছুঁইয়া হরিচরণ বলিল—নিয়ে যাব।

সে শপথ রক্ষা হয় নাই।

এ সব পুরানো কথা। ডিঙি চড়িয়া আজ রাত্রে দু'জনে সরযূর বাপের বাড়ির ঘাট দিয়া চলিয়া যাইবে ইহা শুনিয়া অবধি প্রভার কেবলই নানারূপ মনে উঠিতে লাগিল। নৌকায় উঠিয়াই ছইয়ের একদিকের অনেকখানি খড় ছিঁড়িয়া সে মস্ত বড় ফাঁক করিয়া লইয়াছে, সেখান হইতে উত্তরের পাড় বেশ দেখা যায়। সেই ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া যে সতীনকে জীবনে সে কোনোদিন দেখে নাই তাহার কথাই ভাবিতেছিল। হরিচরণ চুপ করিয়া বসিয়া। ছপ্-ছপ্ করিয়া দাঁড়ের আওয়াজ······এক একবার ধনুকের তীরের মত পাশ কাটাইয়া জেলে-ডিঙি আগাইয়া যাইতেছে হঠাৎ মাঝি চেঁচাইয়া উঠিল—বাঁয় দাঁড় মার; ডাইনে দ'—গাজী বদর—বদর—। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। একটা পাখি জলের ধারে কোথায় বসিয়াছিল, মাঝির চিৎকারে ফর্‌ফর্ করিয়া ডিঙির উপর দিয়া ওপরে উড়িয়া গেল।

প্রভা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজকে অমাবস্তে?

হরিচরণ বলিল—উঁহু। অমাবস্তে কাল, নিশিপালন উপোষ দুই-ই। অমাবস্তের খোঁজ কেন?

প্রভা কহিল—দিদি যেদিন মারা যান সেদিনও ঘোর অমাবস্তে শুনেছি—না?

হরিচরণ প্রভার মুখের দিকে চাহিল। বলিল—এখনও ঐ কথা ভাবছ? যা চুকে-বুকে গেছে, সে-সব আবার কেন?

প্রভা কাতর-কণ্ঠে-কহিয়া উঠিল—ওগো, আজ যদি আবার অমনি চুকে যায়, আমার কথাও আর তুমি ভাববে না তা হ'লে ?

হরিচরণ বলিতে লাগিল—শোন কথা। তুমি আজ হ'লে কি ? যখন-তখন যা তা বলা ভারি আদিখ্যেতা। না, অমন বলে না, কি কথা কেমন ক্ষণে প'ড়ে যায় কিছু বলা যায় কি ?

প্রভা একটু হাসিল।

হরিচরণ বলিল—হাসছ ! আমি ঐ রকম কালাকাল মানতাম না—পাঁজি-টাজি ডোণ্টকেয়ার করতাম। শোন তবে সরযূকে নামিয়ে দিয়ে তো কলকাতায় গেলাম, কাছারি থেকে খবর গেল বিপিন সা জোর ক'রে হালের বাঁধ কেটে দিয়েছে। সেদিন অমাবস্যে, তার উপর সূর্যিগেরোন। খাজাঞ্চী মশায় বল্লেন—এমন দিনে কখনও বেরুবেন না, শাস্ত্রে পই-পই ক'রে বারণ আছে। না শুনে রওনা হলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, চাঁপাতলার ঘাটে নৌকো বেঁধে নিজে গিয়ে সরযূকে তুলে আনবো—এত ক'রে ব'লে দিয়েছিল। যাত্রার ফল অমনি সাথে সাথে। ঘাটে পৌঁছে দেখি, আমাকে আর যেতে হ'ল না—সে-ই এসেছে।

এ-কথা তো প্রভা শোনে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—এসেছিলেন ? আমরা শুনেছি যে আর দেখা হয় নি।

হরিচরণ বলিল—হাঁ প্রভা, এসেছিল, দেখাও হয়েছিল। চাঁপাতলায় নয়, তার রশিটাক পশ্চিমে বটতলার শ্মশানঘাটে। বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

তখন উত্তর-বিলে ঝোড়োকোণায় একসারি তালগাছের মাথায় ক্রমে আঁধার করিয়া আসিতেছে, একটা একটা করিয়া তারা ঢাকিয়া যাইতেছে। প্রভা হঠাৎ কহিল—একটা কথা ব'লবো ?

কি ?

—আজকে নৌকো এখানে বেঁধে রাখ, কালকে জোয়ারে যাব—

হরিচরণ বলিল—তাতে লাভ কি ?

প্রভা বলিতে লাগিল—তুমি অমত কোরো না। এই রাত্তিরে কলমীডাঙায় গেলে তুমি কক্‌খনো আমায় নামতে দেবে না, তা জানি। কালকে সেই অমাবস্যে, কাল দিনমানে ঘাটে নৌকো বেঁধে আমি দিদির বাবার ওখানে ছুটে যাব। গিয়ে বল্‌ব, আমি এসেছি—এক অমাবস্যেয় তিনি গিয়েছিলেন আর এক অমাবস্যেয় আমি এসেছি, ঘরে নাও। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, অমত কোরো না—আমার বাবা নেই, কাল দিনমানে আমি বাবার কাছে যাব। বলিতে বলিতে হরিচরণের পায়ের কাছে পড়িয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। এমনি ছেলেমানুষ !

কিন্তু সত্যসত্যই তো মরা-সম্পর্কের কুটুম্ববাড়ি বিনা খবরে অমন করিয়া নূতন বউকে তোলা যায় না। লোকে বলিবে কি ? হরিচরণ প্রভাকে শান্ত করিতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, আচ্ছা পাগল তুমি ! একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ তো, তা কখনও হয় ?

প্রভা মাথা তুলিয়া বলিল—কি হয় না?

—বলছি, তুমি ওঠ! দেখ, ভগবান যাকে নিয়ে গেলেন তার জন্যে হা-হুতাশ ক'রে ফল কি? ও ভুলে থাকাই ভাল।

প্রভা আগুন হইয়া উঠিল।—জানি, জানি, তোমরা তা খুব পার। তোমরা ভালবাস না ছাই! সব মুখস্থ-করা কথা। আজ যদি ঝড় ওঠে, নৌকা ডুবে যায়, আমি মরি—কালকেই আর একজনের সঙ্গে কত সোহাগ হবে! তখন আমার কথা কেউ বলতে গেলে অমনি মুখ চেপে ধ'রবে—

হরিচরণ হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—রাগ ক'রে চোখ বুজে আছ নাকি? গাঙ ছাড়িয়ে নৌকো যে খালে ঢুকেছে। এখানে মোটে হাঁটুজল। নৌকো ডুবলেও আমরা ডুববো না, দেখ না তাকিয়ে।

প্রভা রাগ করিয়া জবাব দিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

নৌকা তখন খালে ঢুকিয়া তরতর বেগে যাইতেছিল। প্রভা বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে তারা নাই, চারিদিক আঁধার—ভাল করিয়া ঠাহর করিলে ঝাপসা দেখা যায়। খালের ধারে কাহাদের লাউমাচা, জোয়ারের জল তাহার নিচে অবধি তলাইয়া গিয়াছে। প্রভার নড়াচড়া নাই। চরের ধারে সারি সারি ক'খানা ঘর ও খড়ের গাদা দিগন্ত-বিসারী ধানক্ষেত পাহারা দিতেছে। হঠাৎ তাহারই মধ্যে কোন্ দাওয়া হইতে শঙ্খনী বাজিয়া উঠিল। আকাশভরা মেঘ, কোনো পারে একটা লোকের ছায়া দেখা যায় না। প্রভা বসিয়াই আছে—যেন একখানি ছবি, ছইয়ের ভিতরে অন্ধকার পটের উপর পাকা ধানের রং দিয়া ছবি আঁকানো। হরিচরণও চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু কতক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা বড় অসহ্য ঠেকিল। প্রভার হাত ধরিয়া নাড়িয়া বলিল—শুনছ? শুনছ?

—কি?

শোঁ শোঁ করিয়া অনেকদূর হইতে শব্দ আসিতে লাগিল, দূরের কোনো গাঁয়ে বাদল নামিয়াছে। হরিচরণ বলিল—অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? এদিকে ফেরো না। এখনও রাগ আছে নাকি?

প্রভা কহিল—রাগ কিসের?

—রাগ নয় তো কি? কেবল ঐ রাগটাই যা তোমার দোষ, নইলে তোমায় আমার এমন ভাল লাগে—

এবার প্রভা মুখ ফিরাইল, একটুখানি হাসি ঠোঁটে ফুটিল। বলিল—সত্যি নাকি?

হরিচরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—নিশ্চয়ই, বুক চিরে দেখাতে পারি—

প্রভা কহিল—দেখাও না একটু। তারপর হাসিতে হাসিতে অতি তরলস্বরে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, ঐ কথাটা—ঠিক ঐ কথাটা কতবার তুমি দিদিকে বলেছ, আমায় বলতে পার?

হরিচরণ মুষড়াইয়া গেল। সরযূর ভূত তবে তাহাকে এখনও ছাড়ে নাই! হয় তো রাতে দুপুরে মাঝে মাঝে যখন মাথার ঠিক থাকে না, সরযূকে এইরূপ কোনো কোনো কথা বলিয়া থাকিবে, কে তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে? সকলেই এমন বলিয়া থাকে, কিন্তু সে-সব স্বীকার করিবার জায়গা ইহা নয়। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল—কক্‌খনো না, একদিনও না—

প্রভা কহিল—কি সাধুপুরুষ! একদিনও না? হাত-পা ছেড়ে দিয়ে গাঙের তলায় যুগল-মিলন হবার কথা-টথা দিদিকে কোনোদিন বল নি—যেমন আজকে আমায় বলছিলে?

প্রভা খুশি হইতেছে বুঝিয়া হরিচরণ আরও উৎসাহে প্রতিবাদ করিতে লাগিল—যাকে-তাকে একথা বলা যায় নাকি? ও তোমাকেই শুধু বললাম—বুঝলে প্রভা, সে শুধু নামেই তোমার সতীন, ভালবাসার ভাগ পায় নি—

ঠিক এমনি সময়ে মাঝি বলিয়া উঠিল—কলমীডাঙায় এলাম মা-ঠাকরুণ—। কশাড় হোগ্‌লাবনের মধ্যে ঢুকিয়া হোগ্‌লার আগা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নৌকা ডাঙায় আসিয়া লাগিল। হরিচরণের মুখের হাসি নিবিয়া গেল। তাহার কেমন মনে হইল, যাহাকে কোনোদিন ভালবাসে নাই বলিতেছিল, সে যেন কথাটা আশপাশ কোনখান হইতে শুনিয়া ফেলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ ঠিক সরযূরই কান্না, সুরের তীব্রতায় যেন সহস্রগুণ জোরে আসিয়া বুকে লাগিতেছে! বাতাস উঠিয়াছে। ঘাটের উপরে বাঁশঝাড়, নিরন্ধ্র অন্ধকার—সেখানে কটর্‌-কটর্‌-কট্‌ সে যে কি শব্দ উঠিতেছে, যেন কে সমস্ত চিবাইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলে আর কি! সেই অন্ধকারে কিছু দূরে বাঁওড়ের কিনারায় হরিচরণ অকস্মাৎ যেন সরযূকে দেখিতে পাইল। সরযূকে সে কতকাল চোখে দেখে নাই, মন হইতে সে যেন মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিল, তেমনি খুব ফরসা এবং কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা টকটক করিতেছে, পরণে লালপাড় শাড়ি, রং কাচা হলুদের ন্যায়—সে যে তাহাতে কোনো ভুল নাই। সরযূ আজ অন্ধকারের মধ্যে আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গল ভাঙিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঁওড়ের বাঁশের সাঁকো পার হইতে পারিল না, সেখান হইতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছে—আমায় ফেলে যেও না, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। হরিচরণ চোখ বুজিল, হাত দিয়া কান ঢাকিল, তবু কানে ঢুকিতে লাগিল—ঝড়ের একটানা শব্দ—উ উ উ ভাষাহীন একটানা কান্না। মনে হইল, ঐ শব্দ আসিতেছে সাঁকোর ওপার হইতে, সেখানে মুখ থুবড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া সরযূ কাঁদিতেছে। সে উহাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছে—শুনিয়া বুক চাপড়াইয়া বিজন শ্মশান-ঘাটায় একলা প্রেতিনী মানুষের ভালবাসার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। মড়-মড় করিয়া একটা গাছ ভাঙিয়া পড়িল। যেন সাঁকো পার হইয়া আসিল! চেঁচাইয়া বলার দরকার—মাঝি, মাঝি, বোঠে ধর, দাঁড় লাগাও, পালাও পালাও—

দরকার তো বটে, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

প্রাগৈতিহাসিক

ও

আত্মহত্যার অধিকার

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৯০৮, দুমকা। পৈত্রিক বাস ঢাকা বিক্রমপুর। বাল্য ও কৈশোর শিক্ষায় কেটেছে বাংলার অসংখ্য শহর ও পল্লীতে—মহিষাদল, মেদিনীপুর, ঘাটাল, বাঁশিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা, যশোহর, খুলনা, টাঙ্গাইল, কাঁথি প্রভৃতি স্থানের স্কুলের কোথাও ছ'মাস কোথাও একবছর। কলেজে পড়েছেন বাঁকুড়া ও কলকাতায়। প্রথম প্রকাশিত বই ১৩৪০ সালে উপন্যাস "জননী"।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক-জীবনের সূত্রপাতে একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৩৩৫ সালে, কলেজ জীবনে তখন তিনি বি-এ পড়েন, একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তর্কবিতর্কে বাজী রেখে তৎক্ষণাৎ একাসনে বসে "অতসী মামী" গল্পটি রচনা ক'রে ফেলেন এবং সেটি সেই সময় বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। এই এঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সূচনা। এঁর মতো লেখকের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসের আরম্ভ যে এভাবে হ'তে পারে—"পুতুল নাচের ইতিকথা" ও "পদ্মানদীর মাঝি"'র লেখকের সৃজনি শক্তি যে কি ক'রে এতদিন এ ভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব তা ভাবলে সত্যই বিস্মিত হ'তে হয়। তারপর কয়েক বছরের মধ্যেই বহু গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্যের ও মানব-জীবনের অকৃত্রিম ইঙ্গিত নিহিত থাকে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় তারই বিস্ময়কর অভিব্যক্তি মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। মানব মনের পরিচিত ও অপরিচিত জগতের গভীর রহস্যময় জটিলতাকে প্রকাশ ক'রতে এঁর লেখায় কখনও অর্থহীন সংকেত, অবাস্তব ঘটনা-সংস্থান, ভাবপ্রবণতাময় বিকৃত দার্শনিক তত্ত্ব, সুদীর্ঘ নীরস বিশ্লেষণ প্রভৃতি রস-সাহিত্য রচনার সুলভ উপায়গুলির সাহায্য নিতে দেখা যায় না। সমাজ ও বাংলা সাহিত্যে উ[illegible] কুলি-মজুর, জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা থেকে আরম্ভ ক'রে চোর-ডাকাত [illegible]রীর জীবনের সুখ-দুঃখ এঁর লেখায় নিখুঁত ও বাস্তব রূপ পেয়েছে। এঁর কয়েকটি উপন্যাস—জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি। গল্প—অতসীমামী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী।

প্রাগৈতিহাসিক

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদীতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নীচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরও ন'ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ি চিতনপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাও খান সহজ লয় স্যাঙ্গা। উঠি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে' যামু? খুনটো যদি না করতিস—'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

'এই জন্মে লা, স্যাঙ্গাৎ।' বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘ টাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছেগা। সাপে যদি না কাটে তো [illegible] কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু...'

'চিড়া গুড় দিলাম যে? দু'দিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম। রোজ আইলে মাইন্ষে সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা'টা লতা পাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দু'দিন দু'রাত্রি সংকীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপ্সা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার একমুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন চার দিনের মত চিড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের অত্যাচারে জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসীর জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসীটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসী জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না। অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়া গুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারি দিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্‌জুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু'ঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু'এক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুম বাড়ি গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুম বাড়ির বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কি ভাবে দিন রাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম

ছুটানো তাড়ির নেশার মতই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মত ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসীটা এক সময় নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশে পাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুম বাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য একবাটি ভাত ও কয়েকটা পুঁটি মাছ ভাজা আর একটু পুঁই চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ও-গুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মইয়ে শোয়াইয়া তাহারা দু'জনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপর খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভাল হইল না। গাছের মরা ডালের মত শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ি ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্দীর মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌয়ের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে তাহার বাকী রহিল না যে কাজটা যত

বড় কর্তব্যই হোক, সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারাল দা'টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর' আমার বাড়ির থেইকা,—দূর হ'।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভাল চাসত! বাজু না দিলি সা' বাড়ির মেজোকর্তার মত গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রা[illegible]ম। বাজু পালি' আমি অখনি যামু গিয়া।' কিন্তু বাজু ভিখু ফেরৎ পাইল না। তাহাদের [illegible]দের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দু'জনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। [illegible]লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কি[illegible] করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আ[illegible] করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে ছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্ব[illegible]লিয়া উঠিয়া বাগ্দী পাড়ায় বিষম হৈ চৈ বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সব্বনাশ, হায় সব্বনাশ! সরকে আমার শনি আইছিলো গো, হায় সব্বনাশ।'

কিন্তু পুলিসের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারী ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতনপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলে ডিঙি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ তাহার ছিল না, একটা চ্যাপ্টা বাঁশকে হালের মত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোন রকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশিদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশংকা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয় তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিস বহুদিন যাবত তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা

তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিস আশে পাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দু'জন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দু'টো পয়সা দিবান কর্তা ?'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মত ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মত শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়া হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল, 'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন, 'একটা দিলাম, তাতে হ'ল না,—ভাগ্!'

একমুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট্ করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়ি মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে-খড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহুপুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম-ভিখারীর মত আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মত দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরাল বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোন দিন রাঁধে ছোটমাছ কোনদিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নীচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস টানা' শ্বাস টানা' কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায়: হেই বাবা একটা পয়সা: আমায় দিলে ভগবান দিবো: হেই বাবা একটা পয়সা—

অনেক প্রাচীন বুলির মত 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারাদিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশি হইলে সারাদিনে ভিখুর পাঁচ ছ'আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দু'দিন হাট বসে। হাট বারের উপার্জন তাহার একটি পুরা টাকার নীচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দু'তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশের ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি-করিয়া-আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটুলি করিয়া বালিশের মত ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জলো-বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংস-পেশী নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানীকে মারিতে উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাইবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারী-সঙ্গ-হীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভাল লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনা-বহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কি আছে? পুলিসের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশি পুলিস তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্দীর সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার। সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দু'বছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুকুর-ঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বৌকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ'মাস পরে রাখুর বৌকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা যে দা'য়ের এক কোপে দু'ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কি জীবন তাহার ছিল, এখন কি হইয়াছে!

মানুষ খুন করিতে যাহার ভাললাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানী হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আপশোষের সীমা থাকে না। সংসারের

অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এতবড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপশোষেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সে জন্য ঘা'টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, 'ঘা'টি সারবো না, লয়?'

ভিখারিণী বলে, 'খুব! অসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, অসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘা'টি সারলে তোর আর ভিক মাগতি অইবো না,—জানস্? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি'ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পরনি পা'টি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই বিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিণী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দু'দিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা'টি মুই তখম পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিণী কোনমতেই রাজী হয় না। ভিখু ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার ভাঁটা বয়, শীতের আমেজ বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপা-কলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রূপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিণীর কাছে যায়। বলে, 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।'

ভিখারিণী বলে, 'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন ঘর গিয়া, আথার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কি?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মত জোয়ান দাড়িওলা এক খঞ্জ ভিখারী খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মত ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে। *

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিণী আবার বলিল, 'বসস্ যে? যা, পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন, অমন সব হালাই করতিছে। উয়ার মত দশটা মাইন্ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পার্তাম, তা জানস্?'

ভিখারিণী বলে, 'পারস্ তো যানা, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কি?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছ চ'।'

'ইরে সোণা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মত কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নাইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মত প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিণীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটো কিরা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে নাই।

ভিখারিণী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগতে আইছস্? হোই ও বুড়ীর কাছে যা।'

ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিণীর সামনে রাখিয়া বলে 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশি হইয়া বলে, 'নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে,—পাঁচী। তুই কলা দিছস্, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার মত সৌখিন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধূলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে! পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া'

বসির বলিল, 'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে! লাঠির একঘায়ে শিরটি ছেচ্যা দিমু নে।'

দু'জনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুল গাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র' তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল, 'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি' জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকেই দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারীর অভাব নাই।

কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নীচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিক ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দু'বেলা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী ভিখারিণীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজী হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয় তো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যে ভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোন উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নেই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়।

এক-এক দিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মত ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা ক'টি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মত পাথরে ঘসিয়া ঘসিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটিও সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যের অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল 'বাঁ টি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগবান!'

নদীর ধারে ধারে আধ মাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ হাতে রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দিয়া শহরের অপরপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু'মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে পাশে মাইল খানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার দু'দিকে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠক্ ঠক শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘা'য়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড় তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড় বিড় করিয়া বকে!

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচু বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারীর কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই : ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গামত না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুস্কিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক্ : চিল্লাবিতো তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটকু আওয়াজ লয়, ভালা চাস ত একদম মাইরা থাক্।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

দম নিয়া বলিল, 'আলোটা জ্বাইলা দে, পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'দেখছস্? কেডা কারে খুন করল দেখছস্? তখন পই পই কইরা কইলাম; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছাড়ান দেও। শুইনে মিয়াবায়ের অইল গোসা! কয় কিনা, শির ছেঁচ্চ্যা দিমু। দেন গো দেন, শিরটা আমার ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই—' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক' হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরেও দিমু নাকি সাবার কইরা,—অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'ইবারে কি করবি?'

'দ্যাখ কি করি! পয়সা করি ক'নে থুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভাণ করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুটি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশি উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশি হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চাঁদ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্দি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাটন লাগব।'

পায়ের ঘা নিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস্ পাঁচী?'

'হ', ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দু'দিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয় তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

আত্মহত্যার অধিকার

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে।

কিছু নারিকেল আর তালপাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোন লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙা বাক্স পেঁটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামা-কাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড় ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, কাঁদেনা; কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর এক ঘন্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কি চাহনি? আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাত বছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কি অপরাধ যে মেয়েটা তাকে ও-রকম ভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোট ছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল, ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে। ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?

নীলমণি বলিল, হয় তো হবে। বাঁচবে।

নিভা বলিল, বালাই ষাট্।—শ্যামা, তুইও তো ধ'রতে পারিস ছাতিটা একটু?

শ্যামা নীরবে ভাঙা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল ভেদ করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিসপত্র নিয়া মানুষগুলি এ-কোণ ও-কোণ করিবে কেমন করিয়া?

একছিলুম তামাক দে শ্যামা। নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল, ছাতিটা ধর তবে?

নীলমণি আকাশের বজ্রের মত ধমকাইয়া উঠিল: ফেলে দে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধ'রব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদি!

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মত মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল, তামাক আর একটুখানি আছে বাবা।

দুঃসংবাদ!

এত বড় দুঃসংবাদ প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতিকষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল: বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন করিয়া? ছেলের কান্না দুই কানে তীরের ফলার মত বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মত সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ ও কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন,—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি!

তামাক আনান হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই! ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে! নিজে গেলে হয়তো দোকান হইতে ধার আনিতে পারিত, কিন্তু—

নীলমণি খুশি হয়। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?

আমি দেখিনি বাবা।

দেখিনি বাবা! কেন দেখোনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?

তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা!

তা সাজবে কেন? বাপের জন্যে তামাক সাজলে সোণার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্গত অশ্রু সে দমন করিয়া লইল। না আছে তামাক না থাক্। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখ-মুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল—টপ্ টপ্। অঞ্জলি পাতিয়া নীলমণি গুনিয়া গুনিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ করা চামড়ার মত ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কি বলিল, ঘরের কেউই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মত তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দু'জনেই।

শ্যামা বলিল, ও কি করছ বাবা?

নিভা বলিল, পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাঁগা, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয়তো কাল জুটবে না নিভা!

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তার সহজ নয়। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্মমতা তাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মত চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনাও চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিস্ ফিস্ করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুস মন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোণার ওই ভাঙা বাক্সটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক

হইয়া ভিতরে টাকা ঝম ঝম করিতে থাকে;—টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

•

ঘন্টাখানেক এমনি ভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, রাত কত?

তা হবে, দুটো তিনটে হবে।

একটা কিছু ব্যবস্থা কর? সারারাত জল না ধ'রলে এমনি ব'সে ব'সে ভিজব?

ব'সে ভিজতে কষ্ট হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আর ভাল করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁসিয়া ব'সে পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরণটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল, তবে ভাল ক'রেই ছাতাটা ধর্ বাবু খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া দিল। ফিস্ ফিস্ করিয়া আপন মনে বলিল, কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি। নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তার সজাগ, নির্মম ভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তার স্তিমিত দৃষ্টিতে সরলার মুখ তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া কাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে সুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায়, ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ায় আর কি মনে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকী সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভাল ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে

পায় নাই ; ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পিঠের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয় তো ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজ বাড়ির ভাল ভাল খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয় তো ঘুমের মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন হিসাবে ?

নিমুকে তুলে দে তো শ্যামা।

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন, তুলবে কেন ? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে।

হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে ! ঢং করছে ! যেমন কথা তোমার ! ঢং করার মত সুখেই আছে কি না।

আধঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল, দেখো, এমন ক'রে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চল।

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল, না।

নিভা রাগ করিয়া বলিল, তুমি যেতে না চাও থাকো, আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটলোক। সেবার কি বলেছিল মনে নেই ?

বললে আর করছ কি শুনি ? রাত দুপুরে বিরক্ত ক'রলে অমন সবাই ব'লে থাকে।

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, ব'লে থাকে ? রাতদুপুরে বিপদে প'ড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে ব'লে থাকে,—একি জ্বালাতন ?

ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে ব'লে থাকে কাপড় জামা সব ভিজে ? ময়লা হবার ভয়ে ফরাস তুলে নিয়ে ছেঁড়া সতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয় ?—যেতে হবে না। বাস্।

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তার মাথা গরম হইয়া গেল।

ছেলে মেয়ে বৌকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান অপমান জ্ঞান কি জন্যে ? আজ বাদে কাল ভিক্ষে ক'রতে হবে না ?

নীলমণি বলিল, চুপ্।

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

চুপ ক'রেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হ'লে—হাতের কাছে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল, চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন ক'রে ফেলবো।

কথা কেউ বলছে না। নিভা একেবারে নিবিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, মা, ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।

গরিবের মেয়ে, হা-ঘরের বৌ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আঁচড়াচ্ছে তো কি হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচো!—ভালো ক'রে ছাতি ধ'রে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব।

নীলমণি বলিল, আমার লাঠিটা কই রে?

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল, মেরো না বাবা। দরজা না খুল্‌লেও আপনিই চ'লে যাবে।

তোকে মাতব্বরি ক'রতে হবে না, বুঝলি? চুপ ক'রে থাক।

বাঁ পাটি আংশিক ভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণায় তার মোটা বাঁশের লাঠিটি ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাটিটা সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে! বেচারী খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এত দিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথি ঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা বলিল, মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস? আজ ওর ভবযন্ত্রণা দূর ক'রে ছাড়ব।

ভবযন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সংকুচিত হইয়া থাকে; তার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পান্‌সা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মত কুকুরটিরও মরিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল, লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি। তোকেই খুন ক'রে ফেলব আজ!

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বার বার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, কি জিদ মেয়ের! ছেড়েই দেনা বাবু লাঠিটা।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল, জিদ বার করছি। লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও-রকম রাগ হইলে সে কখনো সামলাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয় তো ভিন্ন! কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে!

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার, দশ বছর জ্বর ভোগ করিয়া যেমন হয় তেমনি মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে!

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিঁকিল না।

লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা?

শ্যামা একবার ভাবিল চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

একটুখানি আছে বাবা।

জ্বাল তবে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, লণ্ঠন কি হবে?

সরকারদের বাড়ি যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছো না?

যেন সরকারদের বাড়ি যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল, দেশলাই কোথা রাখলে মা?

নিভা বলিল, দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই?

নীলমণি বলিল, ওর কি জ্ঞান-গম্যি কিছু আছে?

নিজের মুখের কথাগুলি খচ্ খচ করিয়া মনের মধ্যে বেঁধে! এ যেন তোতাপাখির

মত অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা; না বলিলে চলে না সত্য ; কিন্তু আসলে বলিয়া কোন লাভ নাই।

সাত বছরের পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়ে নি। দে তো শ্যামা, শুকনো কিছু দে তো। আর এক কাজ কর—দুটো তিনটে কাপড় পুঁটুলি ক'রে নে। ওখানে গিয়ে সব্বাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস্।

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল, হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা ? লক্ষ্মী মা-টি আমার—পারবি ? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভ'রে নিলেই হবে। জলের কি অভাব !—তামাকটুকু ফেলে যাস্ নে ভুলে।

সব ব্যবস্থাই হইল, নিমুর কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া ওাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তারা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ; সময় মত অন্তত দু'টি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধ হয় ওই ভগ্ন স্তূপটির মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়াছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল, দরজা খোলো, দরজা খোলো।

বাড়ির সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছল এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কষ্ট নীলমণিরই বেশি ; শুকনো ডাঙাতেই বাঁ-পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট্ করিয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়,—এখন তার পা আর লাঠি দুই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া যায়, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া থাকে। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটুলি, হুঁকা, কল্কে, লণ্ঠন, আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ি। পুকুরটা ঘুরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোণার প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া তিন-চার হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুল গাছটার জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছমছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোণালী পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল, ও শ্যামা, পার হব কি ক'রে !

শ্যামা বলিল, জল বেশি নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্ত ওঠে নি। চ'লে এসো।

সুখের বিষয় স্রোতের নীচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাকে বিপন্ন করিল না। তবু, এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দু'চোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় যে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে,—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়? যে প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙা ঘরে টিঁকিতে না পারিয়া তাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয় তো সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,—সে কোন্ দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া! একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল, বাবা, চ'লে এসো? দাঁড়ালে কেন?

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল; ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়—সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চিৎকার করিয়া উঠিল, মাগো, সাপ্!

পরক্ষণে আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বলিল, সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কি পিছল!

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল, শক্ত ক'রে ধর, দু'হাত দিয়ে ধর,—পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনো বাড়িসুদ্ধ সকলে বাড়ি বাড়ি করিয়া পাগল। বলে, বেশ হয়েছে, না? দোতলায় দু'খানা ঘর তুললে, বাস্ আর দেখতে হবে না।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড় ছেলে বাহিরের দরজা খুলিল। বলিল, ব্যাপার কি? ডাকাত না কি?

নীলমণি বলিল, না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিঁকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে। ভাবলাম, তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।

বড় ছেলে বলিল, সন্ধ্যা বেলা এলেই হ'ত!

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল: সন্ধ্যায় কি বৃষ্টি ছিল ভাই? দিব্যি ফুটফুটে আকাশ—মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মা-র অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু বড়ছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড় ছেলে বলিল, বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকি পাবেন না, চৌকিতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।

তা হোক ভাই, তা হোক ভিজতে না হ'লেই ঢের। একখানা কম্বল-টম্বল—?

ওই কোণে চট আছে।

বড় ছেলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁঝালো হাসি হাসিয়া বলিল, দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু জুতো মারতে বাকি রাখবে।

নিভা বলিল, ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি ব'লে জেনো!

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, তা ঠিক।

ঘরে আধেকটা জুড়িয়া চৌকি পাতা, বড় ছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকির উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ির আত্মীয়কেও ফরাস তুলিয়া লইয়া শুধু সতরঞ্চির উপর শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুশি হইল। বড় ছেলের পিসে!—আপনার লোক। সে যদি ও-রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তারা যে লাথি ঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য!

চারিদিকে চাহিয়া নীলমণির খুশির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক, মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের একদিকে একটিমাত্র ছোট জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস্, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোন্ সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ একরাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,—তারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি মা, চটগুলো বিছিয়ে দে চট্ ক'রে। একটু গড়াই। আহা,

ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, তাড়াতাড়ির কি আছে। এতক্ষণই গেল না হয় আরও খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ? দাও না, খোকাকে চৌকির একপাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফ্যালো। গলা নামাইয়া ফিস্ ফিস করিয়া—

ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, অত লজ্জাটা কিসের, শুনি? লজ্জা করে দরজা খুলে বারান্দায় চ'লে যাও না!

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়। চাপা একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। তাদের,—নীলমণি আর তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ এক রকম শাসানো। পঞ্চভূতের মধ্যে যার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কি করিবে? পরশু? তারপর দিন? তারও পরের দিন?

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, বলিল, মাগো কি গন্ধ!

নিভা বলিল, নে ঢং ক'রতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।

নীলমণি বলিল, ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।

নিভা বলিল, না না, ঝাড়িস্ নি! ধুলোয় চাঁদ্দিক অন্ধকার হ'য়ে যাবে।

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকির দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড় ছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন মাথার অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গায়ের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোণা যায়। বুকের বাঁ পাশে কি ঠিক চামড়ার নীচেই হৃদ্‌পিণ্ডটা ধুক্‌ধুক করিতেছে!

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিক পরে ক্ষীণস্বরে বলিল, একটা জান্‌লা খুলে দিন।

নীলমণি সভয়ে বলিল, দে তো শ্যামা জানালাটা খুলে দে।

শ্যামা আরও বেশি ভয়ে ভয়ে বলিল, ঝড় হচ্ছে যে বাবা!

হোক, খুলে দে।

শ্যামা পশ্চিমের ছোট জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পূবদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিটে-ফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ায় বিশেষ কোন মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল, ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হ'লেই দম আটকাত! বাপ্!

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ আছে না কি?

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, খুব মোটা-সোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বচ্ছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কাণা, এত লোক নিচ্ছে আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায়, শত্রুও যেন—

ব্যারামটা কি?

পিসে রাগিয়া বলিল, টের পান না? এমন ক'রে শ্বাস টান্‌ছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কি! যার হয় সে বোঝে।

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা সেরে যাবে, ভাল মত চিকিচ্ছে হ'লেই সেরে যাবে।

পিসে বলিল, হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকি আছে মশায়? ডাক্তার, কবিরেজ, জলপড়া কিচ্ছুটি বাদ যায় নি। আজ চার বছর ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছি, কোন ব্যাটা সারাতে পারল!

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মত শ্বাস টানে, এক একবার থামিয়া গিয়া ডাঙায় তোলা মাছের মতই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস! পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল!

পিসে বলিল, কি করে জানেন? বলে, ভয় কি, সেরে যাবে। ব'লে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে, না বাপু, তোমার সারবে না, এ-সব ব্যারাম সারে না। আমি বলি, ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবিনা তো মেরে ফ্যাল, দে মরবার ওষুধ দে।

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তার বিনিদ্র আরক্ত চোখ দু'টি কেবলি মিট্‌মিট্ করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপ্‌দপ্ করিতেছে, এখনই নিবিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা-কল্কে শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিবিয়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকি তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মত সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।

লাউডগা

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

রবীন্দ্র মৈত্র—জন্ম ১৩০৩ রংপুর, মৃত্যু ১৩৩৯ মাঘ। আদি পৈতৃকবাস ফরিদপুর নাড়ুরিয়া গ্রামে। রবীন্দ্র মৈত্রের পরিচয় এই সংক্ষিপ্ত কথায় দেওয়া যায় না। তিনি একদিকে ছিলেন চিন্তাশীল শক্তিমান লেখক, আর একদিকে ছিলেন নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমিক, দৃঢ়চেতা কর্মযোগী। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ও প্রিলিমিনারী 'ল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েই কায়মনোবাক্যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। রবীন্দ্র মৈত্র অল্প কালের মধ্যেই যে সামাজিক সেবা ও সংস্কারের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার তুলনা নেই। তার কয়েকটি পরিচয় সংক্ষেপে দেবো। জাতিধর্মনির্বিশেষে অসহায়কে ও নির্যাতিতকে আশ্রয় দেওয়া, অসম্মান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে নারীকে রক্ষা করা। বেশির ভাগ তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল কাটিহার পূর্ণিয়া অঞ্চলের ওঁরাও সাঁওতালদের মধ্যে, রংপুর রাজবংশীয়দের ভেতর এবং আসাম অঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের পর্ণ-কুটিরগুলিতে। ময়মনসিংহের ফকিরগঞ্জ এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার বিঘা জমির ওপর "ওঁরাওন মিশন" নামে এক ওঁরাওনদের কলনি স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সেখানে বহু খৃষ্টধর্মাবলম্বী ওঁরাওদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর আদর্শ ছিল জাতি সংগঠন, লোকশিক্ষা, চাষ আ[illegible], কুটিরশিল্প, জমিজমা বিলি-ব্যবস্থা ও মহাজন সমস্যা, স্বাস্থ্য ও চরিত্র সংগঠন, শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার, মৈত্রির অনুশীলন, স্কুল, হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা। তিনি একধারে ছিলেন কর্মী ও চিন্তানায়ক, যোদ্ধা ও সাহিত্যিক।

তাঁর সাহিত্য প্রতিভায় ছিল ত্রিধারার সংগম : অনবদ্য গল্প লেখক রবীন্দ্র মৈত্র, সুন্দর হাস্যরসিক রবীন্দ্র মৈত্র ও নির্ভিক সত্যাশ্রয়ী রবীন্দ্র মৈত্র। একদিকে অতিতুচ্ছ লোকদের সুখদুঃখের কাহিনী, যাদের কথা কেউ ভাবে না, যাদের আর্তনাদ কোলাহলের তলায় চাপা প'ড়ে যায়,—অবরুদ্ধ যাতনা নিঃশব্দে অন্তরের মধ্যেই গুমরে মরে, তাদের ব্যথা-বেদনার ইতিহাস। একদিকে অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হাসির উৎস। আর এক দিকে যেখানে ন্যাকামি, ভণ্ডামি, চালাকির রাজত্ব, তাদের ওপর তাঁর নির্মম ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত। যেখানে তাঁর হাসি, যেখানে অশ্রু, পাঠকের মন শ্রদ্ধায় ভ'রে ওঠে শুধু লেখার প্রতি নয়—লেখকেরও প্রতি। ইনি বহুপ্রবন্ধ, নাটক, রসরচনা ও কবিতা লিখেছেন। এঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প—থার্ডক্লাস, উদাসীর মাঠ। ব্যঙ্গগল্প— দিবাকরী, সাময়িকী, ত্রিলোচন কবিরাজ। ব্যঙ্গনাট্য—মানময়ী গার্লস্কুল।

লাউডগা

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অকস্মাৎ একটি কুকার্য করিয়া বসিলেন।

প্রতিবেশী বদন ঘোষের পোষা পাঁঠা কেলোকে ঢেঁকির মুগুর দিয়া এমনই প্রহার করিলেন যে বেচারীকে আর ঘোষের বাড়ি ফিরিতে হইল না, ঠাকুরাণীর খিড়কির পুকুর ঘাটেই সে 'ভ্যা' করিয়া জন্মের মত চক্ষু মুদিল। পাড়ায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী দাওয়ায় আসন পাতিয়া তাঁহার জপের মালা লইয়া বসিয়াছিলেন, এই সময় স্বয়ং বদন ঘোষ পাড়ার আর দুইজন মাতব্বর সহ ঠাকুরাণীর বাড়ির আঙিনায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরাণীর এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মাত্র ষষ্ঠী ঠাকুরাণী একেবারে তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—'মেরেছি! বেশ করেছি! ধান খায়, কলাই খায় কিছু বলিনে তাতে, কিন্তু আমার ওই লাউগাছটা—এসে রোজ তার কচি পাতাগুলো মুড়িয়ে খাবে, আঃ মরণ!'

বদন ঘোষ পঞ্চায়েতে ঠাকুরাণীর নামে নালিশ করিবার ভয় দেখাইয়া সঙ্গীদ্বয় সহ প্রস্থান করিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী জপের মালা রাখিয়া তাঁহার লাউ-মাচার তলে দাঁড়াইয়া নিবিষ্টভাবে লাউগাছটির অবস্থা পুনরায় পর্যবেক্ষণ করিলেন, তাহার পর গোবর-মাটি লইয়া কেলোর চর্বিত স্থানটিতে প্রলেপ দিয়া স্বর্গীয় ছাগশিশুর উদ্দেশে দ্বিতীয়বার অভিসম্পাত বাণী উচ্চারণ করিলেন।

ঠাকুরাণী সত্য কথাই কহিয়াছিলেন। তাঁহার আঙিনায় পল্লীর যাবতীয় চতুষ্পদ প্রাণীর অবাধ গতিবিধি ছিল। তাহারা সুবিধা পাইলেই ঠাকুরাণীর ধান, চাল মায় বৈকালিক আহারের ফলমূল পর্যন্ত নিঃশেষ করিয়া যাইত, তাহাতে ঠাকুরাণীর ধৈর্যচ্যুতি হইতে কেহ কোনদিন দেখে নাই কিন্তু ওই লাউগাছটি! লাউ-মাচার নীচে গোবৎস অথবা ছাগবৎস আসিলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। ঠাকুরাণী সবেগে তাহার প্রতি ধাবিত হইতেন—

তাহারা পলাইয়া যদি বা বাঁচিত কিন্তু তাহাদের মালিকরা এই মারাত্মক অপরাধের জন্য বুড়ী ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর বাক্যযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সে দিন চক্রবর্তী বাড়ির বকনা বাছুর ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর লাউগাছের ছুটি কচিপাতা চর্বণ করিয়াছিল, ঠাকুরাণী তাহাকে তাড়া করিয়া চক্রবর্তী-বাড়ি পর্যন্ত আসিলেন এবং অপরাধীকে না পাইয়া চক্রবর্তী-গৃহিনীকে আধঘণ্টা ধরিয়া তিরস্কার করিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়িতে ফিরিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন—বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার সেদিন আর মাধ্যাহ্নিক আহার হইল না।

লাউগাছটির উপর ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর এই উৎকট মমতার একটি হেতু ছিল।

বৎসর দুই পূর্বেকার কথা। একদিন ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর 'শিবরাত্রির সলিতা' দৌহিত্র শ্রীমান নিতাই জেলেপাড়ায় তাহার প্রাতঃকালীন ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দত্তদের ছোট বাড়িতে দেখিল, যে, তাহার বন্ধু শ্রীচরণ তেল লঙ্কা লাউডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্ট সহযোগে একথালা মাড়ভাত উঠানে বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। সহসা লাউডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্টের প্রতি নিতাইয়ের দারুণ লোভ জন্মিল। সে দাঁড়াইয়া শ্রীচরণের আহার দেখিতেছে এমন সময় মুখ তুলিয়া শ্রীচরণ নিতাইকে দেখিল। পরক্ষণেই একগ্রাস ভাত শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া শ্রীচরণ কহিল—'তুই চোখ দিচ্ছিস নিতাই!'

নিতাই আহত হইল। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল—'আমার দিদিমা লাউঘণ্ট রাঁধে না বুঝি?' বলিয়াই নিতাই চলিয়া গেল।

বাড়িতে গিয়াই নিতাই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে কহিল—'আমাকে লাউঘণ্ট দিয়ে মাড়ভাত রেঁধে দে শিগ্‌গির দিদি মা!'

তখন বেলা এক প্রহর। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অলাবুর সন্ধানে বাহির হইলেন এবং দশবাড়ি ঘুরিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিলেন। নিতাই ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান করিয়া বাড়িতে ফিরিয়াই কহিল—'খিদে পেয়েছে ভাত দে শিগ্‌গির!' ভাতের থালার সম্মুখে বসিয়া নিতাই দেখিল লাউডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্ট নাই। তখন সে কাঁদিয়া কাটিয়া ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন—'এখনও লাউ হয়নি যে দাদু! আমি পাড়াময় খুঁজে এসেছি।' নিতাই কহিল—'তবে ছিচরণ খাচ্ছিল কি করে?'

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী সে সন্ধান জানিতেন, কহিলেন—'মহকুমার হাট থেকে কাল দত্ত বাড়ির বাবু আদালত ফেরতা কিনে এনেছে।' 'তবে তুইও সেখান থেকে কিনে আন্!' বলিয়া নিতাই হাত ধুইতে বসিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া নিতাইকে গুড় অম্বল মাখিয়া সে বেলার মত ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ভাত খাওয়াইলেন এবং সন্ধ্যাকালে গণেশ মাঝির হাতে একশত পৈতা দিয়া পরদিনের মহকুমার হাট হইতে লাউ কিনিয়া আনিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। গণেশ চারপয়সা পুরস্কারের লোভে যাত্রা করিল।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে এক শ' পৈতা বেচিয়া গণেশ একটি বৃহদাকার অলাবু লইয়া উপস্থিত হইল। রাত্রে খাইতে বসিয়া নিতাই কহিল—'এই যে লাউঘণ্ট! লাউডগা সিদ্ধ কৈ দিদিমা?'

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কহিলেন—'এখনও তো গাছ বড় হয়নি দাদু—এ পুরাণো গাছের লাউ। আসছে বছর বাড়িতে লাউডগা সিদ্ধ আর ঘণ্ট রেঁধে খাওয়াব, বুঝলি?'

নিতাই খুশি হইয়া আহার সমাপ্ত করিল।

পর বৎসর নিজের হাতে বাঁশের বাখারি করিয়া বেড়া দিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তিন রকম লাউয়ের বিচি পুঁতিলেন। চারা হইল। গাছ তিনটি যখন দাঁড়া আশ্রয় করিয়া মাচার দিকে উঠিয়াছে সেই সময় হঠাৎ একদিন নিতাইয়ের পিতামহের মাসতুত ভাই পাশের গ্রামে জমিদারী পরিদর্শনের অবকাশে আত্মীয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে দেখিতে আসিলেন। নিতাই তখন পাড়ার সকল বাড়ি হইতে লক্ষ্মীপূজার ভুজা সংগ্রহ করিয়া আঙিনার আমতলায় পা' ছড়াইয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে চর্বণ করিতেছিল। মাসতুত ভ্রাতার কুলপ্রদীপকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আগন্তুক রোহিণী বাবু ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে তাহার সম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রীমান্ নিতাইচরণের তখনও পুরাপুরি অক্ষর পরিচয় হয় নাই। দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া রোহিণীবাবু তাঁহার কলিকাতার বাড়িতে নিতাইকে রাখিয়া পড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অকস্মাৎ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন কিন্তু নিতাইয়ের হাকিম হইবার কল্পনায় আর রোহিণীবাবুর প্রস্তাবে বাধা দিলেন না।

কাজেই নিতাই কলিকাতায় গেল। গত বৎসর যখন লাউমাচা সবুজ লতায় আর সাদা ফুলে ভরিয়া গেল তখন ষষ্ঠী ঠাকুরাণী একবার অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, 'পোড়ার মুখো গাছের কপালে খ্যাংরা মারি—মরেও না ছাই!' কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাত সহিয়াও গাছ মরিল না, ফলও হইল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তখন একদিন আমূল গাছ তিনটিকে ছেদন করিয়া লাউ আর লাউডগাগুলি প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলাইয়া কাঁথা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

গত বৎসর পড়াশুনায় ক্ষতি হইবে বলিয়া রোহিণীবাবু নিতাইকে বাড়ি পাঠান নাই—এবার পৌষে বড়দিনের ছুটিতে নিতাই বাড়ি আসিবে এই কথা ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে জানাইয়াছেন।

এই সংবাদ পাইবামাত্র ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কলুবাড়ি হইতে ভাল লাউয়ের বিচি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং নিজ হাতে বিচি পুঁতিয়া বেড়া দিয়া পূর্ব বৎসরের মত একগণ্ডা হাঁড়িতে কালি-চুন মাখাইয়া লাউগাছের রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে ঠাকুরাণী সন্ধ্যায় পল্লীভ্রমণে বাহির হইতেন কিন্তু লাউচারা দাঁড়া বাহিয়া উঠিবার পর হইতেই সে অভ্যাস ত্যাগ

করিয়া মাচার নীচে মাদুর বিছাইয়া সন্ধ্যাকালটি পৈতা কাটিবার কাজে সেইখানেই ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রকম একটি দিনে বদন ঘোষের পাঁঠা কেলো এই লাউ গাছে দন্তবেধ করিবার অপরাধে ঠাকুরাণীর লগুড়াহত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল।

বদন ঘোষকে তিরস্কার করিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বিদায় করিয়া দিলেন বটে কিন্তু সমস্ত দিন পাঁঠাটির আর্তনাদ তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল। শেষে সন্ধ্যাকালে ছিদাম মুদীর দোকানে দুইটি কলসী বাঁধা দিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী গুটিতিনেক টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং বদনের ছেলের হাতে টাকা তিনটি গুঁজিয়া দিয়া জীবহিংসা জনিত অনুতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। কেলোর ভবিষ্যৎ উৎপাত হইতে লাউগাছকয়টি অব্যাহতি লাভ করিল ভাবিয়া একটু আনন্দ না হইল তাহাও নহে।

শেষে গত বৎসরের মত এবারও লাউমাচা সাদা ফুলে ভরিয়া উঠিল—তাহার পর ফল। নিতাই বাড়ি আসিলে যে লাউটি ষষ্ঠী ঠাকুরাণী আগে কাটিবেন তাহাতে একটি চুনের ফোঁটা দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন।

* * * *

দেড় বৎসর পর নিতাই বাড়ি আসিয়াছে।

খাইতে বসিয়া নিতাই তাহার থালার পার্শ্বে স্তূপীকৃত সিদ্ধ লাউডগার উপর অঙ্গুলি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এগুলো কি রেঁধেছ দিদিমা?'

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী পরম উৎসাহের সঙ্গে হাসিয়া কহিলেন—'তোর লাউডগা সেদ্ধ রে দাদু! বাড়ির গাছের—'

নিতাই বাধা দিয়া কহিল—'তুলে নে, ও সব জঙ্গল আমরা কলকাতায় খাইনে। দু'বেলা আলু পটলের ডালনা—মুড়িঘণ্ট—'

অকস্মাৎ ষষ্ঠী ঠাকুরাণী উঠিয়া গেলেন দেখিয়া আর নিতাই আহারের পুরা ফর্দটি তাহার দিদিমাকে শুনাইতে পারিল না।

আহারান্তে হাত ধুইতে বসিয়া নিতাই দেখিল ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ভোঁতা বঁটিখানা দিয়া লাউ-মাচার নীচে দাঁড়াইয়া গাছের গোড়ায় ক্রমাগত আঘাত করিতেছেন। পকেট হইতে জাপানী সিল্কের রুমালখানা বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে নিতাই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া কহিল—'ও কি কচ্ছিস দিদিমা?'

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মুখ না ফিরাইয়াই কহিলেন—'জঞ্জাল রে জঞ্জাল! বাড়িটা একেবারে এঁদো ক'রে দিয়েছে।'

'তাই ভর দুপুর বেলা বাড়ি সাফ কচ্ছিস!' বলিয়া নিতাই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ফিরিয়াও চাহিলেন না।

দেবতার জন্ম

শিবরাম চক্রবর্তী

শিবরাম চক্রবর্তী—জন্ম ১৯০৫ কলকাতা। জন্ম কলকাতা হ'লেও শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাড়াগাঁয়ে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের সূত্রপাতেই, পনেরো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময়, কংগ্রেসের কাজে, দেশের দরিদ্র চাষীমজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ভাবে মেশবার সুযোগ পান, এবং দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ একাধিকবার কারাবরণ করেন,—তারই ফলে মানুষকে ও জীবনকে দেখবার ও দেখাবার স্বকীয় এক বিশিষ্ট ভঙ্গি লাভ করেন। —যার পরিচয় তাঁর পবরর্তী সমস্ত রচনায়, বিশেষ ক'রে নাটকে ও প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এঁর স্বভাবে ও সাহিত্যে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও গোড়াপত্তন হয় এই সময়।

শিবরামের লেখায় প্রায় সবই ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসপ্রধান, কিন্তু এঁর লেখার আসল কৃতিত্ব বড়োদের জিনিস ছোটদের মতো ক'রে এবং ছোটদের জিনিস বড়োদের মতো ক'রে, লেখার কৌশলে—এমনভাবে ইনি একাধারে দিতে পারেন যে রচনার রস সব স্তরের পাঠক পাঠিকারই সমান উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে; এঁর নিজের মতে, সমস্তটাই উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দিতে কারোই বিশেষ কোনো বাধা হয় না। বই লিখেছেন ইনি অনেক তার মধ্যে কএকটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র সহযোগে ছোটগল্প—প্রজাপতির পক্ষপাত। স্বকীয় রচনা ছোটদের গল্প—বাড়ি থেকে পালিয়ে, কালান্তক লাল ফিতা। প্রবন্ধ—আজ এবং আগামী কাল। নাটক—চাকার নিচে, যখন তারা কথা বলবে। কবিতা—চুম্বন, মানুষ।

দেবতার জন্ম

বাড়ি থেকে বেরুতে প্রায়ই হোঁচট খাই। প্রথম পদক্ষেপেই পাথরটা তার অস্তিত্বের কথা প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কদিন থেকেই ভাবছি কি করা যায়।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার আমার কিছুমাত্র ব্যস্ততা ছিল না, অন্তত অমন ক্ষিপ্রভাবে অকস্মাৎ ধাবিত হব এমন অভিপ্রায় ছিলনা আদৌ, কিন্তু পাথরটার সংঘর্ষ আমার গতিবেগকে সহসা এত দ্রুত ক'রে দিল যে অন্যদিক থেকে মোটর আসছে দেখেও আত্মসম্বরণ ক'রতে অক্ষম হলুম। কিন্তু কি ভাগ্যি, ড্রাইভারটা ছিল হুঁসিয়ার—তাই রক্ষে!

সেদিন থেকেই ভাবছি কি করা যায়। আমার জীবন-পথের মাঝখানে সামান্য একটুকরো পাথর যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দেবে কোনোদিন এরূপ কল্পনা করিনি। তাছাড়া ক্রমশই এটা জীবনমরণের সমস্যা হ'য়ে উঠছে, কেননা ধাবমান মোটর চিরদিনই কিছু আমার পদস্খলনকে মার্জনার চোখে দেখবে এমন আমি আশা ক'রতে পারি না।

তাই ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হোক, হয় ও থাকুক নয় আমি। ও থাকলে আমি বেশিদিন থাকব কিনা সন্দেহস্থল। তাই যখন আমার থাকাটাই, অন্তত আমার দিক থেকে, বেশি বাঞ্ছনীয় তখন একদা প্রাতঃকালে একটা কোদাল জোগাড় ক'রে লেগে প'ড়তে হোলো।

একটা বড় গোছের নুড়ি, ওর সামান্য অংশই রাস্তার ওপর মাথা উঁচু ক'রে ছিল। বহুক্ষণ পরিশ্রমের পর যখন সমূলে ওটাকে উৎপাটন ক'রতে পেরেছি, তখন মাথার ঘাম মুছে দেখি আমার চারিদিকে রীতিমত জনতা। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ এঁদেরই নীরব ও সরব সহানুভূতি আমার উদ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করছিল।

তাঁদের সকলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কেউ চান এই পাথরটা?

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কারু ঔৎসুক্য আছে কি নেই বোঝা গেল না। তাই আবার ঘোষণা করলাম—যদি দরকার থাকে নিতে পারেন। অনায়াসেই নিতে পারেন। আমার শ্রম তা হ'লে সার্থক বিবেচনা ক'রব এবং বলা বাহুল্য আমি সুখী হব।

জনতার এক তরফ থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—এটা খুঁড়্‌ছিলেন কেন? কোনো স্বপ্ন পেয়েছেন নাকি?

আমি লোকটার দিকে ঈষৎ তাকালাম, তারপর ঘাড় নেড়ে বললাম—না, যা ভাবছেন তা নয়।

পাথরটাকে রাস্তার এক নিরাপদ কোণে স্থাপিত করলাম। কিন্তু আমার কথায় ওর যেন প্রত্যয় হোলো না, কয়েকবার আপনমনে মাথা নেড়ে সে আবার প্রশ্ন ক'রলে—সত্যি বলছেন পান্ নি? কোনো প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ?

—কিচ্ছু না!

ভদ্রলোকের উৎসাহকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে ওপরে এসে মাকে বল্‌লাম দুকাপ চা তৈরি ক'রতে। আমার জন্যই দু' কাপ্। পাথরটার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে প্রায় প্রস্তরিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম, বেশ পরিশ্রম হয়েছিল।

এরপর প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরুতে ও বেরিয়ে ফিরতে নুড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, অনেক সময় হয়ও না, যখন অন্যমনস্ক থাকি। এখন ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে মার্জনা ক'রতে পেরেছি, কেননা আমাকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা ওর আর নেই। সে-দৈবশক্তি ওর লোপ পেয়েছে। আমাদের মধ্যে একরকম হৃদ্যতা জন্মেছে এখন বলা যেতে পারে। এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন দেখলাম নুড়িটার কান্তি ফিরেছে, ধূলোবালি মুছে গিয়ে দিব্য চাকচিক্য দেখা দিয়েছে। যারা সকালে বিকালে হোস্ পাইপে রাস্তায় জল ছিটোয়, বোঝা গেল, তাদেরই কারু শুভদৃষ্টি এর ওপর পড়েছিল। ওর চেহারার উন্নতি দেখে সুখী হলাম।

—ব্যাপার কি রকম বুঝচেন্?

হঠাৎ পেছন থেকে প্রশ্নাহত হ'য়ে ফিরে তাকালাম। সেদিনের সেই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সেই থেকেই এখানে পাহারা দিচ্ছেন নাকি? না, কোনো প্রত্যাদেশ পেলেন?

—না না, তা কেন? এই পথেই আমার যাতায়াত কিনা!

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারেন।

—নুড়িটা দেখছি আছে ঠিক। কেউ নেবে না কি বলেন?

প্রশ্নটা এইভাবে ক'রলে যেন যে-রকম দামী জিনিসটা পথে পড়ে আছে অমন আর জুভারতে পাওয়া যায় না এবং ওর গুপ্তশত্রুর দল ওটাকে আত্মসাৎ করবার মৎলবে ঘোরতর

ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ; ছোঁ মেরে লুফে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে লোলুপ হ'য়ে রয়েছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম—আপনার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী, সরকার বাহাদুর তাদের ভুল বুঝে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে রাঁচীর অতিথশালায় সযত্নে রেখে দিয়েছেন, একমাত্র আপনিই যখন ছাড়া আছেন তখন তো ভাবার কিছু দেখিনে।

সে একটু হেসে বল্‌ল—আপনার যেমন কথা! দেখছেন এদিকে কারা ওর পূজার্চনা ক'রে গেছে?

ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করি—সত্যিই তো! ওবেলা তো দেখিনি, এবেলার মধ্যেই কারা এসে পাথরটার সর্বাঙ্গে বেশ ক'রে সিঁদুর লেপে দিয়ে গেছে।

আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম—ভালোই হয়েছে! এতদিনে তবু ওর আরেকটি সমঝদার জুটল!

পাথরটার সমাদরে পুলকিত হবার কথা, কিন্তু লোকটিকে বেশ ঈর্ষান্বিত দেখা গেল। কপাল কুঁচকে সে বললে—সেই তো ভয়! সেই সমঝদার না ইতিমধ্যে ওটিকে সরিয়ে ফ্যালে!

পরদিন সকালে উঠে দেখি কোথাও পাথরটার চিহ্নমাত্র নেই। ওর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য হলাম খুব। কে ওটাকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের অভাবিত উদয় হোলো কিন্তু কোনো সঠিক সদুত্তর পাওয়া গেল না। পাথরটার অনুপস্থিতিতে এই পথ দিয়ে হরদম্ যাতায়াতকারী সেই লোকটি যে বেজায় রকম দ'মে যাবে অনুমান করা কঠিন নয়। একথা ভেবে লোকটার জন্য সহানুভূতিই হোলো ; কিম্বা—এ সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই কাজ কিনা কে জানে!

অনেকদিন পরে গলির মোড়ের অশথতলা দিয়ে আসছি—ও হরি! এখানে নুড়িটাকে নিয়ে এসেছে যে! নুড়ির স্থূল অঙ্গটা গাছের গোড়ায় এমন ভাবে পুঁতেছে যে উপরের গোলাকার নিটোল মসৃণ উদ্ধত অংশ দেখে শিবলিঙ্গ ব'লে ওকে সন্দেহ হ'তে পারে। এই প্রয়োগ-নৈপুণ্য যার তাকে বাহাদুরি দিতে হবে। নুড়িটার চারিদিকে ফুল বেলপাতা আতপচালের ছড়াছড়ি। সকালের দিকে এই পথে যে সব পুণ্যলোভী গঙ্গাস্নানে যায় তারাই ফেরার পথে সস্তায় পারলৌকিক পাথেয়-সঞ্চয়ের সুবর্ণসুযোগরূপে একে গ্রহণ করেছে সহজেই বোঝা গেল। যাই হোক্ মহাসমারোহেই এখানে ইনি বিরাজ করছেন—অতঃপর এঁর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারু দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ নেই।

নুড়িটার পদোন্নতিতে আমি আন্তরিক খুশি হলাম। আমিই একদিন ওকে মুক্তি দিয়েছি, এখন সবাইকে ও মুক্তি বিতরণ ক'রতে থাক্,—ওর গৌরব সে-তো আমারই গৌরব। পৃথিবীর বুকে ওর জন্মদাতা আমি, এইজন্য মনে মনে পিতৃত্বের একটা গর্ব অনুভব করলাম। এবং কায়মনোবাক্যে ওকে আশীর্বাদ করলাম।

সেই লোকটাকে তার দেবতার সন্ধান দেব কিনা মাঝে মাঝে ভেবেছি। পথে ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু পাথরটার কথা ও আর পাড়ে না। পাথরটার পলায়নে ভেবেছিলাম

ও মুহ্যমান হ'য়ে পড়্‌বে, কিন্তু ওকে বরং প্রফুল্লই দেখেছি। এত বড় একটা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন ও কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছে তখন আর ওকে উতলা ক'রে কাজ নেই।

মাঝে মাঝে অশথতলার পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরি, লক্ষ্য করি, দিন দিন নুড়িটার মর্যাদা বাড়ছে। একদিন দেখলাম গোটাকত সন্ন্যাসী ওখানে আস্তানা গেড়েছে, গাঁজার গন্ধ এবং বম্‌বম্‌ শব্দের ঠেলায় ওখান দিয়ে যাতায়াত ঘ্রাণ এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের ওপরে দস্তুরমত অত্যাচার। যখন সন্ন্যাসী জুটেছে তখন ভক্ত জুটতে দেরি হবে না এবং ভক্তির আতিশয্য অনতিবিলম্বেই ইট-কাঠের মূর্তি নিয়ে মন্দিররূপে অভ্রভেদী হ'য়ে দেখা দেবে। দেবতা তখন বিশেষভাবে বনেদী হবেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী হ'য়ে দাঁড়াবে।

এর কিছুদিন পরেই একটা চিনির কলের ব্যাপারে কয়েক মাসের জন্য আমাকে চাম্পারণ যেতে হ'ল। অশথতলার পাশ দিয়ে গেলেও চলে, ভাবলাম যাবার আগে দেবতার অবস্থাটা দেখে যাই। যা অনুমান করেছিলাম ঠিক তাই, সন্ন্যাসীর সমাগমে ভক্তের সমারোহ হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ আলোচনা অনুসরণে যা বুঝলাম তার মর্ম এই যে ইনি হচ্ছেন ত্রিলোকেশ্বর শিব, একেবারে পাতাল ফুঁড়ে উঠেচেন—এঁর তল নেই। অতএব এঁর উপযুক্ত সম্বর্ধনা ক'রতে হ'লে একটা মন্দির খাড়া করা চাই।

একবার বাসনা হোলো, ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস সবাইকে ডেকে ব'লে দিই কিন্তু জীবন-বীমা করা ছিল-না এবং ভক্তি কতটা ভয়াবহ হ'তে পারে জানতাম আর তা ছাড়া ট্রেণের বিলম্বও রেশি নেই—ইত্যাদি বিবেচনা ক'রে নিরস্ত হলাম। সেই লোকটাকে খবর না দিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি, কেননা যতদূর ধারণা হয়, নুড়িটাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করাই তার স্বচেষ্টায় অভিরুচি ছিল কিন্তু ইনি যে ভক্তের তোয়াক্কা না রেখেই স্বকীয় প্রতিভাবলে এবং ইতিমধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, এই সংবাদে সে পুলকিত কিম্বা মর্মাহত কি হ'ত বলা কঠিন।

কয়েক মাস পরে যখন ফিরলাম তখন অশথতলার মোড়কে আর চেনাই যায় না। ছোটখাট একটা মন্দির উঠেছে, শঙ্খ ঘণ্টার আর্তনাদে কানপাতা দায় এবং ভক্তের ভিড় ঠেলে চলা দুষ্কর। কিন্তু সে কথা বল্‌ছি না, সব চেয়ে বিস্মিত হলাম সেই সঙ্গে আরেক জনের আবির্ভাব, কেবলমাত্র আবির্ভাব নয়, কলেবর পরিবর্তন পর্যন্ত দেখে! মন্দিরের চত্বরে সেই লোকটা—প্রথমতম, সেই আদি ও অকৃত্রিম উপাসক! গেরুয়া, তিলক এবং রুদ্রাক্ষের অন্তরালে তাকে আর চেনাই যায় না!

—একি ব্যাপার?

আমিই গায়ে প'ড়ে প্রশ্ন করি।

—আজ্ঞে এই দীনই শিবের সেবায়েৎ।

লোকটি বিনীত ভাবে জবাব দেয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দিব্যি বিনিপুঁজির ব্যবসা ফাঁদা হয়েছে! এই জন্যেই বুঝি পাথরটার ওপর অত ক'রে নজর রাখা হচ্ছিল?

শিলাখণ্ডের প্রতি ওর প্রীতি-শীলতা যে অহেতুক এবং একেবারেই নিস্বার্থ ছিল না, এইটা জেনেই বোধকরি অকস্মাৎ ওর ওপর দারুণ রাগ হ'য়ে যায়, ভারি রূঢ় হ'য়ে পড়ি।

কানে আঙুল দিয়ে সে বল্‌ল—অমন বল্‌বেন না। পাথর কি মশাই? শ্রীবিষ্ণু! সাক্ষাৎ দেবতা যে! ত্রিলোকেশ্বর শিব!

সে উদ্দেশে নমস্কার জানায়।

আমি হেসে ফেল্‌লাম—ওর তল নেই, না?

এবার সে একটু কুণ্ঠিত হয়—সবাই তো বলে।

—তুমি নিজে কি বলো? ওরা তো বলে নিচে যত খুঁড়ে যাও না কেন টিউব-কলের মত ওই শিবলিঙ্গ বরাবর নেমে গেছে। কিন্তু তোমার কি মনে হয়?

—কি জানি! তাই হয়তো হবে।

—কতদূর শিকড় নেবেছে খুঁড়ে দেখই না কেন একদিন?

জিভ্ কেটে লোকটা বল্‌ল—ওসব কথা কেন? ওতে অপরাধ হয়। বাবা আমাদের জাগ্রত।

—বটে? কিরকম জাগ্রত শুনি?

—এই ধরুন না কেন! এবার তো কলকাতায় দারুণ বসন্ত, টীকে নিয়ে কিছু ক'রেই কিছু হচ্ছে না—

—য়্যাঁ, বল কি? মহামারী না কি, জানতাম না তো!

—খবরের কাগজেই দেখবেন কিরকম লোক মরছে। কর্পোরেশন থেকে টীকে দেবার ত্রুটি নেই অথচ প্রত্যেক ওয়ার্ডেই—। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ-পর্যন্ত কারু হয়নি দেবতার কৃপায়, আমরা কেউ টীকেও নিইনি কেবল বাবার চন্নামৃত খেয়েছি। এ যদি জাগ্রত না হয় তবে জাগ্রত আপনি কাকে বলেন?

এর কি জবাব দেব তা চিন্তা করবার সময় ছিল না। আগে একবার এই রোগে যা কষ্ট পেয়েছিলাম এবং যা ক'রে বেঁচেছিলাম তাতে বাবা ত্রিলোকনাথের মহিমার ব্যাখ্যা তখন আমার মাথায় উঠেছে। "—আমি এখন চললুম। আমাকে এক্ষুনি টীকে নিতে হবে। আরেকদিন এসে গল্প ক'রব।" ব'লে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে মেডিকেল কলেজের অভিমুখে ধাবিত হলাম।

পথে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গতিরোধ ক'রে সে বল্‌ল—আরে, কোথায় চলেছ এমন হন্তে হ'য়ে?

—টীকে নিতে।

—টীকে নিয়ে তো ছাই হচ্ছে। টীকেতে কিস্সু হয় না। তুমি বরং veriolinum 200 এক

ডোজ্ খাও গে, কিং কোম্পানি থেকে। পরের হপ্তায় আরেক ডোজ্, তারপরে আরেক—বাস, নিশ্চিন্দি। টীকে ফেল্ করেছে আক্চার দেখা যায়, কিন্তু ভেরিওলিনাম্—নেভার্!

—বল কি? জানতাম না তো।

—জানবে কোত্থেকে? কেবল ফোঁড়াফুঁড়ি এই তো জেনেছ! অন্য কিছুতে কি আর তোমাদের বিশ্বাস আছে? আমি হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্টিশ্ ধরেছি, আমি জানি।

—বেশ তাই খাচ্ছি তবে।

কিং কোম্পানিতে গিয়ে এক ডোজ্ দু'শ শক্তি ভেরিওলিনাম্ গলাধঃকরণ করলাম। যাক, এতক্ষণে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া গেল।

একটু পরেই পথ দিয়ে উপরোউপরি কয়েকটা শবযাত্রা গেল—নিশ্চয়ই এরা বসন্ত রোগেই মরেছে? কি সর্বনাশ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, ওদের থেকে এইভাবে কত লক্ষ লক্ষই না বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ভেরিওলিনাম্ রক্তে পৌছতে না পৌছতেই এতক্ষণে এই সব মারাত্মক রোগাণুর কাজ সুরু হ'য়ে গেছে নিশ্চয়! হাত পা শিটিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হ'য়ে এল—এই বিপদ-সংকুল বাতাসের নিশ্বাস নিতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল।

অতি সংক্ষিপ্ত এক টুক্রো প্রাচীরপত্রে প্রসিদ্ধ বসন্ত চিকিৎসক কে-এক কবিরাজের নাম দেখলাম। হোমিওপ্যাথি করা গেছে, কবিরাজিই বা বাকি থাকে কেন—যে-উপায়েই হোক সবার আগে আত্মরক্ষা। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পৌছতেই দেখলাম কয়েকজনে মিলে খুব ধুমধাম সহকারে একটা প্রকাণ্ড শিলে কি যেন বাঁটছে। কবিরাজকে আমার অবস্থা বলতেই তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই যে বাঁটা হচ্ছে। কণ্টিকারির শেকড়—বেঁটে খেতে হয়। ওর মত বসন্তের অব্যর্থ প্রতিষেধক আর নেই মশাই!

ব্যবস্থামত তাই একতাল খেয়ে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসলাম। শরীরে যেন জো পাচ্ছিলাম না, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল, জ্বর জ্বর ভাব—বসন্ত হবার আগে নাকি এই রকমই হয়। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম—আজ আর কিছু খাব না, মা। দেহটা ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে মা বললেন—কি হয়েছে তোর?

—হয়নি কিছু। বোধ হয় হবে! বসন্ত।

—বালাই ষাট্। তা কেন হ'তে যাবে? এই হর্তুকির টুকরোটা হাতে বাঁধ দিখি। আমি তিরিশ বছর বাঁধছি, কত বসন্ত রোগীই তো সেবা করলাম, এরই জোরে বল্তে নেই হাম পর্যন্ত—। নে ধর্ এটা তুই।

মা তাঁর হাতের তাগাটা খুলে দিলেন।

—তিরিশ বছরে একবারো হয়নি তোমার? বলো কি? দাও দাও তবে। এতক্ষণ বলোনি কেন? এই এক টুক্রোয় কি হবে? রোগ যে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আমাকে আস্ত একটা হর্তুকি দাও যদি তাতে আট্কায়।

হর্তুকি তো বাঁধলুম, কিন্তু বিকালের দিকে শরীরটা বেশ যেন জ্বরজড়িত মনে হোলো। আয়না নিয়ে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলাম, মুখেও যেন দু'একটা ফুস্কুড়ির মত দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই বসন্ত, আর তবে বাঁচন নেই। মাকে ডেকে দেখালাম।

মা বললেন—মার অনুগ্রহ না, ও ব্রণ।

আমি বললাম—উঁহুঁ। ব্রণ নয়, নিতান্তই মা'র অনুগ্রহ!

মা বললেন—অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস্ নে। ও কিছু না, সমস্তদিন ঘরে ব'সে আছিস্ একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয় গে।

এ রকম দারুণ ভাবনা মাথায় নিয়ে কি বেড়াতে ভালো লাগে? লোকটা বলছিল ওরা সবাই চরণামৃত খেয়ে নিরাপদ রয়েছে। আমিও তাই খাব নাকি? হয়তো চরণামৃতের বীজাণু-ধ্বংসক কোনো ক্ষমতা আছে, কে বলতে পারে? হ্যাঁঃ, ওর যেমন কথা! ওটা স্রেফ্ য়্যাক্সিডেন্ট—কলকাতার সব বাড়িতেই কিছু আর অসুখ হচ্ছে না! তাছাড়া মনের জোরে রোগ-প্রতিরোধের শক্তি জন্মায় সেটাও ওদের পক্ষে একটা সহায়—কিন্তু ওই যৎসামান্য পাথরটাকে দেবতাজ্ঞান করবার বিশ্বাসের জোর আমি পাব কোথায়?

এ সব যা-তা ব্যবস্থা না ক'রে সকালে টীকে নেওয়াই উচিত ছিল, হয়তো তাতে আট্‌কাত। এখুনি গিয়ে টীকেটা নিয়ে ফেলব নাকি? টীকে নিলে শুনেছি বসন্ত মারাত্মক হয় না, বড় জোর হাম হ'য়ে দাঁড়ায়, আর হামে তেমন ভয়ের কিছু নেই—ওতো শিশুদের হামেসাই হচ্ছে। নাঃ, যাই মেডিকেল কলেজের দিকেই।

টীকে নিয়ে অশথতলার পাশ দিয়ে ফিরতে লোকটার সকালবেলার কথাগুলো মনে পড়ল। ঠিকই বলেছে সে! সত্যিই এক জায়গায় গিয়ে আর কোনো জবাব নেই, সেখানে রহস্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। এই তো আজ বেঁচে আছি, কিন্তু কাল যদি বসন্তে মারা যাই তখন কোথায় যাব? শেকস্‌পীয়ারের সেই কথাটা—না, একেবারে কল্পনা নয়। এই পৃথিবীর, এই জীবনের, সুদূর নক্ষত্রলোক এবং তার বাইরেও বিস্তৃত অনন্ত জগতের কতটুকুই জানি আমরা? কটা ব্যাপারেরই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারি? যতই বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ি না কেন, শেষে সেই অজ্ঞাতের সীমান্তে এসে চুপ ক'রে দাঁড়াতেই হয়।

মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে আসতে ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে দণ্ডবৎ জানালাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, বাবা, আমার মূঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এ যাত্রা।

খানিক দূর এগিয়ে এসে আবার ফিরলাম। নাঃ, দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া কিছু নয়। মুখের ফুস্কুড়িগুলো হাত দিয়ে অনুভব করলাম।—এগুলো ব্রণ, না বসন্ত?

এবার মাটিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম—জয় বাবা ত্রিলোকনাথ! রক্ষা কর বাবা!

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম কেউ দেখতে পায়নি তো?

পুষি

ও

সমাপ্তি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৩০৭ বর্দ্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামে। পৈতৃকবাস বীরভূম জেলার রূপসীপুর গ্রামে। "কল্লোল" ও "কালি কলম" পত্রিকার সঙ্গে প্রথম থেকেই বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রথম প্রকাশিত বই উপন্যাস—"ঝড়ো-হাওয়া"। বর্তমানে আছেন কলকাতায়।

শৈলজানন্দের সাহিত্যের আসল পরিচয় পূর্বেই দেয়া হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। বাল্য কৌশোর ও যৌবনের প্রারম্ভকাল কেটেছে পল্লীগ্রামে,—বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে। সমাজ ও সাহিত্যের উপেক্ষিত বাংলার অনগ্রসর পল্লীসমাজের অন্তস্তলে, যেথানে অজ্ঞ দরিদ্র অসহায় নরনারী যুগ যুগ ধ'রে সমাজের নানা অবিচারে অত্যাচারে উৎপীড়িত জর্জরিত,—মৃত্যুর দিকে তিলে তিলে এগিয়ে যেতে যেতে ঈশ্বরের কাছে অসহায় প্রার্থনা জানায়, চীৎকার ক'রে কাঁদে, তাদের সঙ্গে ইনি আবাল্য পরিচিত। তাই দরিদ্র পল্লীবাসীকে অনাত্মীয় দর্শকের চোখে দেখতে পারেন নি—দেখেছিলেন একান্ত নিকট আত্মীয়ের মতো, দরদীর চোখে। দরিদ্র পল্লীবাসী, অরণ্যচারী সাঁওতাল এবং কয়লা কুঠির কুলী মজুরদের কথা লিখে ইনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আর একটি কথা, শৈলজানন্দের গল্পগুলি সাধারণত দীর্ঘতর। এ রকম দীর্ঘ ছোট গল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক আছে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে শৈলজানন্দ যেমন দীর্ঘ ছোট গল্পের নিখুঁত ও বাস্তব রূপ দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন অতি ছোট গল্পেও অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয়। ছোট গল্প যে কেবল ছোটই হবে এমন কোনো কথা নয়; যেমন একেকটি বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিতে মাত্র একটি দিক—একটি দৃশ্য পাওয়া যায়, তেমনি একেকটি ছোট গল্পে মাত্র একটি রূপ—একটি ভাবকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর কাজ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দই সবচেয়ে বেশি গল্প উপন্যাস লিখেছেন। এঁর শ্রেষ্ঠ বইয়ের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—মহাযুদ্ধের ইতিহাস, অভিশাপ, নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী, অনাথআশ্রম, হোমানল, সহ প্রনাম।
গল্প—অতসী, নারীমেধ, মারণমন্ত্র, নন্দিনী, বধূবরণ, দিন-মজুর।

পুষি

বাড়িতে ভীষণ ইঁদুরের উপদ্রব সুরু হইয়াছে।

এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া আমার উপর গৃহিণীর উপদ্রবটাও বড় কম নয়। অপরাধ যেন আমারই। সময় নাই অসময় নাই, চামুণ্ডামূর্তিতে গিন্নি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

'বলি—এর একটা কিছু প্রতিবিধান ক'রবে, না, মরব গলায় দড়ি দিয়ে?'

বলিলাম, 'বাড়িটা তা হ'লে ছেড়ে দিতে হয়। তাছাড়া আমি আর কি ক'রতে পারি বল?'

গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'হ্যাঁ, তা ছাড়বে বই কি! পাড়াটি আমার ভাল লেগেছে কিনা, গল্প করবার দু'চার জন সঙ্গী পেয়েছি, তা তোমার সইবে কেন?'

সর্বনাশ! 'তা হ'লে কি ক'রতে হবে, বল!'

'কেন?' কলকাতা শহর তো দু'বেলা চ'ষে বেড়াচ্ছ, ফেরবার পথে ইঁদুর-মারা-কল একটা হাতে ঝুলিয়ে আনতে পারো না?'

পরদিন সব কাজ ফেলিয়া ভাল দেখিয়া একটি ইঁদুর-মারা-কল কিনিয়া আনিলাম। খাস জার্মেনির তৈরি। দোকানদার ভাল করিয়া দেখাইয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া দিল।

'মনে করুন এইটে ইঁদুর, আর এইখানে রইলো খাবার।' বলিয়া তাহার হাতের যে পেন্সিলটিকে আমি ইঁদুর মনে করিতেছিলাম সেই পেন্সিলটি কলের উপর ছোঁয়াইতে-না-ছোঁয়াইতেই ঝপাং করিয়া স্প্রিংএর কল ডিগ্‌বাজী খাইয়া উল্‌টাইয়া পড়িল।

পেন্সিলটা কিছুতেই আর ছাড়াইতে পারি না।

দোকানদার বলিল, 'যত বড় ইঁদুর হোক্‌, বাছাধন আর টুঁ শব্দটি ক'রতে পারবে না। নিয়ে যান।'

খুশি হইয়া কল লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

মহা উৎসাহে অতি সাবধানে কলের উপর খাবার দিয়া সেই রাত্রেই রান্নাঘরে কলটি পাতিয়া রাখিলাম।

বলিলাম, 'এইবার হ'লো তো?'

স্ত্রী বলিলেন, 'কিন্তু শব্দ হ'লেই উঠো যেন। যেটা মরবে সেটাকে ফেলে দিয়ে আবার পেতে দিতে হবে। আমি ছুঁতে-টুঁতে পারব না। আমার ভয় করে।'

বলিলাম, 'বেশ।'

কিন্তু ইঁদুরের শব্দ শুনিতে গিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুম আর হইল না। কোথাও টুক্ করিয়া একটুখানি শব্দ হয় আর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই। ছুটিয়া গিয়া দেখি—কোথায় ইঁদুর! কল ঠিক যেমনটি পাতিয়া রাখিয়াছি তেমনই আছে, ইঁদুর তখনও পড়ে নাই।

সকালে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, ইঁদুরে জিনিস-পত্র আগেকার মতই সেদিনও তচ্‌নচ্ করিয়া দিয়া গেছে, অথচ কলের ধার দিয়াও তাহারা হাঁটে নাই।

স্ত্রী বলিল, 'না তোমার ও কলে হবে না। শহুরে ইঁদুর কিনা, ভারি চালাক। আমাদের পাড়াগাঁয়ের বোকা ইঁদুর হ'তো তো মরতো। তার চেয়ে এক কাজ কর। একটি বেরাল নিয়ে এসো। বাড়িতে পুষি।'

সেই ভাল।

সেই দিন হইতে বিড়ালের সন্ধানে ঘুরিতে থাকি। রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাই, বিড়াল দেখি আর থমকিয়া দাঁড়াই। কিন্তু ধরিতে গেলেই ছুটিয়া পালায়। ও-সব ধাড়ি বিড়ালে চলিবে না, ছোট একটি বাচ্চা বিড়ালই পুষিতে হইবে। কিন্তু বাচ্চা পাই কোথায়?

কপাল ভাল। সুতরাং বিড়াল মিলিতেও বিলম্ব হইল না। সেদিন ট্রাম হইতে দেখিলাম সাদা রঙের এতটুকু একটি বিড়ালের বাচ্চা রাস্তার ধারে ডাস্ট-বিনের পাশে কুঁই-কুঁই করিয়া বোধ করি আহারের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ট্রাম হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া এই বেওয়ারিশ্ বিড়ালের বাচ্চাটিকে কোলে তুলিয়া বাড়ি লইয়া আসিলাম।

বিড়াল ছানাটি আমার বাড়িতে থাকিয়া মানুষ হইতে লাগিল। দুধ খাওয়াই, মাছ খাওয়াই, মিউ-মিউ করিয়া এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করে। কাহারও সঙ্গে হয়তো বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি—বিড়ালছানাটি কোথা হইতে আসিয়া ধীরে-ধীরে আমার কোলের উপর উঠিয়া বসিল, রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বিড়ালটি আমার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া আছে।

মন্দ লাগে না। বিড়ালটিকে বোধ হয় ভালবাসিয়া ফেলিতেছি। বাড়িতে ছেলেপুলে নাই। পাশের বাড়ির বৌটা সেদিন জানালায় দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে আমার স্ত্রীকে বলিতেছে শুনিলাম—'ছেলেপুলে হ'লো না ব'লে শেষে বেরাল পুষলেন নাকি?'

ভাবিলাম, বলুক। আহা, বেচারা খাইতে না পাইয়া কোথায় এতদিন হয়তো—রাস্তা পার হইতে গিয়া ট্রাম-বাসের নীচে চাপা পড়িয়া মরিত, তাহার চেয়ে এ বরং ভালই করিয়াছি।

কিন্তু ইঁদুর শিকার করিতে এখনও তাহার অনেক দেরি। আরসুলা দেখিলে এখনও সে ভয়ে ছুটিয়া পালাইয়া আসে, কোথাও কোনও শব্দ হইলে তো আর কথাই নাই, ছুটিয়া একেবারে আমার কাছে আসিয়া পায়ের তলায় ঢুকিবার চেষ্টা করে।

আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলাম, পুষি।

কিন্তু পুষির উপর আমার স্ত্রী কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। প্রথম প্রথম, নিতান্ত ছোট যখন ছিল, এক-একদিন দেখিতাম, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গৃহিণী আদর করিতেছেন। কিন্তু যতই সে বড় হইতে লাগিল, গৃহিণী ততই তাহার উপর বিরূপ হইতে লাগিলেন।

'না বাপু, যাও, যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেইখানেই একে আবার দিয়ে এসো ফেলে। বেরাল আবার মানুষে পোষে! ছি।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন? ও আবার কি ক'রলে?'

'ক'রলে আমার মাথা! কবে যে উনি ইঁদুর ধরবেন তার জন্যে এখন থেকে রাজকন্যের মতন মানুষ হচ্ছেন। এই ত্যাখো-না কি করেছে।'

এই বলিয়া স্ত্রী তাঁহার হাতখানি আমার চোখের সুমুখে বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম গৌরবর্ণ তাঁহার সেই সুকোমল চামড়ার উপর বিড়ালের নখের আঁচড়ের দাগ লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।—'এ কি। আঁচড়ে দিয়েছে?'

স্ত্রী বলিলেন, 'থাক্ না থাক্ হাঁ হাঁ ক'রে সব জিনিসে মুখ দিতে যায়! বেরালের লোম পেটে গেলে কি হয় জানো? ওদের বৌ বলছিল, যক্ষ্মা হয়।'

হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। বলিলাম, 'কিচ্ছু হয় না। ওকে ভালোবেসো, তা হ'লে ও আর তোমায় আঁচড়াবে না। কই আমায় তো আঁচড়ায় না!'

স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন।—'হ্যাঁ, ভালবাসবে না আরও-কিছু! এরই মধ্যে চুরি ক'রে খেতে শিখেছে। এর চেয়ে ইঁদুর আমার ছিল ভাল! ও আপদ বিদেয় কর।'

কিন্তু তাহাকে বিদায় আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না। বিদায় করিবার কথা ভাবিতেও আমার কষ্ট হইতে লাগিল!

ওদিকে স্ত্রী দেখিলাম তাহাকে প্রহার করিতে সুরু করিয়াছেন। পুষি হয় তো আমার গৃহিণীর পায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, ফুটবলের মত তিনি তাহাকে দিলেন এমন জোরে এক লাথি যে, বেচারা একেবারে ক্যাঁক করিয়া বহুদূরে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িল। লাথি মারেন, ঝাঁটা মারেন, দিবা-রাত্রি গালাগালি দেন। বলেন, 'ওকে তো তাড়ালে না, এবার আমি ওকে একদিন মেরেই ফেলব।'

তাড়াইবার চেষ্টা যে আমার স্ত্রী করেন নাই তাহা নয়। শুনিলাম, আমার অবর্তমানে একদিন তিনি তাহাকে দরজার বাহিরে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, ঝিকে দিয়া একদিন তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, পুষি মিউ মিউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অত্যাচার নির্যাতনের তো কথাই নাই! আলমারির মাথার উপর সারাদিন হয় তো তাহাকে তুলিয়া রাখা হইয়াছে।

বেচারা, অত উঁচু হইতে প্রাণের ভয়ে নামিতেও পারে না, অথচ সারাদিন কিছু না খাইয়া ওখানে সে কেমন করিয়াই বা থাকে !

কলিকাতা হইতে একবার আমাকে কয়েকদিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম চুরি করিয়া পুষি এক টুকরা মাছ খাইয়াছিল এবং তাহার শাস্তি-স্বরূপ দু'দিন তাহাকে অনাহারে রাখা হইয়াছে।

শুনিয়া সত্যই রাগ হইল। বলিলাম, 'খেতে দাও নি ? ছি !'

স্ত্রী বলিলেন, 'ক্ষেপেছ ? পোড়ারমুখী না খেয়ে থাকবে ? এই এতগুলি মাছ ভেজে রেখেছিলাম। চুরি ক'রে হতভাগী সব খেয়েছে।'

যাই হোক্ এমনি করিয়া পুষি মানুষ হইতে লাগিল।

বড় হইতে আর কতদিন !

ছ'মাসের মধ্যে দেখা গেল, পুষি মস্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলে আর সেই ছোট পুষি বলিয়া মনে হয় না। এখনও সে আমার সঙ্গেই খায়, আমার কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, রাত্রি হইলে তাহাকে কিন্তু আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঘের মাসি, শিকারী জন্তুর জাত, ছুটিয়া ছুটিয়া শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইঁদুরগুলা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী তাহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই। পুষি নাকি তাহাদের চেয়েও ক্ষতি করে যথেষ্ট বেশি, পুষি যদি এখন মরে তো তিনি নিষ্কৃতি পান; বাড়িতে যে আসে তাহাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাগা, বেরালগুলো কতদিন বাঁচে বলতে পারো ?'

কেহ বলে ছ'মাস, কেহ বলে এক বছর, আবার কেহ বলে, 'কই মা, বেরাল মরতে তো কখনও দেখিনি।'

এখন আবার পুষিকে মারিবারও তেমন সুবিধা হয় না, মারিতে গেলেই ছুটিয়া পালায়। ধরিতে গেলেই ফোঁস্ করিয়া গর্জিয়া ওঠে। আঁচড়াইয়া দিবার ভয়ে স্ত্রী আর তাহাকে ধরিতেও যান না। দূর হইতেই গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

স্ত্রী বলেন, 'এ আপদ এলো শুধু তোমার জন্যে। জ্বলে পুড়ে মারা গেলাম ওর দায়ে !'

জবাব দিতে ভয় হয়। তাই চুপ করিয়াই থাকি।

গত দু'তিন দিন পুষিকে দেখিতে পাই নাই। অনেক খোঁজা-খুঁজি করিলাম। কিন্তু গেল কোথায় !

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, 'বাবাঃ, এতদিন পরে বাঁচা গেল। রাস্তায় বেরিয়েছিল হয় তো গাড়ি চাপা পড়েছে। বেশ হয়েছে।'

আমি কিন্তু খুশি হইতে পারিলাম না। জানি আসিবে না, তবু খাইতে বসিয়া চু-চু করিয়া ডাকিয়াই আবার মন খারাপ হইয়া গেল, ভাল করিয়া খাইতেও পারিলাম না।

স্ত্রী তিরস্কার করিতে লাগিলেন—'ওকি তোমার ছেলে ছিল না মেয়ে? যার জন্যে তুমি শোকে একেবারে অধীর হ'য়ে গেলে!'

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইলাম, পুষিকে ফিরাইয়া দাও ঠাকুর!

আমার প্রার্থনার জোরেই কিনা জানি না, পরদিন সকালে গৃহিণী ঝাঁটা হাতে লইয়া ঘর পরিস্কার করিতেছেন, দেখিলাম পুষি টলমল করিয়া টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিতেছে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে, মনে হইল যেন দু'তিন দিন কিছু খাইতে পায় নাই। একটুখানি দুধ দিব বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলাম। দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিতেই দেখি, স্ত্রী আমার পুষির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কানে-মুখে তাহার ফুঁ দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'লো?'

স্ত্রীকে কিছুই বলিতে হইল না। বুঝিলাম, তিনি তাহাকে তাঁহার চিরদিনের অভ্যাসমত সম্মার্জনী দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে পুষি একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি জল আনিয়া মুখে দিলাম, কিন্তু পিছনের পা দুইটা সে বারকতক টান্ করিল, বারকতক খাপ্‌চি খাইল এবং দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটি উল্টাইয়া দিয়া লুট করিয়া হাত হইতে পড়িয়া গেল।—যাঃ! সব শেষ!

—'এ তুমি কী ক'রলে বল তো?'

স্ত্রী বলিল, 'বেশ করলাম।'

দূরের মাঠে পুষিকে ফেলিয়া দিতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখি, পুষি যেখানে বসিয়াছিল, গৃহিণী সেইখানে বসিয়া আছেন আর তাঁহার কোলের উপর পাচটি ছোট ছোট বিড়ালের বাচ্চা!

—'একি! এরা আবার কোত্থেকে এলো?'

স্ত্রী বলিলেন, 'তোমার পুষি এদের দিয়ে গেছে। ভাঁড়ার ঘরের ওই কোণের দিকে চৌকির তলায় কুঁই-কুঁই করছিল।'

বুঝিলাম, এই জন্যই দুদিন তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

কিন্তু আর না।

স্ত্রীকে বলিলাম, 'ওদের বিদিয়ে দাও, নইলে দাও ওগুলো ফেলে দিয়ে আসি।'

হেঁট মুখে ঘাড় নাড়িয়া স্ত্রী বলিলেন, 'না।'

তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, চোখ দিয়া তাঁহার টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

সমাপ্তি

তিনকড়ি তাহার যাবতীয় কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

অন্তত নিজে সে তাহাই বলে। বলে, 'আমি কে ?—আমি করি, তিনি করান।'

বলিয়া সেই তিনির উদ্দেশে তিনকড়ি তাহার বড় বড় চোখের তারা দুইটা উল্‌টাইয়া উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক ছাড়া জল খায় না। মাছ-মাংস পরিত্যাগ করিয়াছে,—ঘি-দুধ তো ঘরে ঢুকিবার উপায় নাই। বলে, 'মাছ-মাংসে ঘেন্না যে কিছু আছে আমার তা নেই। তবে কিনা এই লোভ জিনিসটে ভাল নয়। ওরই জন্যে ঝগড়া-ঝাঁটি, ঘর ভাঙাভাঙি—যা-কিছু···'

কিন্তু বৌ তাহার লুকাইয়া মাছ কেনে। ধরা পড়িলে বলে, 'সধবা মানুষ, এক-আধদিন না খেলে অমঙ্গল হয়।'

তিনকড়ি বলে, 'তোর গুষ্টির মাথা হয় ! জীবহিংসে মহা-পাপ।'

সোনার গহনা বন্ধক রাখিয়া চড়া সুদে টাকা ধার দেয়; সুদবন্ধকী জমিজমার আয় বেশ মোটারকমের; কিন্তু তবুও তাহার হাঁটুর নীচে কাপড় কোনদিন নামে না। শীতের দিনে কোঁচার খুঁটেই শীত কাটে। বলে, 'বাবুয়ানি ক'রেই ডুবলো বাছাধনরা সব।' ঘরে একপাল হাঁস পুষিয়াছে। গাঁয়ের লোকে ক্ষ্যাপাইয়া দেয়। বলে, 'চাটুজ্যে মশাইএর হাঁসের পালটি বেশ বেড়েছে যা-হোক্।···বাড়বে না কেন বাপু, যত্ন কেমন !'